পর্যায় - ২

একক ১ক ☐ আদি ও মধ্যযুগের উত্তর ভারত (৬০০-১০০০ খ্রিঃ)

গঠন

১ক.১ উদ্দেশ্য

১ক.২ প্রস্তাবনা

১ক.৩ খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের উত্তর ভারত

- ১ক.৩.১ বলভীর মৈত্রকগণ
- ১ক.৩.২ রাজস্থান ও নন্দীপুরীর গুর্জারগণ
- ১ক.৩.৩ থানেশ্বরের পুষ্যভূতিবংশ
- ১ক.৩.৪ কনৌজের মৌখরিগণ
- ১ক.৩.৫ মগধের পরবর্তী গুপ্তগণ
- ১ক.৩.৬ বঙ্গদেশ

১ক.৪ হর্ষবর্ধন (৬০১-৬৪৭ খ্রিঃ)

- ১ক.৪.১ হর্ষের সামরিক অভিযানসমূহ
- ১ক.৪.২ হর্ষের রাজ্যের বিস্তৃতি
- ১ক.৪.৩ হর্ষের ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলী

১ক.৫ হর্ষোত্তর যুগে উত্তর ভারত (৬৫০-৭৫০ খ্রিঃ)

- ১ক.৫.১ কাশ্মীর ঃ কার্কোটক বংশ (৬২৭-৮৫৫ খ্রিঃ)
- ১ক.৫.২ আরব আক্রমণ

১ক.৬ পাল ও প্রতিহার প্রাধান্যের যুগ (৭৫০-১০০০ খ্রিঃ)

- ১ক.৬.১ ধর্মপাল
- ১ক.৬.২ দেবপাল
- ১ক.৬.৩ দেবপালের উত্তরাধিকারীগণ
- ১ক.৬.৪ গুর্জর প্রতিহারগণ (৭৩০-৭৫৬ খ্রিঃ)
- ১ক.৬.৫ কাশ্মীর ঃ উলার রাজবংশ

১ক.৭ উত্তর ভারতের রাষ্ট্রশক্তির বিন্যাস

১ক.৭.১ উদভাণ্ডপুরের শাহীবংশ

১ক.৭.২ কাশ্মীর ঃ লোহর রাজবংশ

১ক.৭.৩ কনৌজের গাহড়াবালগণ

১ক.৭.৪ গুজরাতের চালুক্যগণ

১ক.৭.৫ রাজস্থান ও সন্নিহিত অঞ্চলসমূহ

১ক.৭.৬ মালবের পারমারগণ

১ক.৭.৭ জেজাকভুক্তির চন্দেল্লগণ

১ক.৭.৮ ত্রিপুরীয় কলচুরিগণ

১ক.৭.৯ বঙ্গ-বিহারের পালবংশ

১ক.৭.১০ বঙ্গদেশের সেনবংশ

১ক.৮ অনুশীলনী

১ক.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১ক.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন ঃ

- কনৌজের উত্থান, বিশেষ করে হর্ষবর্ধনের নেতৃত্বে কনৌজের উত্তর শ্রীবৃদ্ধি
- হর্ষোত্তর যুগে উত্তর ভারতে আঞ্চলিক শক্তির বিন্যাস
- আরব আক্রমণের কথা
- পাল ও প্রতিহার প্রাধান্যের কথা
- ১০০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে উত্তর ভারতের রাষ্ট্রশক্তির বিন্যাসের ধরন।

১ক.২ প্রস্তাবনা

ইতিপূর্বে আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রাচীনতম পর্ব থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা করেছি। এবারে পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের কথা আলোচনা করব। এখানে প্রথমে আদি-মধ্যযুগের উত্তর ভারতের কথা আলোচনা করা হয়েছে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কালে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে নানা আকারের ও আয়তনের স্বাধীন বা প্রায়-স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে। এঁদের মধ্যে হর্ষবর্ধনের কনৌজের উত্থান এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর সমগ্র উত্তর ভারত আবার খণ্ড খণ্ড হয়ে অনেকগুলি দুর্বল রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যায়। তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় পঞ্চাশ বছর কনৌজের ইতিহাস সম্পর্কে কোনও খবর পাওয়া যায় না। এই সময়কালে

আঞ্চলিক শক্তির বিন্যাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সময়ের মধ্যেই ভারতে আরব আক্রমণ ঘটে। পাল এবং প্রতিহার প্রাধান্যের কথাও এই এককে উল্লিখিত হয়েছে। সর্বশেষ অংশে ১০০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে উত্তর ভারতের রাষ্ট্রশক্তির বিন্যাসের কথা আলোচনা করা হয়েছে।

১ক.৩ খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের উত্তর ভারত

গুপ্ত সাম্রাজ্যের যুগে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি সমগ্র উত্তর ভারতে নানা আয়তনের ছোট বড় স্বাধীন বা প্রায়স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলে সেগুলির মধ্যে বলভীর মৈত্রক, রাজস্থান ও নান্দীপুরীর গুর্জর, থানেশ্বরের পুষ্যভূতি, কনৌজের মৌখরি, বিহারের পরবর্তী গুপ্ত, কামরূপের বর্মা এবং গৌড়-বঙ্গ ও ওড়িশার স্থানীয় কয়েকটি রাজবংশ উল্লেখযোগ্য। এই সকল শক্তির সামান্য কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

১ক.৩.১ বলভীর মৈত্রকগণ

পূর্ব কাথিয়াবাড় অঞ্চলের বল নামক শহরকে কেন্দ্র করে বলভী রাজ্য গড়ে ওঠে। ভটার্ক নামক মৈত্রক গোষ্ঠীর একজন ব্যক্তি, যিনি গুপ্তদের সেনাপতি ছিলেন এবং সেই সঙ্গে সৌরাষ্ট্র বা কাথিয়াবাড় অঞ্চলের শাসক ছিলেন, মৈত্রকদের আদিপুরুষ হিসেবে কথিত। তাঁর বংশের দ্রোণসিংহ, যাঁর একটি লেখের তারিখ ৫০২ খ্রিস্টাব্দ, মহারাজ উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী প্রথম ধ্রুবসেন (আনুমানিক ৫২৫-৪৫ খ্রিঃ) গুপ্ত সম্রাটদের আনুষ্ঠানিক আনুগত্য স্বীকার করেন। পরবর্তী রাজারা ছিলেন ধরপট্ট ও গুহসেন (আনুমানিক ৫৪৫-৫৭০ খ্রিঃ)। শেষোক্তজন গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবলুপ্তির কারণে স্বাভাবিকভাবেই বলভীর সার্বভৌম রাজায় পরিণত হন। পরবর্তী রাজদ্বয় দ্বিতীয় ধরসেন ও শিলাদিত্য-ধর্মাদিত্যের লেখসমূহের তারিখ যথাক্রমে ৫৭১-৯০ খ্রিঃ ও ৬০৬-১২ খ্রিঃ-এর মধ্যে। তাঁদের অধীনস্থ কিছু সামন্ত রাজারও উল্লেখ পাওয়া যায়। শিলাদিত্যের পর যথাক্রমে তাঁর ভাই খরগ্রহ (৬১৩-১৬ খ্রিঃ) ও পুত্র তৃতীয় ধরসেন (৬১৬-২৮ খ্রিঃ), দ্বিতীয় ধ্রুবসেন (৬২৮-৪১ খ্রিঃ) ও চতুর্থ ধরসেন (৬৪১ খ্রিঃ—) রাজত্ব করেন এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন হর্ষবর্ধনের সমকালীন।

১ক.৩.২ রাজস্থান ও নান্দীপুরীর গুর্জরগণ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগ খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ে হরিচন্দ্র নামক জনৈক গুর্জর নেতা রাজস্থানের যোধপুর অঞ্চলে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁর চার পুত্রের যথাক্রমে ভোগভঠ, কক্ক, রজ্জিল ও দদ্দ। এঁদের মধ্যে রজ্জিল মান্দোর বা মাণ্ডব্যপুরে রাজত্ব করতেন। তাঁর পুত্র নরভট। শেষোক্তের পুত্র নাগভট মেড়ান্তক বা মেরতায় রাজধানী স্থাপন করেন। হরিচন্দ্রের অপর পুত্র দদ্দ ভৃগুকচ্ছ বা ব্রোচ অঞ্চলে একটি রাজ্য স্থাপন করেন, যার রাজধানী নান্দীপুরী বা নান্দোদ। তাঁর পুত্র বীতরাগ জয়ভট ও পৌত্র দ্বিতীয় দদ্দ প্রশান্তরাগ। হরিচন্দ্র ও তাঁর প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী আনুমানিক ৫৫০ থেকে ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। পরবর্তীকালের বিখ্যাত গুর্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্যের সূচনা এই গুর্জর রাজবংশগুলির থেকেই হয়েছিল। নান্দীপুরীর গুর্জরগণ নিজেদের সামন্ত হিসেবেই পরিচয় দিতেন। তবে তাঁরা যে ঠিক কাদের সামন্ত ছিলেন বলা কঠিন।

১ক.৩.৩ থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশ

থানেশ্বর বা স্থানীশ্বর ছিল বর্তমান হরিয়ানা অঞ্চল। এখানকার পুষ্যভূতিবংশীয় রাজারা গুপ্তরাজগণের অধীনস্থ হিসেবে রাজত্ব করতেন। প্রতিষ্ঠাতা নববর্ধন খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের গোড়ার দিকে আবির্ভূত হন। তাঁর পুত্র রাজ্যবর্ধন ও পৌত্র আদিত্যবর্ধন। শেষোক্তজনের রাজত্বে থানেশ্বরের উপর গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রভাব চিরতরেই বিলুপ্ত হয়। আদিত্যবর্ধন মূল গুপ্তদের একটি শাখাবংশের, অর্থাৎ মগধের পরবর্তী গুপ্তবংশের, রাজা মহাসেন গুপ্তের ভগিনী মহাসেনগুপ্তাকে বিবাহ করেন। তাঁদের পুত্র ছিলেন প্রভাকরবর্ধন যাঁর রাজত্বকালের সূত্রপাত ঘটে ৫৮০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। আনুমানিক ৬০৫-০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রভাকরবর্ধন যখন মারা যান, সেই সময় তাঁর জামাতা কনৌজের মৌখরিবংশীয় রাজা গ্রহবর্মা মালবাধিপতি দেবগুপ্তর হাতে নিহত হন। তাঁর কন্যা গ্রহবর্মার পত্নী রাজ্যশ্রী বন্দিনী হন এবং দেবগুপ্ত থানেশ্বর আক্রমণ করেন। প্রভাকরবর্ধনের জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তকে পরাজিত ও নিহত করেন, কিন্তু তিনি নিজে গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের চক্রান্তে নিহত হন। রাজ্যবর্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন অতঃপর ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে থানেশ্বরের রাজপদে অভিষিক্ত হন, এবং কিছুটা পরবর্তীকালে অপুত্রক বিধবা ভগিনী রাজ্যশ্রীর তরফ থেকে নিজেকে কনৌজের সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করেন।

১ক.৩.৪ কনৌজের মৌখরিগণ

উত্তরপ্রদেশে গুপ্ত সম্রাটদের সামন্ত হিসেবেই কনৌজের মৌখরিগণের প্রতিষ্ঠা। বিহারের গয়া অঞ্চলেও তাদের একটি শাখাংশের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বংশের হরিবর্মা, আদিত্যবর্মা ও ঈশ্বরবর্মা গুপ্তদের অধীনতা স্বীকার করতেন। চতুর্থ ঈশানবর্মা সার্বভৌম নৃপতি ছিলেন, যিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন ও স্বনামাঙ্কিত মুদ্রার প্রচলন করেন। তিনি অথবা তাঁর পুত্র শর্ববর্মা হূনদের যুদ্ধে পরাস্ত করেন। শর্ববর্মা ও তৎপুত্র অবন্তীবর্মার সময় সমগ্র উত্তরপ্রদেশ ছাড়াও বিহারের কিয়দংশ মৌখরিদের অধিকার ছিল। উপযুক্ত তিন রাজার রাজত্বকাল ছিল আনুমানিক ৫৫০ থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। অবন্তীবর্মার পুত্র গ্রহবর্মা মালবরাজ দেবগুপ্তের হস্তে নিহত হলে, তাঁর বিধবা পত্নী থানেশ্বররাজ প্রভাকরবর্ধনের দুহিতা রাজ্যশ্রীর অভিভাবক হিসেবে হর্ষবর্ধন কনৌজের রাজক্ষমতা গ্রহণ করেন। ক্ষমতার এই হস্তান্তর কীভাবে হয়েছিল বলা কঠিন। নালন্দা থেকে প্রাপ্ত একটি সিলে অবন্তীবর্মার অপর এক পুত্রের নাম পাওয়া যায়। সিলটি ভগ্নপ্রাপ্ত নামটির প্রথম অক্ষর সু (...), দ্বিতীয় অক্ষর হয় (....) ব, না হয় (.....)চ। সম্ভবত ইনি গ্রহবর্মার উত্তরাধিকারী হন, এবং পরে হর্ষবর্ধন কর্তৃক অপসারিত হন। *ফাংচি* নামক একটি চৈনিক গ্রন্থের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, হর্ষবর্ধন তাঁর বিধবা ভগ্নীর তরফে প্রথম কনৌজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ৬১২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ নিজেকে কনৌজের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন।

১ক.৩.৫ মগধের পরবর্তী গুপ্তগণ

গুপ্ত উপাধিধারী এই রাজারা গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর একটি নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। মালবরাজ দেবগুপ্ত হয়তো এঁদেরই কোন শাখাবংশের অন্তর্গত ছিলেন। গয়ার নিকটে প্রাপ্ত অফসদ লেখে এই বংশের আটজনের নাম দেওয়া আছে যাঁরা হলেন কৃষ্ণগুপ্ত, হর্ষগুপ্ত, জীবিতগুপ্ত, কুমারগুপ্ত, দামোদরগুপ্ত, মহাসেনগুপ্ত, মাধবগুপ্ত ও আদিত্যসেন। এই বংশের চতুর্থ রাজা কুমারগুপ্ত মৌখরিরাজ ঈশানবর্মাকে ৫৫০-৭৬ খ্রিঃ) পরাজিত করেন। পরবর্তী রাজা দামোদরগুপ্ত মৌখরিদের আরও একবার পরাজিত করেন। দামোদরগুপ্তের

পুত্র মহাসেনগুপ্ত লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং কামরূপরাজ সুস্থিতবর্মাকে পরাজিত করেন। *হর্ষচরিত*-এ বলা হয়েছে যে মহাসেনগুপ্ত মালবের অধীশ্বর ছিলেন। কিন্তু তাঁর সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি, এবং তাঁর শেষ পরিণতি কী হয়েছিল বলা যায় না। তবে তাঁর দুই পুত্র কুমারগুপ্ত ও মাধবগুপ্ত থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের আশ্রিত ছিলেন। তাঁরা হর্ষবর্ধনের সহচর ছিলেন এবং হর্ষের মৃত্যুর পর মগধের সিংহাসনে আসীন হন। মাধবগুপ্তর পর তাঁর পুত্র আদিত্যসেন রাজা হন। একটি লিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি ৬৭২ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। আদিত্যসেনের তিনজন উত্তরাধিকারীর নাম জানা যায় যাঁরা হলেন দেবগুপ্ত, বিষ্ণুগুপ্ত ও জীবিতগুপ্ত। অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মগধ অঞ্চল কনৌজের যশোবর্মা কর্তৃক অধিকৃত হয়।

১ক.৩.৬ বঙ্গাদেশ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের যুগে বঙ্গাদেশে দু'টি স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে—একটি দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের অংশ নিয়ে বঙ্গা, অপরটি উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গা নিয়ে গৌড়। বঙ্গা অঞ্চলের রাজাদের অনেকগুলি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে, যেগুলিতে তিনজন রাজার নাম আছে—গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব। শেষোক্তজন নিজ নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেন। এই তিনজনের মোট রাজত্বকাল আনুমানিক ৫২৫ থেকে ৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। পূর্ববঙ্গা থেকে কিছু নিম্নমানের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে যেগুলি থেকে দু'টি নাম মোটামুটি পড়া যায়, পৃথুবীর ও সুধন্যাদিত্য। এঁদের খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে স্থান দেওয়া হয়।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষের দিকে, মগধের পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজা মহাসেনগুপ্তের আমলে গৌড়ের শাসক শশাঙ্ক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। রোটাসগড়ের পার্বত্য দুর্গের একটি উৎকীর্ণ লেখে শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক নামটি বর্তমান। সম্ভবত শশাঙ্ক মহাসেনগুপ্তের সামন্ত ছিলেন। বাণভট্ট এবং হিউয়েন সাঙ তাঁকে গৌড়ের অধিপতি বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। উড়িষ্যার মান ও শৈলোদ্ভব বংশের নৃপতিরা তাঁর নিকট আনুগত্য প্রদর্শন করেন। মালবরাজ দেবগুপ্তের সহায়তায় তিনি কনৌজের মৌখরিবংশীয় রাজা গ্রহবর্মাকে পরাজিত ও নিহত করেন। হর্ষবর্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্ধন তাঁর চক্রান্তে নিহত হন। হর্ষবর্ধন কোন দিন শশাঙ্কের উপর প্রতিশোধ নিতে পেরেছিলেন কিনা বলা শক্ত, কেননা শশাঙ্ক ৬৩৭-৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, এবং হিউয়েন সাঙ লিখেছেন যে শশাঙ্ক আমৃত্যু মগধের অধীশ্বর ছিলেন। শশাঙ্কের পর গৌড়-বঙ্গের রাজনৈতিক চিত্র বড়ই অস্পষ্ট।

১ক.৪ হর্ষবর্ধন (৬০১-৬৪৭ খ্রিঃ)

বাণভট্ট বিরচিত *হর্ষচরিত* থেকে জানা যায় যে শশাঙ্কের চক্রান্তে রাজ্যবর্ধন নিহত হওয়ার পর হর্ষবর্ধন, শশাঙ্ক ও গৌড়দের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এক দারুন প্রতিজ্ঞা করেন এবং হংসবেগ নামক একজন দূত মারফত প্রাগজ্যোতিষ বা কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন।

হিউয়েন সাঙের বৃত্তান্ত হর্ষকে বরাবরই কনৌজের সম্রাট বলা হয়েছে, থানেশ্বরের নয়। তাঁর রচনা থেকে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা হচ্ছে এই যে, গ্রহবর্মার মৃত্যুর পর কনৌজের সিংহাসন শূন্য ও উত্তরাধিকারবিহীন হয়ে গেলে, এবং রাজ্যশ্রী ওই সিংহাসনের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করলে কনৌজের মন্ত্রীরা হর্ষবর্ধনকে সিংহাসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। এবং কিছুটা ইতস্তত করার পর হর্ষ রাজি হন। কিন্তু ব্যাপারটির সম্ভবত এভাবে

হয় নি। নালন্দায় প্রাপ্ত একটি সিল থেকে জানা যায় যে, কনৌজের মৌখরিরাজ অবন্তীবর্মার গ্রহবর্মা ছাড়াও আরও একজন পুত্র ছিল। কাজেই গ্রহবর্মার মৃত্যুর পর কনৌজের সিংহাসন খালি ছিল একথা বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী 'মৌখরিগণ' দ্রষ্টব্য।

১ক.৪.১ হর্ষের সামরিক অভিযানসমূহ

হর্ষের সামরিক অভিযানসমূহ মোটামুটি চারটি শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় যথা বলভী ও গুর্জরের শাসকবৃন্দ, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী, সিন্ধু এবং পূর্বদিকের দেশসমূহ, যেমন মগধ, গৌড়, ওড্র ও কোঙ্গোদ।

বলভীর মৈত্রক রাজবৃন্দের মধ্যে খরগ্রহ, তৃতীয় ধরসেন, দ্বিতীয় ধ্রুবসেন ও চতুর্থ ধরসেন (খ্রিঃ ৬১৩-৬৪১) সকলেই ছিলেন হর্ষের সমকালীন। তাই ঠিক কার বিরুদ্ধে হর্ষ যুদ্ধ করেছিলেন তা সঠিক বলা শক্ত।

নান্দীপুরীর গুর্জরবংশীয় সামন্তরাজাদের লেখ থেকে জানা যায় যে, তাদের প্রাক্তন নৃপতি দ্বিতীয় দদ্দ তাঁর প্রভু বলভীরাজের পক্ষ অবলম্বন করে বিখ্যাত হর্ষদেবকে পরাস্ত করেন, যদিও দদ্দের নিজের কোন লেখে এ ঘটনার উল্লেখ নেই। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল লিপিতে গুর্জর, মালব ও লাটদের পুলকেশীর অধীন সামন্তশক্তি বলা হয়েছে যারা কোন একটি বৃহৎ শক্তির হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাঁর অধীন হয়। সম্ভবত বলভীর মৈত্রকদের পক্ষ নেওয়ায় দ্বিতীয় দদ্দ হর্ষের কোপদৃষ্টিতে পড়েন। আবার এও হতে পারে যে দদ্দ ছিলেন খুবই গৌণ শক্তি যিনি প্রথমে মৈত্রকদের ও পরে চালুক্যদের হয়ে যুদ্ধে যোগদান করেন এবং পরবর্তীকালে এইজন্য তাঁর বংশধরদের নিকট থেকে প্রাপ্যের অতিরিক্ত প্রশংসা পান।

বলভীরাজ দ্বিতীয় ধ্রুবসেন (খ্রিঃ ৬২৮-৪১) হর্ষের জামাতা হয়েছিলেন এবং মাত্র এইটুকু তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে, তিনি হয় হর্ষের নিকট পরাস্ত হয়ে তাঁর কন্যাকে বিবাহ করে নিজ অধিকার বজায় রাখেন, না হয় হর্ষ তৎকর্তৃক পরাস্ত হয়ে অথবা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ শেষ করার ইচ্ছায় নিজ কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিয়ে শান্তি স্থাপন করেন।

হর্ষের দ্বিতীয় সামরিক অভিযান ছিল চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর বিরুদ্ধে। নর্মদার তীরে এই যুদ্ধে হর্ষ পরাজিত হন। হিউয়েন সাঙ লিখেছেন যে, হর্ষ বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন। শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদের নিয়োগ করেছিলেন এবং নিজেও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সাফল্যলাভ করেন নি। এই যুদ্ধ ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দের আগে ঘটেছিল।

সিন্ধুতে হর্ষবর্ধন সাফল্যলাভ করেছিলেন কি না সন্দেহ আছে, যদিও বাণভট্ট লিখেছেন যে হর্ষবর্ধন সিন্ধুর রাজার সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে হরণ করেছিলেন।

পূর্বদিকে হর্ষ কিছুটা সাফল্য অর্জন করেন। ৬৪৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ হিউয়েন সাঙ কামরূপে গিয়েছিলেন যখন হর্ষ কোঙ্গোদ ও ওড়িশা জয় করে রাজমহলের নিকটবর্তী জঙ্গালে গঙ্গার তীরে অপেক্ষা করেছিলেন। মা-তোয়ান-লিন লিখেছেন যে, শিলাদিত্য অর্থাৎ হর্ষবর্ধন ৬৪১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মগধরাজ উপাধি নিয়েছিলেন। গৌড়ে যদি হর্ষ কিছু সাফল্য অর্জন করে থাকেন তা তিনি করেছিলেন শশাঙ্কের মৃত্যুর পর ৬৩৭-৩৮ খ্রিস্টাব্দে মগধে ভ্রমণকালে হিউয়েন সাঙ শোনেন যে, সেই সময়ের কিছু আগে, শশাঙ্ক গয়ার বোধিবৃক্ষটির মূলোচ্ছেদ করেন, এবং তার অনতিকাল পরেই মারা যান। গৌড়ে ও মগধে হর্ষের সাফল্য ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দের পর ঘটে।

১ক.৪.২ হর্ষের রাজ্যের বিস্তৃতি

বাণভট্ট ও হিউয়েন সাঙের উপর ভিত্তি করে আগেকার দিনে হর্ষের রাজ্যের সম্পর্কে একটা অতিরঞ্জিত ধারণা প্রচলিত ছিল। কিন্তু বাস্তবে হর্ষের রাজত্ব ছিল বর্তমান হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থানের একাংশ, মধ্যপ্রদেশের উত্তরাঞ্চল এবং বিহার ও উড়িষ্যার কতকাংশ নিয়ে। সিন্ধুপ্রদেশে হর্ষের অধিকার সম্পর্কে কোন পাকা প্রমাণ নেই। হিউয়েন সাঙ নিজেই হর্ষের সমসাময়িককালে উত্তর-পশ্চিমে কপিল ও উদ্যান, উত্তরে কাশ্মীর এবং পাঞ্জাব অঞ্চলে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন। পশ্চিম মালবে (মো-লা-পো) তখন স্বাধীন রাষ্ট্রশক্তি বর্তমান ছিল। পূর্বদিকে ওড়িশা (ওড্র ও কোঙ্গোদ) মগধ এবং গৌড়বঙ্গের কিয়দংশ তাঁর অধীনে আসে। দক্ষিণে হর্ষবর্ধন চালুক্যদের এলাকা ভেদ করতে পারেন নি।

হর্ষবর্ধনের সামরিক জীবন খুব সফল না হলেও, এবং তাঁর সাম্রাজ্যের পরিসর সুবিস্তৃত না হলেও, তিনি শক্তিমান সম্রাট হিসাবে আদৃত ছিলেন এবং তাঁর প্রভাবের ক্ষেত্র ছিল সর্বভারতীয়। দক্ষিণ ভারতীয় লেখসমূহে তাঁকে 'সকল-উত্তরাপথ-নাথ' বলা হয়েছে, যা তাঁর খ্যাতির ব্যাপ্তির পরিচায়ক।

সম্ভবত হিউয়েন সাঙের কাছ থেকে হর্ষবর্ধন চীন দেশ ও চীন সম্রাটের কথা শোনেন। ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে তিনি একজন দূত চীনে প্রেরণ করেন। ৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে লি-ই-পিয়াও এবং ওয়াং-হিউয়েন-সের নেতৃত্বে আরও একটি দৌত্য হর্ষের রাজসভায় আসে। ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে হিউয়েন সাঙ চীনে প্রত্যাবর্তন করার পর তাঁর কাছ থেকে হর্ষের সংবাদ প্রত্যক্ষভাবে জেনে চীন সম্রাট পুনর্বার ওয়াং-হিউয়েন-সে এবং সিয়াং-চেউ জেনকে ৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতে পাঠান। তাঁরা ভারতে পৌঁছে শোনেন যে হর্ষ মারা গেছেন। হর্ষের মৃত্যু হয়েছিল ৬৪৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। হর্ষের কোন প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী ছিল না। তাঁর মন্ত্রী অর্জুন অথবা অরুণাশ্ব সিংহাসন আরোহন করেন। ওয়াং-হিউয়েন-সে সম্ভবত তাঁকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন।

১ক.৪.৩ হর্ষের ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলী

রাজা হিসাবে হর্ষবর্ধন যতটা না বড় ছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলী সারা ভারতেই তাঁকে শ্রদ্ধেয় করে তুলেছিল। সাহিত্যিক হিসেবে হর্ষের প্রতিষ্ঠা ছিল। তিনি *রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা* ও *নাগানন্দ* নামক তিনটি নাটক রচনা করেন এবং সম্ভবত তা প্রদর্শনের জন্যও সচেষ্ট হন। এছাড়া তাঁর আমলে সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে জোয়ার আসে তা বাণভট্ট ও অন্যান্য সংস্কৃত নাট্যকারগণের রচনা থেকে উপলব্ধ হয়। ই-ৎসিং লিখেছেন ঃ "শিলাদিত্য সাহিত্যের রীতিমত অনুরাগী ছিলেন। তিনি শুধু বোধিসত্ত্ব জীমূতবাহনের (নাগানন্দ) কাহিনীকে ছন্দোবদ্ধই করেন নি, নৃত্য ও অভিনয়ের দ্বারা তিনি তা প্রদর্শন করান।"

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে হর্ষ প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন বলে হিউয়েন সাঙ উল্লেখ করেছেন। হর্ষের ধর্মের বিষয়ে কোন গোঁড়ামি ছিল না। সকল সম্প্রদায়ের প্রতি তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন, এবং নিজে শৈব হওয়া সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। তাঁর সময়ে কনৌজে একটি ধর্ম সম্মেলন হয়, যাতে কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্মাসহ কুড়ি জন রাজা ও বহু পণ্ডিত যোগদান করেন। এখানে হিউয়েন সাঙ বক্তৃতা করেন। হর্ষ ছিলেন এই সম্মেলনের সভাপতি।

দানশীলতার জন্যও হর্ষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর তিনি গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে দান-ধ্যান করতেন।

হর্ষ একটি অব্দ প্রচলন করেন ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সিংহাসনারোহণের সময় থেকে। অল-বিরুনী লিখেছেন যে কনৌজ ও মথুরা অঞ্চলে তাঁর সময় এই অব্দের প্রচলন ছিল। হর্ষ কোন উত্তরাধিকারী রেখে যান নি।

১ক.৫ হর্ষোত্তর যুগে উত্তর ভারত (৬৫০-৭৫০ খ্রিঃ)

হর্ষবর্ধন কোন সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেছিলেন কিনা তা নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে। এখানে বি. এন. শ্রীবাস্তবের মতামত উল্লেখ্য। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর সমগ্র উত্তর ভারত পুনরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি দুর্বল রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যায়। তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় পঞ্চাশ বছরের কনৌজের ইতিহাস সম্পর্কে কোন খবর পাওয়া যায় না। তবে আনুমানিক ৬৯০ থেকে ৭৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আমরা যশোবর্মা নামক একজনকে কনৌজে রাজত্ব করতে দেখি, যাঁর দিগ্বিজয়ের কাহিনী বাকপতির গৌড়বহো নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত একটি কাব্যে উল্লিখিত হয়েছে। তিনি প্রকৃতই দিগ্বিজয়ী ছিলেন যিনি আরব আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন এবং ৭৩১ খ্রিস্টাব্দে চীনে বুদ্ধসেন নামক এক মন্ত্রীকে দূত হিসাবে পাঠান। তাঁর উত্থান ও পতন উল্কার ন্যায় ঘটেছিল। তিনি যুদ্ধে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের দ্বারা নিহত হন।

হর্ষবর্ধন মগধ জয়ের পর তাঁর আশ্রিত পরবর্তী গুপ্তবংশীয় মহাসেনগুপ্তের পুত্রদের সেখানকার সিংহাসনে বসিয়ে দেন। কিন্তু তাঁদের বংশধরেরা প্রাগুক্ত যশোবর্মা কর্তৃক উৎখাতপ্রাপ্ত হন। হর্ষের রাজনৈতিক মিত্র কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বঙ্গদেশের কিয়দংশ জয় করেন। কর্ণসুবর্ণ থেকে তাঁর একটি দানলেখ পাওয়া গেছে। তাঁর মৃত্যুর পর কামরূপে কিছুটা রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা যায়। পরে সালস্তম্ভ নামক এক ব্যক্তি সেখানে একটি নতুন রাজবংশের পত্তন করেন। যে বলভীর মৈত্রকদের সঙ্গে হর্ষবর্ধনের যুদ্ধ হয়েছিল, সেই শিলাদিত্য উপাধিধারী মৈত্রক রাজারা ৭৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন। রাজা পঞ্চম শিলাদিত্য আরব আক্রমণ একাধিকবার সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করেন।

রাজস্থান ও গুজরাত অঞ্চলে চারটি শক্তির উত্থান ঘটে, যথা গুর্জর প্রতিহার, গুহিলোত বা গুলিহপুত্র, চাপ বা চাপোৎকট এবং চাহমান। হরিচন্দ্র যোধপুরে প্রথম গুর্জর রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁর বংশধররা রাজস্থান, গুজরাত ও মধ্যপ্রদেশের কোন কোন স্থানে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে তোলেন। পশ্চিম ভারতে আরব আক্রমণের পটভূমিকায় খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে অবন্তীর গুর্জরদের প্রতিহার শাখার নৃপতি নাগভট্ট খণ্ড-বিক্ষিপ্ত গুর্জর রাজ্যগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করেন, যা থেকে পরবর্তীকালের বিখ্যাত গুর্জর প্রতিহার সাম্রাজ্যের সূচনা হয়।

১ক.৫.১ কাশ্মীর ঃ কার্কোটক্ বংশ (৬২৭-৮৫৫ খ্রিঃ)

হর্ষবর্ধনের সময়ে, আনুমানিক ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে, কাশ্মীরে দুর্লভবর্ধন কার্কোট বা নাগবংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। হিউয়েন সাঙ, যিনি তাঁর সময়ে কাশ্মীর পরিদর্শন করেন, লিখেছেন যে তখনকার দিনে তক্ষশিলা, সিংহপুর, উরশা, পান-নু-সো (পুঞ্চ) এবং রাজপুর (রাজৌরি) কাশ্মীরের অধীন ছিল। দুলর্ভবর্ধন ৩৬ বছর এবং তাঁর পুত্র দুর্লভক ৫০ বছর রাজত্ব করেন।

রাজতরঙ্গিনী-র বক্তব্য অনুযায়ী, দুর্লভকের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় প্রতাপাদিত্য রাজত্ব করেন ও প্রতাপপুর নগরী স্থাপন করেন। এর পুত্র চন্দ্রাপীড় কাশ্মীরের রাজা হন। তিনি ৭১৩ খ্রিস্টাব্দে চীনের কাছ থেকে সাহায্য

চেয়ে একজন দূত পাঠান, কেননা আরব সেনাপতি মুহম্মদ-বিন-কাসিম আরব সীমান্তে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু কাশ্মীরে যুদ্ধ করা তাঁর হয় নি, কেননা আরব কর্তৃপক্ষ তাঁকে ডেকে নিয়ে হত্যা করে। সাড়ে আট বছর রাজত্ব করার পর চন্দ্রাপীড় তাঁর ভাই তারাপীড় কতৃক নিহত হন। তারাপীড় চার বছর রাজত্ব করেন। পরবর্তী রাজা হন তাঁর ছোট ভাই ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় (৭২৪ খ্রিঃ)।

ললিতাদিত্য প্রথমে তিব্বতীদের ও পরে দর্দ, কাম্বোজ ও তুর্কদের (আরব) জয় করেন। অতঃপর তিনি যশোবর্মাকে পরাস্ত করে কনৌজ অধিকার করেন। কলহন তাঁর *রাজতরঙ্গিনী*-তে ললিতাদিত্যের দিগ্বিজয়ের একটি অতিরঞ্জিত কাহিনী বলেছেন যা অনুযায়ী তিনি কলিঙ্গ, গৌড়, কর্ণাট, দ্বারকা, অবন্তী, প্রাগজ্যোতিষ, স্ত্রীরাজ্য, উত্তরকুরু এবং দক্ষিণে কাবেরী পর্যন্ত জয় করেছিলেন।

কলিঙ্গ বা কর্ণাট বা কাবেরী পর্যন্ত অঞ্চলে তাঁর অধিকার বিস্তারের অন্য কোন প্রমাণ নেই। তবে কামরূপের ইতিহাসে দেখা যায় সেখানকার কোন কোন রাজবংশের সঙ্গে কাশ্মীর ও নেপালের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। অনুমান করা যেতে পারে যে ললিতাদিত্য দক্ষিণ হিমালয়ের পার্বত্য পথ ধরে প্রাগজ্যোতিষ বা কামরূপে গমন করেন এবং সেখানকার কোন স্থানীয় রাজার আনুগত্য গ্রহণ করেন। প্রাগজ্যোতিষের পথেই গৌড়ের কোন রাজার সঙ্গে তাঁর একটা বোঝাপড়া হয়, এবং তিনি তাকে কাশ্মীরে আমন্ত্রণ জানান। ওই একই পথে গাড়োয়াল-কুমায়ুনের নিকটবর্তী অঞ্চলের একটি স্ত্রীরাজ্যের, অর্থাৎ যেখানে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে মাতৃপ্রাধান্য বর্তমান, তার কথা হিউয়েন সাঙ উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত এইরকম কোন স্ত্রীরাজ্য তিনি অধিকার করেন। উত্তরকুরু দেশটি কাশ্মীরের উত্তরে অবস্থিত। ললিতাদিত্য তা দখল করতেই পারেন। দ্বারকা বা অবন্তীতে তিনি কিছু যুদ্ধবিগ্রহ করে থাকতেও পারেন। প্রধানত আরব আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে তিনি কনৌজরাজ যশোবর্মার সঙ্গে সামরিক চুক্তিতে কিছুকালের জন্য আবদ্ধ হয়েছিলেন।

গৌড়রাজকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে কাশ্মীরে আমন্ত্রণ জানিয়ে ললিতাদিত্য তাঁকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক হত্যা করেন। এই সংবাদ পেয়ে কয়েকজন গৌড়বাসী কাশ্মীরে গিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করে। তারা বিষ্ণু রামস্বামীর মন্দির ধ্বংস করে এবং রাজধানীতে ব্যাপক সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে। প্রত্যেকে নিহত না হওয়া পর্যন্ত তারা সমানে যুদ্ধ করেছিল। তাদের এই বীরত্ব ও আত্মত্যাগের প্রশংসা কল্‌হন মুক্তকণ্ঠে করেছেন।

৩৬ বছর রাজত্ব করার পর ৭৬০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ললিতাদিত্য মারা যান। তাঁর উত্তরাধিকারীরা দুর্বল ছিলেন। তাঁর পৌত্র জায়পীড় অবশ্য কাশ্মীরের পূর্বমর্যাদা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। অবশ্য কার্কোট বংশ ৮৫৫-৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল।

১ক.৫.২ আরব আক্রমণ

খলিফা ওমরের আমল থেকেই (৬৩৪-৪৪ খ্রিঃ) আরবেরা বারবার স্থলপথে ও জলপথে ভারতে অভিযান চালিয়ে ব্যর্থ হয়। ৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে অল-হজাজ ইরাকের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে জলপথে ও স্থলপথে ভারতে অভিযান প্রেরণ করেন। স্থলপথে তিনি কাবুল ভেদ করতে না পারলেও সিন্ধুপ্রদেশে তিনি সফল হন।

সিংহল থেকে একটি জাহাজ কিছু মুসলিম তীর্থযাত্রিনী নিয়ে ইরাক যাচ্ছিল। পথিমধ্যে দেবল বন্দরের নিকট তারা জলদস্যুগণ কর্তৃক অপহৃত হয়। হজাজ রাজা দাহরকে চিঠি মারফৎ অনুরোধ করেন এই

তীর্থযাত্রিনীদের মুক্ত করতে। দাহর জানান যে জলদস্যুদের উপর তার কোন কর্তৃত্ব নেই। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে হজাজ দেবল আক্রমণের জন্য একটি বাহিনী পাঠান। এই ঘটনাটি অবশ্য হজাজের পক্ষে একটা অজুহাত, কেননা ইতিপূর্বেই তিনি স্থলপথে কয়েকবার সিন্ধুতে হানা দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। যাই হোক, হজাজ প্রেরিত এই বাহিনী পরাজিত হয়। দ্বিতীয় আক্রমণ হয় বুদাইলের নেতৃত্বে। দাহরের পুত্র জয়সিংহ এক্ষেত্রেও জয়লাভ করেন এবং বুদাইল নিহত হন।

অতঃপর হজাজ বিস্তৃত সামরিক আয়োজন করে নিজ জামাতা মুহম্মদ-ইবন-কালিমকে দাহরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এবারে মুহম্মদ দেবল অধিকারে সমর্থ হন। দেবল বন্দরটি সম্ভবত ছিল সিন্ধুর অট্টা অঞ্চলে। দেবল থেকে মুহম্মদ নেরুন-এ (বর্তমান পাকিস্তানের হায়দরাবাদ) উপস্থিত হন এবং সেখানে থেকে সিউইস্তানে (সেহোয়ান) পৌঁছান। তিনি মোকা প্রমুখ কিছু প্রভাবশালী বিশ্বাসঘাতক সামন্তের সহায়তা পান। তারপর তিনি সিন্ধুনদ অতিক্রম করে রাওর নামক স্থানে দাহরের সম্মুখীন হন। যুদ্ধকালে দাহর অকস্মাৎ নিহত হলে তাঁর বাহিনী পরাজিত হয়। এরপর দাহরের পুত্র জয়সিংহ ব্রাহ্মণাবাদে পিছিয়ে আসেন এবং রাজধানী আলোর রক্ষায় সচেষ্ট হন। ছয় মাস চেষ্টার পর আলোরের পতন ঘটে। অতঃপর মুহম্মদ উত্তর দিকে মূলতান জয় করেন।

৭১৪ খ্রিস্টাব্দে হজাজের মৃত্যুর পর ৭১৫ খ্রিস্টাব্দে খলিফা ওয়ালিদেরও মৃত্যু ঘটে। এর পর নতুন খলিফা সুলেইমানের সময় কাশিমের প্রাণদণ্ড হয়। মুহম্মদের মৃত্যুর পর সিন্ধুর সামন্তরাজারা আরব অধিকার অস্বীকার করেন। খলিফা দ্বিতীয় উমর (৭১৭-২০ খ্রিঃ) তাঁদের সামন্তরাজা হিসেবে স্বীকার করে নেন এই শর্তে যে এঁদের সকলকে মুসলমান হতে হবে। জয়সিংহ ও অনেকেই তা মেনে নেন। কিন্তু পরে জয়সিংহ বিদ্রোহী হন এবং সিন্ধুর শাসনকর্তা জুনাইদের হাতে পরাস্ত ও নিহত হন। ৭২৪ থেকে ৭৩৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জুনাইদ রাজস্থানের মধ্য দিয়ে পূর্বে মালব ও দক্ষিণে ব্রোচ পর্যন্ত জয় করেন। কিন্তু এই জয়লাভ ক্ষণস্থায়ী হয়। প্রতিহাররাজ নাগভট এবং লাটের (দক্ষিণ গুজরাত) চালুক্যরাজ অবনিজনাশ্রয় পুলকেশীরাজ আরব বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন।

উত্তর-পশ্চিমে মুহম্মদ-বিন-কাশিমের চেষ্টায় মূলতান, কিরাজ বা কাংরা ও কাশ্মীরের কিছু অংশ আরবদের অধিকারে এসেছিল কিন্তু জুনাইদ তা বজায় রাখতে পারেননি। কনৌজের যশোবর্মা ও কাশ্মীরের ললিতাদিত্য আরব বাহিনীকে পরাজিত করেন।

এদেশে আরব আক্রমণ কোন স্থায়ী চিহ্ন রাখতে পারেনি। পরবর্তীকালে ভারত ইতিহাসে তুর্কীরা যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তার সূত্রপাত আরবেরা করেছিল বললে ঠিক বলা হবে না।

১ক.৬ পাল ও প্রতিহার প্রাধান্যের যুগ (৭৫০-১০০০ খ্রিঃ)

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রায় শতবর্ষ সমগ্র বঙ্গদেশেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিহীন অথচ পরস্পর বিবাদমান অসংখ্য রাজ্যের অর্থহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে এবং শেষ পর্যন্ত একজন যোগ্য ব্যক্তির প্রাধান্য মেনে নেওয়া ভিন্ন এই সকল শক্তির কোন উপায় থাকে না। এরই ফলে ছোট ছোট রাজা-জমিদারেরা নিজেদের নিরাপত্তার কারণেই গোপাল নামক এক ব্যক্তিকে সার্বভৌম রাজা হিসাবে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ নির্বাচিত করে যিনি ৭৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই গোপাল থেকে পালবংশের প্রতিষ্ঠা। তাঁরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন।

১ক.৬.১ ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ খ্রিঃ)

গোপালের পর তাঁর পুত্র ধর্মপাল বৃহত্তম ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে জড়িয়ে পড়েন। এক্ষেত্রে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হয় গুর্জর-প্রতিহারগণ। প্রতিহার সম্রাট বৎসরাজ কনৌজের শাসক ইন্দ্রায়ুধের ঊর্ধ্বতন ছিলেন। ধর্মপাল এই ইন্দ্রায়ুধকে উচ্ছেদ করে তাঁর জায়গায় তাঁরই জ্ঞাতি চক্রায়ুধকে বসান। তার ফলে প্রতিহার বৎসরাজের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয় গঙ্গাযমুনার মধ্যবর্তী কোন স্থানে। এই যুদ্ধে ধর্মপাল পরাজিত হন। কিন্তু বৎসরাজ তাঁর বিজয়লাভের ফল ভোগ করার আগেই দক্ষিণের রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব আকস্মিকভাবে (অথবা কোন পূর্বপরিকল্পিত ব্যবস্থা অনুযায়ী) তাঁকে আক্রমণ করেন এবং বৎসরাজ পরাজিত হয়ে রাজস্থানের মরু অঞ্চলে পালিয়ে যান। ধর্মপাল ধ্রুবের বশ্যতা স্বীকার করেন। ধ্রুব স্বরাজ্যে ফিরে গেলে, প্রতিহারদের শক্তিক্ষয়ের সুযোগ নিয়ে ধর্মপাল উত্তর ভারতে প্রাধান্য স্থাপন করেন এবং কনৌজে একটা দরবার আহ্বান করে চক্রায়ুধকে সেখানকার সিংহাসনে বসিয়ে অধীনস্থ সামন্তদের দিয়ে তা অনুমোদন করিয়ে নেন।

প্রতিহাররাজ বৎসরাজের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় নাগভট কনৌজ পুনর্দখল করে চক্রায়ুধকে হটিয়ে ইন্দ্রায়ুধকেই আবার কনৌজের রাজা করে দেন এবং ধর্মপাল তার প্রতিকার করতে গিয়ে মুঙ্গের নিকটবর্তী কোন স্থানে দ্বিতীয় নাগভট্টের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। কিন্তু এবারেও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। ধ্রুবের পুত্র রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ নাটকীয়ভাবে এক্ষেত্রেও আবির্ভূত হন এবং নাগভট্টকে পরাস্ত করে ধর্মপালকে উদ্ধার করেন। দু'বার পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও আসল লাভটা ধর্মপালেরই হয়। সম্ভবত রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে ধর্মপালের কোন রাজনৈতিক বোঝাপড়া ছিল।

বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার ও কীরগণ ধর্মপালের আনুগত্য স্বীকার করেছিল। তবে এটা আনুষ্ঠানিক দাবি। ওই নামগুলির মধ্যে অনেকগুলি তখনকার দিনে বাস্তবে অনুপস্থিত ছিল। কার্যত ধর্মপাল বাংলা ও বিহারের রাজা ছিলেন। উত্তপ্রদেশের অনেকটা অংশ তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাবাধীন ছিল। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও সন্নিহিত অঞ্চলের কিছু সামন্ত রাজা আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেন। *স্বয়ম্ভুপুরান*-এ বলা হয়েছে যে নেপালও ধর্মপালের আনুগত্য স্বীকার করত।

ধর্মপাল পরমেশ্বর, পরমভট্টারক ও মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি বিক্রমশিলা ও সোমপুরী মহাবিহারদ্বয়ের প্রতিষ্ঠাতা। কোন কোন তিব্বতী গ্রন্থের মতে তদন্তপুরী বিহারও তিনি নির্মাণ করেন, যদিও এই প্রসঙ্গে গোপাল ও দেবপালের নামও করা হয়। তিনি বৌদ্ধ দার্শনিক হরিভদ্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

১ক.৬.২ দেবপাল (৮১০-৮৫০ খ্রিঃ)

ধর্মপালের পুত্র দেবপালের আমলের লেখসমূহ তাঁকে হিমালয় থেকে বিন্ধ্য ও পশ্চিম থেকে পূর্ব সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার অধিপতি বলে বর্ণনা করেছে। পাল লেখসমূহ থেকে এও জানা যায় যে তিনি পশ্চিমে কম্বোজ এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য অঞ্চল অধিকার করে প্রাগজ্যোতিষ জয় করেন, হূনদের দর্পচূর্ণ করেন এবং দ্রাবিড় ও গুর্জরদের গৌরব খর্ব করেন।

সম্ভবত কাম্বোজ অঞ্চলকেই এক্ষেত্রে হূন এলাকা বলা হয়েছে। আসাম ও ওড়িশা বিজয় তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। তাঁর গুর্জর প্রতিপক্ষ ছিলেন হয় দ্বিতীয় নাগভট্ট, অথবা রামভদ্র বা ভোজ। তাঁর দ্রাবিড় প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রকূট নৃপতি তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র অমোঘবর্ষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন কোন ক্ষুদ্র দক্ষিণী নৃপতি।

দেবপালও তাঁর পিতা ধর্মপালের মতো বৌদ্ধ ছিলেন এবং তাঁর খ্যাতি ভারতের বাইরেও বিস্তৃত হয়েছিল। মালয়েশিয়ার শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা বালপুত্রদেব দেবপালের নিকট নালন্দার একটি মঠ নির্মাণের জন্য পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলেন এবং তা মঞ্জুর হয়েছিল।

১ক.৬.৩ দেবপালের উত্তরাধিকারীগণ

দেবপালের পর মহেন্দ্রপাল, শূরপাল প্রভৃতি পালবংশীয় নৃপতিদের অধীনে পাল রাজত্বের অবক্ষয়ের সূচনা হয়। নারায়ণপালের আমলে কামরূপের হর্জরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ওড়িশার শৈলোদ্ভবরা পাল প্রাধান্য অস্বীকার করে। চন্দেল্ল ও কলচুরিদের লেখসমূহ থেকে জানা যায় যে তারা গৌড়, রাঢ়, অঙ্গ ও বঙ্গালের শাসকদের পরাজিত করে, যা থেকে মনে হয় যে খ্রিস্টীয় দশম শতকের শেষের দিকে পালদের নিজস্ব এলাকাগুলিই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে পৃথক পৃথক ভৌগোলিক সত্তায় পরিণত হয়। এই সকল অঞ্চলের শাসকরা কার্যত স্বাধীন হয়ে যান। হয়তো তাঁরা পালদের একটা আনুষ্ঠানিক আনুগত্য স্বীকার করতেন, এই মাত্র।

৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মহীপাল যখন রাজা হন তখন বঙ্গদেশই পালদের হাতছাড়া হয়ে গেছে, শুধু দক্ষিণ বিহারের মগধ অঞ্চলেই তারা কায়ক্লেশে টিকে আছে। প্রথম মহীপাল এই হতমান অবস্থা থেকে পালবংশকে উদ্ধার করেন এবং উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের কিছু অংশ পুনরায় দখল করেন যা তাঁর বাণগড় লেখ থেকে বোঝা যায়। উত্তর বিহারের অনেকটা অংশ পশ্চিমে বারাণসী পর্যন্ত এলাকা তিনি অধিকার করেন। মহীপালের আমলে বাংলাদেশে রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণ ঘটে। রাজেন্দ্র চোল দণ্ডভুক্তির ধর্মপাল, দক্ষিণ রাঢ়ের রণশূর, বঙ্গালের গোবিন্দচন্দ্র এবং উত্তর রাঢ়ের মহীপালকে পরাজিত করেন বলে তাঁর লেখে উল্লেখ করেছেন। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে সমগ্র বঙ্গদেশে মহীপালের অধিকার বজায় ছিল না। তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে ১০২৬ থেকে ১০৩৪ খ্রিঃ-এর মধ্যে কলচুরি গাঙ্গেয়দেবের সঙ্গে যুদ্ধের পরিণতিতে মহীপাল বারাণসী অঞ্চলটি হারাতে বাধ্য হন।

১ক.৬.৪ গুর্জর-প্রতিহারগণ

(ক) **প্রথম নাগভট্ট** (৭৩০-৭৫৬ খ্রিঃ) ঃ গুর্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম নাগভট্ট আরব আক্রমণ প্রতিহত করে যশস্বী হন। তাঁর পিতৃপুরুষগণ পূর্ব রাজস্থান ও মালবের কিয়দংশে যে রাজ্য স্থাপন করেন নাগভট্ট তার সীমানাকে ব্রোচ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যান। তাঁর আরব প্রতিদ্বন্দ্বী জুনাইদ বা তাঁর উত্তরাধিকারী তামিল ছিলেন কিনা সে কথা বলা শক্ত। রাষ্ট্রকূট লেখসমূহের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে প্রথম নাগভট্ট রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তিদুর্গের নিকট পরাজিত হন।

(খ) **বৎসরাজ** ঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বৎসরাজের সময়কালের সূচনা ৭৮৩ খ্রিস্টাব্দ বলে লিখেছেন। প্রথম নাগভট্টের পর তাঁর ভাই-এর দুই পুত্র ককুর এবং দেবরাজ রাজা হন। দেবরাজের উত্তরাধিকারী বৎসরাজ যিনি ৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কনৌজের সিংহাসনে তাঁর মনোনীত ইন্দ্রায়ুধকে সরিয়ে যখন পাল রাজা ধর্মপাল চক্রায়ুধকে বসান, বৎসরাজ ধর্মপালের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। গঙ্গাযমুনার দোয়াব অঞ্চলের যুদ্ধে তিনি ধর্মপালকে পরাজিত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের আকস্মিক আক্রমণে তাঁকে প্রচণ্ড ক্ষতি স্বীকার করে রাজস্থানের মরু অঞ্চলে পালিয়ে যেতে হয়। তাঁর জীবনের পরবর্তী অধ্যায়গুলি সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

(গ) **দ্বিতীয় নাগভট্ট ঃ** দ্বিতীয় নাগভট্টের রাজত্বকাল ৮১৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ধরা যেতে পারে। বৎসরাজের উত্তরাধিকারী তাঁর পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্ট। তাঁর পৌত্রের গোয়ালিয়র লেখ থেকে জানা যায় যে তিনি অন্ধ্র, সৈন্ধব, বিদর্ভ এবং কলিঙ্গের বশ্যতা আদায় করেন। তিনি চক্রায়ুধ ও বঙ্গের রাজাকে পরাজিত করেন এবং আনর্ত, মালব, কিরাত, তুরস্ক, বৎস ও মৎস্যদের পার্বত্য দুর্গগুলি জয় করেন। কয়েকটি দাবি প্রথাগত হলেও তিনি যে রীতিমত শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন এবং বিভিন্ন সামন্ত শক্তির আনুগত্য লাভ করেছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি প্রথমেই কনৌজ দখল করে ধর্মপালের মনোনীত ব্যক্তি চক্রায়ুধকে সরিয়ে নিজের লোক ইন্দ্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে বসান এবং তাঁর বাহিনী নিয়ে মুঙ্গের পর্যন্ত এগিয়ে যান। বাধা দিতে এসে ধর্মপাল তাঁর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। কিন্তু এবারেও সেই পুরাতন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ আকস্মিকভাবে এসে প্রতিহারবাহিনীকে বিধ্বস্ত করেন। নাগভট্ট বিপর্যস্ত হয়ে ফিরে যান, এবং তাঁর বিষয়ে আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।

(ঘ) **ভোজ (৮৩৬-৮৮৫ খ্রিঃ) ঃ** দ্বিতীয় নাগভট্টের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রামভদ্র তিন বছর রাজত্ব করেন। তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী ছিলেন ভোজ, যাঁর ৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত বারা-তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে ওই সময় নাগাদ মহোদয় বা কনৌজ তাঁর রাজধানী ছিল। তাঁর আমলে কনৌজ অবশেষে প্রতিহারদের আয়ত্তে আসে। তাঁর দৌলতপুর-তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, ৮৪৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তিনি যোধপুরে প্রতিহারদের পুনর্মূষিক করেন এবং গুর্জরত্রা অর্থাৎ মধ্য ও পূর্ব রাজস্থানে নিজের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। ৮৪৫ থেকে ৮৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাষ্ট্রকূটগণ, পালবংশীয় রাজাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পাল রাজ্যের বেশ কিছু অংশ দখল করে নেন এবং অমোঘবর্ষের উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণকে পরাজিত করেন। গোরখপুর অঞ্চলের কলচুরিরা তাঁর সামন্ত ছিল। বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্লরাও তাঁর অনুগত ছিল। তাঁর রাজ্য ছিল উত্তরে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত। মালব অঞ্চলও তাঁর অধীনে ছিল।

(ঙ) **পরবর্তী প্রতিহারগণ ঃ** ভোজের রাজ্যসীমা তৎপুত্র মহেন্দ্রপাল (৮৮৫-৯০৯ খ্রিঃ) বজায় রাখেন। তাঁর পরবর্তী রাজারা ছিলেন দ্বিতীয় ভোজ এবং বিনায়কপাল বা মহীপাল। শেষোক্তজন শক্তিমান নরপতি ছিলেন যেকথা অল-মাসুদি এবং তাঁর সভাকবি রাজশেখর উল্লেখ করেছেন। রাষ্ট্রকূটদের হাতে সাময়িকভাবে ভাগ্য বিপর্যয় ঘটলেও মহীপাল তাঁর হৃতরাজ্যের অনেকখানি পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন। তাঁর রাজ্যসীমা ছিল পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র, পূর্বে বারাণসী ও দক্ষিণে চান্দেরা। মহীপাল ৯৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর অযোগ্য বংশধরদের আমলে ধীরে ধীরে প্রতিহার সাম্রাজ্য একেবারেই ভেঙে পড়ে। মূলত রাষ্ট্রকূট ও চন্দেল্ল আক্রমণ, সামন্তদের স্বাধীনতা ঘোষণা ও প্রতিহার রাজাদের অযোগ্যতা ও সিংহাসনের জন্য দ্বন্দ্বই তাদের ধ্বংসের কারণ। প্রতিহার রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে তিনটি শক্তির উত্থান ঘটে—রাজস্থানের চাহমান গুজরাতের চালুক্য এবং মালবের পরমার।

১ক.৬.৫ কাশ্মীর ঃ উলার রাজবংশ

৮৫৫-৫৬ খ্রিস্টাব্দের কার্কোটবংশের পতনের পর অবন্তিবর্মা কাশ্মীরে উলার বংশের শাসনের পত্তন করেন। অবন্তিবর্মা সুশাসক ছিলেন যিনি মহাপদ্ম নামক একটি হ্রদ (বর্তমান বুলুর) থেকে খাল কেটে কাশ্মীরের সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটান। বিতস্তা নদীতেও তাঁর নির্দেশে বাঁধ দেওয়া হয়। ৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে অবন্তিবর্মার মৃত্যু ঘটলে

সিংহাসনের দাবিদারদের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় তাতে জয়লাভ করে তাঁর অন্যতম পুত্র শঙ্করবর্মা কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। শঙ্করবর্মা সম্ভবত ৮৮৫ খ্রিঃ থেকে ৯০২ খ্রিঃ-এর মধ্যে রাজত্ব করেন।

শঙ্করবর্মা বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্তী দার্বাভিসার অঞ্চলে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানকার খশগোষ্ঠীর শাসক নরবাহনকে হত্যা করেন। ত্রিগর্তের, অর্থাৎ কাংরা অঞ্চলের, রাজা পৃথিবীচন্দ্র তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। পাঞ্জাব অঞ্চলে গুজরাত নামক রাজ্যের গুর্জর রাজা অলখান তাঁর কাছে পরাজিত হয়ে চন্দ্রভাগার দক্ষিণস্থ তক্ক দেশের অধিকার তাঁকে ছেড়ে দেন। প্রতিহার মহেন্দ্রপালকেও শঙ্করবর্মার হাতে পরাজিত হয়ে কিছু অঞ্চল ছেড়ে দিতে হয়। যোদ্ধা হিসেবে সার্থক হলেও রাজা হিসেবে তিনি উৎপীড়ক ছিলেন। উরশা বা হাজারা অঞ্চলে তিনি আকস্মিকভাবে স্থানীয় বিদ্রোহীদের দ্বারা নিহত হন।

শঙ্করবর্মার হত্যার পর তাঁর নাবালক পুত্র গোপালবর্মা ৯০০ খ্রিস্টাব্দে রাজা হন, কিন্তু তিনি মন্ত্রী প্রভাকর কর্তৃক নিহত হন। তিনি শঙ্করবর্মার পুত্র বলে কথিত জনৈক সঙ্কটকে সিংহাসনে বসান। সঙ্কট দশদিন পরেই মারা যান। তখন শঙ্করবর্মার স্ত্রী সুগন্ধা নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই সময় তন্ত্রী নামক একটি সামরিক সামন্তচক্র রাজস্রষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করে। তারা রানী সুগন্ধাকে পদচ্যুত করে ৯০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রাক্তন রাজা অবন্তিবর্মার সম্পর্কিত ভ্রাতা নির্জিতবর্মা ওরফে পঙ্গুর দশমবর্ষীয় পুত্র পার্থকে রাজা করে। সুগন্ধা লুস্কপুরে পালিয়ে যান এবং ৯১৪ খ্রিস্টাব্দে তন্ত্রীদের বিরোধী একাঙ্গ নামক একটি সামরিক সামন্তচক্রের সহায়তার ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেন। কিন্তু তন্ত্রীরা একাঙ্গদের পরাজিত করে এবং সুগন্ধকে হত্যা করে।

এদিকে পঙ্গুতন্ত্রীদের উৎকোচ দিয়ে পুত্র পার্থের অভিভাবক হয়ে বসেন এবং প্রজাদের উপর দারুণ করভার চাপান। ৯২১ খ্রিস্টাব্দে নাবালক পুত্র পার্থকে উৎখাত করে পঙ্গু নিজেই রাজা হন এবং তাঁর অপর পুত্র চক্রবর্মাকে উত্তরাধিকারী করে মারা যান। তন্ত্রীরা আরও টাকার লোভে চক্রবর্মাকে সরিয়ে তাঁর সম্পর্কিত ভাই সুরবর্মাকে সিংহাসনে বসায়, এবং এক বছর পরে পূর্বোক্ত পার্থকে, আবার ৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে চক্রবর্মাকে সিংহাসনে বসায়। কিন্তু তন্ত্রীদের আরও দাবি মেটাতে না পেরে চক্রবর্মা পলাতক হন। তখন শম্ভুবর্ধন নামক জনৈক মন্ত্রী অর্থের বিনিময়ে রাজা হন।

চক্রবর্মা ডামর নামক তন্ত্রীদের বিরোধী আর একটি সামন্তচক্রের সহায়তায় তন্ত্রীদের পরাস্ত করেন ও শম্ভুবর্ধনকে নিহত করে রাজপদ পুনরায় দখল করেন। কিন্তু তিনি ৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে নিহত হন। এর পর পার্থের পুত্র উন্মত্তাবন্তীকে সিংহাসনে বসানো হয়। ৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর মন্ত্রী কমলবর্ধন তন্ত্রী, একাঙ্গ, ডামর প্রভৃতি গোষ্ঠীকে নির্মূল করেন। কিন্তু রাজনৈতিক নির্বুদ্ধিতার জন্য করায়ত্ত রাজপদ লাভ করতে অপারগ হন।

পরবর্তী রাজারা ছিলেন যশস্কর ও সংগ্রামদেব। যাঁরা উভয়েই নিহত হন। পরবর্তী রাজারা ছিলেন পর্বগুপ্ত ও ক্ষেত্রগুপ্ত। ৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে ক্ষেমগুপ্তর বিধবা দিদ্দা তাঁর নাবালক পুত্র অভিমন্যুর হয়ে সর্ব ক্ষমতা অধিকার করেন। ৯৭২ খ্রিস্টাব্দে অভিমন্যুর মৃত্যু হয়, এবং ক্ষমতালোভী রাণী দিদ্দার চক্রান্তে অভিমন্যুর তিন পুত্র-নন্দিগুপ্ত, ত্রিভুবন ও ভীমগুপ্ত পরপর নিহত হন। ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে দিদ্দা নিজেই শাসনভার গ্রহণ করেন। ১০০৩ খ্রিস্টাব্দে দিদ্দা মারা যান। কিন্তু তার আগে তিনি তাঁর ভাগ্নে লোহবংশীয় সংগ্রামরাজকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। সংগ্রামরাজ থেকে কাশ্মীরে লোহর বংশের রাজত্ব শুরু হয়।

১ক.৭ উত্তর ভারতের রাষ্ট্রশক্তির বিন্যাস (১০০০-১২০০ খ্রিঃ)

১ক.৭.১ উদভাণ্ডপুরের শাহীবংশ

সিরহিন্দ থেকে লমঘন এবং কাশ্মীর সীমান্ত থেকে মূলতান পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় শাহীবংশীয় রাজাদের রাজত্ব ছিল। তাঁর রাজধানী ছিল রাওয়ালপিন্ডি জেলার আটকের নিকট উদভান্ডপুর বা উন্দ (ওহিন্দ)। শাহীরা প্রাথমিকভাবে ভারতীয় ছিলেন না। এঁরা পরবর্তীকালে ভারতীয় জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। অলবিরুনী তাঁদের কনিষ্কের বংশোদ্ভূত বলেছেন। এঁরা তুর্কী শাহীয়া নামে পরিচিত। খ্রিস্টীয় দশম শতকের শেষের দিকে এই বংশের রাজা জয়পাল দু'বার গজনীর অধিপতি সবুক্তিগিনের নিকট পরাস্ত হন। তিনি ১০০০ খ্রিস্টাব্দে মাহমুদের হাতে বন্দী হন। ২৫০,০০০ দীনার এবং ২৫টি হাতির-বিনিময়ে তিনি মুক্তি পান। পর পর তিনবার বিধর্মীদের হাতে পরাজয়ের গ্লানিতে জয়পাল অগ্নিতে আত্মবিসর্জন দেন, এবং ১০০১ খ্রিস্টাব্দে আনন্দপাল উদভাণ্ডের সিংহাসনে বসেন।

১০০৬ ও ১০০৮ খ্রিস্টাব্দে আনন্দপাল গজনীর মাহমুদের নিকট পরাজিত হয়ে অপমানজনক শর্তে সন্ধি করতে বাধ্য হন। ১০১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান। ১০১৩ খ্রিস্টাব্দে এবং ১০২০-২১ খ্রিস্টাব্দে মাহমুদ আনন্দপালের পুত্র ত্রিলোচনপালকে পরাস্ত করেন। পঁচিশ বছর একটানা প্রতিরোধ করার পর শাহী রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। অলবিরুনী লিখেছেন ঃ "হিন্দু শাহী বংশ এখন উৎখাত প্রাপ্ত হয়েছে, এবং গোটা পরিবারের সামান্যতম অবশিষ্ট বর্তমান নেই। কিন্তু আমরা অবশ্যই বলব যে তাঁদের সকল জাঁকজমকের মধ্যেও তাঁরা যা ভাল ও ন্যায়সঙ্গত তা করার ঐকান্তিক ইচ্ছায় কোন শৈথিল্য দেখান নি, এবং তাঁরা মহৎ মনোভাব ও মহৎ সম্পর্কের মানুষ ছিলেন।"

১ক.৭.২ কাশ্মীর ঃ লোহর রাজবংশ

একাদশ শতকে কাশ্মীরের সিংহাসন লোহর বংশের সংগ্রামরাজের হাতে চলে যায়। তাঁর মন্ত্রী তুঙ্গ সুলতান মাহমুদের বিরুদ্ধে শাহী ত্রিলোচনপালকে সাহায্য করেন। এই বংশের তৃতীয় রাজা অনন্ত ডামার নামক সামন্ত গোষ্ঠী দমন করেন, দর্দদের আক্রমণ প্রতিহত করেন, চম্বার শাসক সালবাহনকে উচ্ছেদ করেন, দার্বাভিসার, ত্রিগর্ত ও ভর্তুলের উপর প্রাধান্য স্থাপন করেন। পরবর্তী রাজা ছিলেন কলস। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুশ্চরিত্র। এই দুশ্চরিত্র রাজা মারা গেলে তৎপুত্র উৎকর্ষ রাজা হন। কিন্তু তাঁকে সরিয়ে হর্ষ ক্ষমতায় আসেন।

হর্ষ ছিলেন অদ্ভুত প্রতিভাবান, বহু গুণে গুণী এবং তাঁর রাজসভা কবি, সাহিত্যিক ও বিদ্বানদের কাছে কল্পবৃক্ষের ন্যায় ছিল। তিনি বিদ্রোহী সামন্তদের দমন করেন, কিন্তু রাজৌরির শাসক ও দর্দদের বিরুদ্ধে তিনি ব্যর্থ হন। ব্যক্তিগত বহু গুণ থাকা সত্ত্বেও হর্ষ ছিলেন লম্পট-শিরোমণি ও অত্যাচরী। তাঁর করনীতি ও লুণ্ঠনপ্রবৃত্তির জন্য দিকে দিকে বিদ্রোহ দেখা যায় এবং ১১০১ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহীদের হাতে হর্ষ নিহত হন।

পরবর্তী রাজারা ছিলেন উচ্চল (১১০১-১১) এবং সুস্সল। শেষোক্তজন ১১২৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পুত্র জয়সিংহের পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং ১১২৮ খ্রিস্টাব্দে রহস্যজনকভাবে নিহত হন। জয়সিংহ বিদ্রোহী সামন্তবর্গকে নির্মম হস্তে দমন করেন এবং ১১৫৫ খ্রিঃ পর্যন্ত শান্তিতে রাজত্ব করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী হন

তাঁর পুত্র পরমানুক (১১৫৫-৬৫ খ্রিঃ) এবং তাঁর পুত্র লোহর বংশের উচ্চল শাখার শেষ রাজা বন্তিদেব (১১৬৫-৭২ খ্রিঃ)। বন্তিদেবের মৃত্যুর পর সামন্তরা বুপ্পদেব নামক ভিন্নবংশীয় একজনকে সিংহাসনে বসায়। ১১৮১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই জস্‌সক ১১৯৯ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

১ক.৭.৩ কনৌজের গাহড়বালগণ

১০১৯ খ্রিস্টাব্দে গজনীর মাহমুদের আক্রমণ এড়াতে কনৌজের প্রতিহার রাজা রাজ্যপাল বারি নামক স্থানে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু কয়েকটি লেখের সাক্ষ্যে জানা যায় যে, তারপর একটি রাষ্ট্রকূট বংশ কনৌজে কিছুকাল রাজত্ব করে। এই বংশের গোপালের রাজত্বকালে ১০৬৮ থেকে ১০৮০ খ্রিঃ-এর মধ্যে কনৌজ ইয়ামিনিদের অধিকারে আসে। চন্দ্রদেবের সময়কাল সম্বন্ধে দু'টি তারিখ পাওয়া যায় (১০৯০ খ্রিঃ ও ১১০০ খ্রিঃ)। ইয়ামিনি শাসক ইব্রাহিমের পুত্র মাহমুদ চাঁদ রায় নামক একজন হিন্দুকে কনৌজ দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত করেন। ইনিই সম্ভবত গাহড়বালবংশীয় চন্দ্রদেব যিনি পরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী মদনচন্দ্র ইয়ামিনিবংশীয় তৃতীয় মামুদ কর্তৃক পরাজিত ও বন্দী হন। কিন্তু মদনচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র (১১১৪-৫৪ খ্রিঃ) ইয়ামিনিদের পরাস্ত করে পিতাকে উদ্ধার করেন ও গৌড়ের রামপালের আক্রমণ প্রতিহত করেন। গোবিন্দচন্দ্র চন্দেল্লদের পরাজিত করে পূর্বমালব দখল করেন। তাঁর সাথে চালুক্যবংশ ও কাশ্মীর রাজবংশের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কলিঙ্গ ও উৎকলাধিপতি অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গের পশ্চিমদিকে অগ্রসর হওয়া ব্যাহত করেন এবং মিথিলার নান্যদেবের আক্রমণ রোধ করেন। তাঁর পুত্র বিজয়চন্দ্র ইয়ামিনি খুসরো মালিকের আক্রমণ প্রতিহত করেন। তাঁর পুত্র জয়চন্দ্র ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে মুইজুদ্দীন ঘুরী কর্তৃক এটাওয়া জেলার চন্দাবার নামক স্থানে পরাজিত হন। কিন্তু জয়চন্দ্রের পুত্র হরিশচন্দ্র জৌনপুর, মীর্জাপুর ও কনৌজের উপর পুনরায় অধিকার স্থাপন করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী অড়ক্কমল্লের হাত থেকে ইলতুৎমিস কনৌজ দখল করেন ১২৩৬ খ্রিঃ-এর কিছু আগে।

১ক.৭.৪ গুজরাতের চালুক্যগণ

একাদশ শতকের শুরুতে চালুক্যগণ গুজরাত অঞ্চলে শক্তিমান হয়। এই চালুক্যগণ প্রাথমিকভাবে সারস্বতমণ্ডল বা সরস্বতী নদী প্রবাহিত অঞ্চলে রাজত্ব স্থাপন করেন। এঁরাই পরে সোলাঙ্কি রাজপুত রূপে পরিচিত হন। ১০২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ভীমের আমলে সুলতান মাহমুদ গুজরাত আক্রমণ করেন ও বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করেন। ভীমের পুত্র কর্ণ (১০৬৪-৯৪ খ্রিঃ) মহারাষ্ট্রের নবসারি অঞ্চলটি জয় করেন এবং মালবের পারমারদের সঙ্গে নিষ্ফল যুদ্ধ করেন। পরবর্তী রাজা জয়সিংহ (১০৯৪-১১৪৫ খ্রিঃ) উত্তরে যোধপুরের বলি ও জয়পুরের সাম্ভর, পূর্বে ভীলসা ও পশ্চিম কচ্ছ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। পরবর্তী রাজারা ছিলেন কুমারপাল (১১৪৫-৭২ খ্রিঃ) ও অজয়পাল (১১৭২-৭৬ খ্রিঃ)। শেষোক্তের পুত্র দ্বিতীয় মূলরাজের আমলে ১১৭২ খ্রিস্টাব্দে মুইজুদ্দীন মুহম্মদ ঘুরী গুজরাত আক্রমণ করেন, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় ভীম ১২৪২ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

১ক.৭.৫ রাজস্থান ও সন্নিহিত অঞ্চলসমূহ

বয়ান-শ্রীপথ অঞ্চলে, অর্থাৎ ভরতপুরে যদুবংশীয়দের শাসন ছিল ১০০০ থেকে ১১৯২-৯৩ খ্রিঃ পর্যন্ত। কচ্ছপঘাতদের তিনটি শাখা একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত রাজত্ব করে যথাক্রমে গোয়ালিয়র, ডুবকুণ্ডু এবং নরওয়ারে। আবুপাহাড়, বাগড়, জালোর ও ভিলমালে পরমারদের কয়েকটি শাখাবংশ রাজত্ব করত একাদশ

ও দ্বাদশ শতকে। মেবারে গুহিলদের অধিকার চতুর্দশ শতকের শুরু পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। শিশোদিয়ায় গুহিলদের আর একটি শাখাবংশ রাজত্ব করত। গুহিলগণ বা গিহ্লোটবংশীয় রাজারা প্রধানত মেবারে শাসন করতেন। একাদশ শতক থেকে চতুর্দশ শতকের সূত্রপাত পর্যন্ত চাহমানদের পাঁচটি শাখা যথাক্রমে শাকম্ভরী, রণস্তম্ভপুর, নাডোল, জাবালিপুর ও দেবড়ায় রাজত্ব করত। শাকম্ভরীর চরহমানবংশীয় তৃতীয় পৃথ্বিরাজ ১১৯০-৯১ খ্রিস্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে মুহম্মদ ঘুরীকে পরাজিত করলেও ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত হন।

১ক.৭.৬ মালবের পারমারগণ

পারমার বা পাওয়ার (পারব) রাজপুতগণ মালবে, চাহমান বা চৌহান রাজপুতগণ গুজরাট ও রাজস্থানের বিভিন্ন অংশে রাজত্ব করতেন। মুঞ্জ ও সিন্ধুরাজের অধীনে মালব অঞ্চলে পারমারগণ শক্তি সঞ্চয় করে। সিন্ধুরাজের পুত্র ভোজ (১০০০-১০৫৫ খ্রিঃ) কলচুরি গাঙ্গেয়দেব ও তাঞ্জোরের চোলের সহায়তায় কল্যাণের চালুক্যবংশীয় জয়সিংহকে পরাস্ত করেন। গঞ্জাম জেলার আদিনগরের ইন্দ্ররথ, শিলাহার কেশিদেব, চালুক্য কীর্তিরাজ এবং শাকম্ভরীর চাহমানগণ তাঁর হাতে পরাজিত হন। তিনি চালুক্য সোমেশ্বর, চন্দেল্ল বিদ্যাধর ও কচ্ছপঘাত কীর্তিরাজের নিকট পরাস্ত হন। বস্তুত একমাত্র কোঙ্কন ভিন্ন তাঁর অধিকৃত সকল এলাকাই তাঁর হস্তচ্যুত হয়। তবে ১০০৮-এ তিনি গজনীর মাহমুদের বিরুদ্ধে শাহী-আনন্দপালকে সাহায্য করেন। ১০১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি আনন্দপালের পুত্র ত্রিলোচনপালকে আশ্রয় দেন। ১০৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি তুর্কীদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিজোট গঠন করেন এবং সাত মাস কাল লাহোরে দুর্গ অবরোধ করে রাখেন।

পরবর্তী পারমার নৃপতিগণ ছিলেন জয়সিংহ, উদয়াদিত্য, লক্ষ্মদেব (জগদ্দেব), নরবর্মা, যশোবর্মা, জয়বর্মা, বিন্ধ্যবর্মা ও সুভটবর্মা (মোট রাজ্যকাল ১০৫৫-১২১০ খ্রিঃ)। এই সকল রাজারা চালুক্য, চৌলুক্য, চন্দেল্ল, কলচুরি, চাহমান ও হোয়েসলদের সঙ্গে যুদ্ধ করেই শক্তি ক্ষয় করেন।

১ক.৭.৭ জেজাকভুক্তির চন্দেল্লগণ

জেজাকভুক্তির উত্তরসীমা ছিল আগ্রা থেকে শুরু করে যমুনা নদী বরাবর এলাহাবাদ গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল পর্যন্ত, দক্ষিণ সীমা ছিল বর্তমান জব্বলপুর পর্যন্ত। পশ্চিমে খাজুরাহো ও পূর্বে কালিঞ্জর জেজাকভুক্তির অন্তর্গত ছিল।

রাজা ধঙ্গের আমলে চন্দেল্লগণ প্রতিষ্ঠা পায়, যদিও চন্দেল্লকুলে কোন কীর্তিমান সম্রাটের উদ্ভব হয় নি। ধঙ্গের পৌত্র বিদ্যাধরের আমলে ১০১৯ ও ১০২২ খ্রিস্টাব্দে দু'বার গজনীর মাহমুদ কালিঞ্জর আক্রমণ করেন। বিদ্যাধর পারমার ভোজ ও কলচুরি দ্বিতীয় কোক্কলের আক্রমণ প্রতিহত করেন। পরবর্তী রাজারা ছিলেন দেবেন্দ্রবর্মা (১০৫০ খ্রিঃ) এবং তাঁর ভাই কীর্তিবর্মা (১০৭৩-১০৯০ খ্রিঃ) যিনি পাঞ্জাবের ইয়ামিনি শাসনকর্তা মাহমুদকে পরাজিত করেন। পরবর্তী রাজারা ছিলেন মল্লক্ষণবর্মা, পৃথিবীবর্মা ও মদনবর্মা যাঁরা পারমার, কলচুরি, চৌলক্য ও চাহমানদের সঙ্গে নিষ্ফল যুদ্ধ চালিয়ে যান।

১১৮২ খ্রিঃ থেকে ১২০২ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন মদনবর্মার পৌত্র পরমর্দী। ১২০২ খ্রিস্টাব্দে কুতবুদ্দিন কালিঞ্জর আক্রমণ করলে পরমর্দী অপমানজনক শর্তে সন্ধি করেন, যাতে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর মন্ত্রী অজয়দেব তাঁকে হত্যা করেন ও যুদ্ধ চালিয়ে যান। এরপরেও চন্দেল্লরা দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছিলেন।

১ক.৭.৮ ত্রিপুরীর কলচুরিগণ

ডাহল বা জব্বলপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলসমূহে দ্বিতীয় কোক্কল ও তৎপুত্র গাঙ্গেয়দেবের আমলে একাদশ শতকে কালচুরিদের বিশেষ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা ঘটে। গাঙ্গেয়দেব তুর্কী অধিকৃত কাংরা উপত্যকায় আক্রমণ চালিয়ে পাঞ্জাবের শাসক আহমদ নিয়ালতিগিনের কাশী লুণ্ঠনের (১০৩৪ খ্রিঃ) প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। গাঙ্গেয়দেবের পুত্র লক্ষ্মীকর্ণ, যিনি কর্ণ নামেও সমধিক প্রসিদ্ধ, তুর্কীদের পরাজিত করেন। তিনি বঙ্গদেশেও অভিযান করেন কিন্তু তা সফল হয়নি। নিজ কন্যা যৌবনশ্রীর সঙ্গে তৃতীয় বিগ্রহপালের বিবাহ দিয়ে তিনি পালদের সঙ্গে সন্ধি করেন। দক্ষিণ ভারতেও তিনি অনেকগুলি যুদ্ধে জয়ী হন। কর্ণ নিকটে ও দূরে অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করলেও এলাহাবাদ অঞ্চল ছাড়া আর কিছুই পাকাপাকিভাবে নিজ রাজ্যে যুক্ত করতে পারেন নি। ১০৭৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ লক্ষ্মীকর্ণের পুত্র যশঃকর্ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন যিনি বিহারের চম্পারণা ও চম্পারণ পরগনাটি নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। পরবর্তী রাজারা ছিলেন পয়াকর্ণ, নরসিংহ ও জয়সিংহ। শেষোক্তজন (১১৫৯-৮০ খ্রিঃ) বালুক্য কুমারপাল ও কুন্তলের রাজা বিজ্জলকে পরাজিত করেন এবং মালিক খুসরোর নেতৃত্বাধীন একটি তুর্কী আক্রমণ প্রতিহত করেন। তাঁর পুত্র বিজয়সিংহের লেখসমূহ থেকে জানা যায় যে তিনি ১২১১ খ্রিঃ পর্যন্ত বাঘেলখণ্ড ও ডাহলমণ্ডলের উপর নিজ কর্তৃত্ব বজায় রাখেন।

১ক.৭.৯ বঙ্গ-বিহারের পালবংশ

১০৩৮ খ্রিস্টাব্দে মহীপালের মৃত্যুর পর বঙ্গ-বিহারের পাল রাজশক্তির পুনরায় অবক্ষয় ঘটতে শুরু করে। পরবর্তী রাজাদের মধ্যে দ্বিতীয় মহীপালের আমলে দিব্য নামক জনৈক কৈবর্ত নেতা বরেন্দ্রী বা উত্তরবঙ্গ দখল করে নেন (১০৭৫ খ্রিঃ)। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই রুদোক এবং তারপর রুদোকের পুত্র ভীম বরেন্দ্রীর রাজা হন। সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর *রামচরিত* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে ভীমও বিশেষ শক্তিমান ছিলেন।

কৈবর্ত অধিকারের ফলে বঙ্গদেশ পালবংশীয় রাজাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। বিহারে দ্বিতীয় মহীপাল ও শূরপালের ভ্রাতা রামপাল ১০৭৭ খ্রিস্টাব্দে থেকে রাজত্ব করেন। তিনি চোদ্দোজন সামন্ত ও বন্ধুরাজার সহায়তায় একটি বাহিনী গঠন করেন। তাঁকে একাজে বিশেষভাবে সহায়তা করেন তাঁর মাতুল, অঙ্গের শাসক মথনদেব। এই বাহিনী গঙ্গা অতিক্রম করে ভীমকে পরাস্ত করে, এবং বরেন্দ্রী আবার পালদের অধিকারে আসে। অতঃপর রামপাল পূর্ববঙ্গের যাদবরাজ হরিবর্মার আনুগত্য আদায় করেন। তাঁর সেনাপতি তিঙ্গ্যদেব কামরূপ দখল করেন। পরে অবশ্য তিনি পালদের অধীনতা অস্বীকার করেন।

১১২০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পৃষ্ঠপোষক ও মাতুল মথনদেব মারা গেলে শোকগ্রস্থ রামপাল মুঙ্গেরে গঙ্গার জলে আত্মবিসর্জন দেন। তাঁর অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের হাতে পাল রাজত্ব ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। গয়ামণ্ডলের সামন্ত শাসক বিশ্বাদিত্যের পুত্র যক্ষপাল, মগধের শাসক বর্ণমান ও তাঁর পুত্র রুদ্রমান, মিথিলার নান্যদেব প্রভৃতি সামন্ত শক্তিবর্গ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। গাহড়বালরাজ গোবিন্দচন্দ্র ১১২৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ দিনাপুর পর্যন্ত বিহার দখল করেন। পাল শক্তির বিরুদ্ধে শেষ আঘাত হানেন কলিঙ্গাধিপতি অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গা এবং সেনবংশীয় বিজয়সেন। ১১৬২ খ্রিঃ নাগাদ বঙ্গ-বিহারে পাল শাসন অবলুপ্ত হয়ে যায়।

১ক.৭.১০ বঙ্গদেশের সেনবংশ

সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা বলে কথিত সামন্তসেন সম্ভবত পালরাজাদের সামন্ত ছিলেন এবং রাঢ় অঞ্চলে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। সামন্তসেনের পুত্র হেমন্তসেন বঙ্গ কলচুরি আক্রমণের সুযোগে রাঢ় অঞ্চলে নিজের শক্তি আরও বাড়ান। উত্তরবঙ্গে কৈবর্ত অধিকারের পর শূরপাল ও রামপাল সম্ভবত তাঁর আশ্রয় নেন।

১০৯৫ খ্রিস্টাব্দে হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন রাজা হন। তিনি কলিঙ্গের গঙ্গাবংশীয় রাজা অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন এবং গঙ্গার পশ্চিমতীরে হুগলী জেলা পর্যন্ত জয় করেন। তিনি পালরাজাদের সামন্ত বীর (কোটাটবীর বীরগুণ) ও বর্ধনকে (কৌশম্বীর দ্বোরপবর্ধন) পরাস্ত করেন, এবং গাহড়বাল গোবিন্দচন্দ্রের বিরুদ্ধে একটি নৌ-অভিযান প্রেরণ করেন। এই অভিযানকালেই তিনি মিথিলার নান্যদেবকে পরাস্ত করেন। অতঃপর তিনি বঙ্গালের যাদবরাজা ভোজবর্মা বা তাঁর উত্তরাধিকারীকে পরাস্ত করেন এবং মদনপালের হাত থেকে বরেন্দ্রী অধিকার করেন। তিনি কামরূপের রাজাকেও, সম্ভবত রায়ারিদেবকে, পরাজিত করেন এবং অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রাঘবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তাঁর দু'টি রাজধানী ছিল, একটি বিক্রমপুর, অপরটি বিজয়পুর (নদীয়া)।

বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন রাজা হন ১১৫৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি গয়া অঞ্চলের জনৈক গোড়রাজ গোবিন্দপালকে পরাজিত করেন। তাঁর রাজত্ব ছিল মূলত বঙ্গ, রাঢ়া, বাগড়ি, বরেন্দ্রী ও মিথিলা নিয়ে। আশেপাশের এলাকাগুলিতেও তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব ছিল।

১১৭৮ খ্রিস্টাব্দে বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন সিংহাসনারোহণ করেন। তাঁর সাতটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে যা থেকে বোঝা যায় যে পিতা ও পিতামহের অর্জিত রাজ্য তিনি বজায় রেখেছিলেন। ১১৮৩ খ্রিঃ থেকে ১১৯২ খ্রিঃ-এর মধ্যে কোন সময়ে গাহড়বালরাজ জয়চন্দ্র পূর্বদিকে তাঁর রাজ্য বোধগয়া পর্যন্ত বিস্তার করেন। কিন্তু লক্ষ্মণ সেন তাঁকে পরাস্ত করেন। আসামেও তিনি সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তাঁর উত্তরাধিকারীদের লেখসমূহে তাঁকে কাশী ও কলিঙ্গবিজেতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা তুর্কী আক্রমণ। এই আক্রমণ চালিয়েছিলেন মুহম্মদ-বখতিয়ার যিনি ১২০২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ নদীয়া ও উত্তরবঙ্গ জয় করেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গে লক্ষ্মণ সেন তারপরেও রাজত্ব করেন। ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মণ সেন মারা গেলে তাঁর উত্তরাধিকারী হন বিশ্বরূপ সেন।

১ক.৮ অনুশীলনী

১। হর্ষবর্ধনের নেতৃত্বে কনৌজের উত্থান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। ভারতে আরব আক্রমণের বর্ণনা দিন।

৩। আরব আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক পটভূমি সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করুন।

৪। টীকা লিখুন

(ক) ধর্মপাল

(খ) কাশ্মীরের কার্কোটিক বংশ

(গ) গুর্জর-প্রতিহারগণ

(ঘ) উদভাণ্ডপুরের শাহীবংশ

(ঙ) বঙ্গাদেশের সেনবংশ

১ক.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। আর. সি. মজুমদার : *এজ অফ ইম্পিরিয়াল কনৌজ, ভারতীয় বিদ্যাভবন, বম্বে (১৯৬১)। স্ট্রাগল ফর এম্পায়ার : বম্বে, (১৯৬১)*।

২। এইচ. সি. রে : *ডাইনেস্টিক হিষ্ট্রি অফ নর্দান ইন্ডিয়া, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, লন্ডন, (রিপ্রিন্ট (১৯৭২) হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল,* প্রথম খণ্ড (১৯৪১)।

৩। রমেশচন্দ্র মজুমদার : *বাংলাদেশের ইতিহাস,* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)।

৪। সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় : *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস,* (১ম ও ২য় খণ্ড)।

একক ১খ ☐ আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে বাংলা (৬০০-১২০৫ খ্রিঃ)

গঠন

১খ.১ উদ্দেশ্য

১খ.২ প্রস্তাবনা

১খ.৩ শশাঙ্ক

- ১খ.৩.১ শশাঙ্কের রাজ্যসীমা
- ১খ.৩.২ শশাঙ্কের শাসনব্যবস্থা
- ১খ.৩.৩ শশাঙ্কের শাসনকালীন সময়ে সমাজব্যবস্থা
- ১খ.৩.৪ শশাঙ্ক-পরবর্তীকালে বাংলার অবস্থা

১খ.৪ পালবংশ

- ১খ.৪.১ ধর্মপাল
- ১খ.৪.২ দেবপাল
- ১খ.৪.৩ মহেন্দ্রপাল
- ১খ.৪.৪ শূরপাল
- ১খ.৪.৫ পরবর্তী পালরাজগণ

১খ.৫ পালবংশের সমসাময়িক বাংলার অন্যান্য রাজবংশ

- ১খ.৫.১ দেববংশ
- ১খ.৫.২ চন্দ্রবংশ
- ১খ.৫.৩ বর্মনবংশ
- ১খ.৫.৪ অন্যান্য বংশ

১খ.৬ সেন বংশ

- ১খ.৬.১ বিজয় সেন
- ১খ.৬.২ বল্লাল সেন
- ১খ.৬.৩ লক্ষ্মণ সেন
- ১খ.৬.৪ বিশ্বরূপ সেন

১খ.৭ পালদের শাসনকাঠামো
১খ.৭.১ মন্ত্রী, সচিব এবং অমাত্য
১খ.৭.২ সৈন্যবাহিনী
১খ.৭.৩ পুলিশ বিভাগ
১খ.৭.৪ মহাফেজখানা
১খ.৭.৫ রাজস্ব বিভাগ
১খ.৭.৬ মুদ্রাব্যবস্থা
১খ.৮ সেনদের শাসন কাঠামো
১খ.৮.১ প্রশাসনিক বিভাগ
১খ.৮.২ রাজকর্মচারী
১খ.৮.৩ ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা
১খ.৮.৪ উপসংহার
১খ৯ অনুশীলনী
১খ.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১খ.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন

- শশাঙ্কর শাসনকাল
- পাল রাজবংশ ও তাঁদের শাসনব্যবস্থা, এবং
- সেন রাজবংশ ও তাঁদের শাসনব্যবস্থা

১খ.২ প্রস্তাবনা

আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে বাংলার উত্থানের ইতিহাস বুঝতে হলে আমাদের শুরু করতে হবে অন্তত গুপ্তযুগ থেকে। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তির ভিত্তিতে মনে করা হয় যে তিনি বাংলার দু'জন রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। এঁরা হলেন নাগদত্ত ও চন্দ্রবর্মন। নাগদত্ত ছিলেন পুণ্ড্র বা উত্তরবঙ্গের রাজা। বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়ায় পাওয়া প্রস্তরলিপির ভিত্তিতে চন্দ্রবর্মনকে বলা যায় 'পুষ্করণাধিপতি'। বাঁকুড়া ও সন্নিহিত অঞ্চল পুষ্করণ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সমকালীন বাংলার অন্য কোন অঞ্চলে আর কোন রাজা রাজত্ব করতেন কিনা তা জানা যায় না। কিন্তু উত্তর ভারতের পরাজিত বিশিষ্ট রাজাদের মধ্যে নাগদত্ত ও চন্দ্রবর্মনের উল্লেখ এ কথাই প্রমাণ করে যে আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে বাংলা তখন মর্যাদালাভ করেছিল। নাগদত্ত ও চন্দ্রবর্মনের রাজ্যদু'টি সমুদ্রগুপ্ত তাঁর

সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের পূর্ব-প্রান্তের প্রত্যন্ত দেশ ছিল সমতট, অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা, নোয়াখালি এবং ভারতের ত্রিপুরা অঞ্চল। কুমিল্লার গুণাইঘরে পাওয়া বৈন্যগুপ্তের তাম্রশাসন (৫০৭ খ্রিস্টাব্দ) থেকে জানা যায় যে ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বভাগে সমতট অঞ্চলও গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। গুপ্তরাজাদের তখন পতনোন্মুখ অবস্থা। তাই ৫৪৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ গুপ্তদের অধিকারে থাকলেও আঞ্চলিক শক্তিগুলি এই সময় থেকেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হয়। এই পর্বের তিনজন রাজার তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। এঁরা হলেন ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র এবং সমাচারদেব। ধর্মাদিত্যের দু'টি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে বাংলাদেশের ফরিদপুর অঞ্চল থেকে। তার একটিতে নব্য-অবকাশিকার 'উপরিক' নাগদেব এবং জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ নয়সেনের নাম পাওয়া গেছে। গোপচন্দ্রের অষ্টাদশ রাজ্যবর্ষের ফরিদপুর তাম্রশাসনেও এই দু'জনের উল্লেখ আছে। কাজেই ধর্মাদিত্য ও গোপচন্দ্রের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা না জানা গেলেও কালানুক্রমের দিক থেকে এঁদের কাছাকাছি আনা যেতে পারে। গোপচন্দ্রের প্রথম রাজ্যবর্ষের তাম্রশাসনটি পাওয়া গেছে বর্তমান ওড়িশার বালেশ্বর অঞ্চল থেকে। অপর একটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে বর্ধমান জেলা থেকে। ফলে, আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে গোপচন্দ্রের উত্থানের ইতিহাস সম্পূর্ণ না জানা গেলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে তাঁর রাজত্বকালেই বাংলার বৃহত্তর অঞ্চল গুপ্তবংশীয় অধিকার থেকে বেরিয়ে আসে এবং আঞ্চলিক শক্তির ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাচারদেব সম্ভবত ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর দু'টি তাম্রশাসনই ফরিদপুর অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে।

১খ.৩ শশাঙ্ক

শশাঙ্ক এঁদের উত্তরসূরি। কোনও কোনও ঐতিহাসিক তাঁকে সমাচারদেবের পুত্র ও উত্তরাধিকারী বলেছেন। আবার কেউ বা তাঁকে গুপ্তবংশীয় রাজাই বলতে চান, কারণ বাণভট্টের *হর্ষচরিত*-এর একটি পাণ্ডুলিপিতে তাঁকে নরেন্দ্রগুপ্ত নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ সমস্তই অনুমান। শশাঙ্ক তাঁর তাম্রশাসনে নিজের বংশপরিচয় কিছুই দেন নি। বিহারের রোহ্‌তাসগড়ে পাওয়া সীলমোহরের ছাঁচ থেকে এইটুকুই শুধু নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল 'মহাসামন্ত' হিসেবে। কিন্তু কোন্ সার্বভৌম রাজার তিনি 'মহাসামন্ত' ছিলেন তা সঠিকভাবে বলার মত কোন উপাদান ঐতিহাসিকদের হাতে নেই। ফলে, পণ্ডিতদের মধ্যে এ বিষয়ে ঐক্যমত নেই। কেউ বা বলেন বপ্প-ঘোষবাট তাম্রশাসনের জয়নাগ ছিলেন তাঁর অধিরাজ কারণ তিনিও ছিলেন কর্ণসুবর্ণের সঙ্গে যুক্ত। এই কর্ণসুবর্ণ পরবর্তীকালে শশাঙ্কের রাজধানী হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আবার অনেকে মনে করেন গৌড় তখন ছিল মৌখরি রাজা ঈশানবর্মনের গৌড় জয়ের উল্লেখ থাকলেও অনেকে বলেন যে এই সময় মালবের উত্তরকালীন গুপ্তরাজারা বাংলা-বিহার অঞ্চল মৌখরিদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। সেইজন্যই এই বংশের মহাসেনগুপ্তর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র তীরবর্তী কামরূপ জয় করা। শশাঙ্ক এই মহাসেনগুপ্তরই মহাসামন্ত ছিলেন বলে এইসব ঐতিহাসিকরা মনে করেন।

'মহাসামন্ত' থেকে সার্বভৌম রাজা হিসেবে শশাঙ্কের উত্তরণ ইতিহাসও আমাদের অজানা। এ প্রসঙ্গে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মনের দু'টি তাম্রশাসনের উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই তাম্রশাসন থেকে তাঁর পিতা সুস্থিতবর্মার মৃত্যুর ঠিক পরে গৌড়ীয় সেনাদের কামরূপ আক্রমণের খবর পাওয়া যায়। দুই রাজপুত্র, সুপ্রতিষ্ঠিতবর্মন ও

ভাস্করবর্মন, বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ চালালেও অবশেষে বন্দী হন। শত্রুরা অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁদের স্বরাজ্যে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। এই গৌড়ীয় সেনারা কোন্ রাজার হয়ে কামরূপ আক্রমণ করেছিল এবং কেনই বা তারা দুই বন্দী রাজকুমারকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল তা জানা নেই। তবে, অনুমান করা হয় যে মহাসেনগুপ্তই গৌড় সেনাদের নিয়ে কামরূপ আক্রমণ করেন। তিনি যখন দূরদেশে বিজয়াভিযান নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তখন তাঁর মালব রাজ্য অধিকার করে নেন দেবগুপ্ত। পরবর্তীকালে দেবগুপ্ত ও শশাঙ্ক জোটবদ্ধ হবার ঘটনা থেকে মনে হয় এঁরা দুজনে মিলে একই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মহাসেনগুপ্তকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। ফলে, দেবগুপ্ত হলেন মালবরাজ আর শশাঙ্ক হলেন গৌড়ের রাজা। এই সমস্ত রাজনৈতিক পালাবদলের গোলযোগের সুযোগেই কামরূপের দুই রাজপুত্র কিছুটা দৈবানুগ্রহে এবং কিছুটা তাঁদের নিজেদের গুণবত্তায় মুক্তি পেয়ে যান। আনুমানিক ৬০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শশাঙ্কের রাজত্বের শুরু বলে ধরে নেওয়া হয়।

শশাঙ্কের রাজত্বের শুরুতেই তাঁকে উত্তর ভারতের রাজনীতির আবর্তে জড়িয়ে পড়তে হয় এবং একটি বিতর্কিত ঘটনার নায়ক হিসাবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। উত্তরকালীন গুপ্তবংশীয় রাজাদের সঙ্গে মৌখরিদের ছিল বহুদিনের বিরোধ। দেবগুপ্ত মালবের সিংহাসন অধিকার করে মৌখরিরাজ গ্রহবর্মাকে আক্রমণ করেন। কনৌজরাজ গ্রহবর্মনের স্ত্রী রাজ্যশ্রী ছিলেন থানেশ্বরের (বর্তমান হরিয়ানা) পুষ্যভূতিবংশীয় প্রভাকরবর্ধনের কন্যা। ঠিক যে সময়ে দেবগুপ্ত কনৌজ আক্রমণ করেন তখন প্রভাকরবর্ধন মারা গেছেন ও রাজ্যবর্ধন সিংহাসনে বসেছেন। গ্রহবর্মনের মৃত্যু ও রাজ্যশ্রীর বন্দী হবার খবর পেয়েই রাজ্যবর্ধন কনৌজের দিকে যাত্রা করেন। তিনি দেবগুপ্তদের পরাজিত করলেও কোন একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে নিহত হন। রাজ্যবর্ধনের পর তাঁর ভাই হর্ষবর্ধন রাজা হন। হর্ষবর্ধনের রাজসভার সঙ্গে যুক্ত লেখক বাণভট্ট এবং হর্ষবর্ধনের পরিসেবাধন্য চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ এই মৃত্যুর জন্য শশাঙ্ককে দায়ী করেছেন। বাণভট্ট লিখেছেন, হর্ষবর্ধন গৌড়রাজকে নিহত করে ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা করেন। এইভাবে বাংলার ইতিহাস উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাচক্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ল। বিচ্ছিন্ন আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে শশাঙ্কর উত্থানকে দেখা আর সম্ভব নয়।

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর ঘটনা যেহেতু বাংলার ইতিহাসের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তাই এটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ দাবি করে। হর্ষবর্ধন তাঁর দু'টি তাম্রশাসনেই বলেছেন যে সত্যানুরোধ রাখবার জন্য শত্রুভবনে রাজ্যবর্ধনকে প্রাণ দিতে হয়। শত্রুর নাম কিন্তু কোন লেখতেই নেই। বাণভট্ট তাঁর *হর্ষচরিত*-এ লিখেছেন, গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে রাজ্যবর্ধনের বিশ্বাস অর্জন করেন। তারপর তিনি যখন স্বভবনে একাকী, মুক্ত-শস্ত্র ও বিশ্রব্ধ অবস্থায় ছিলেন তখন তাঁকে হত্যা করা হয়। হর্ষবর্ধনের টীকাকার শঙ্কর বহু দিন পরে এই ঘটনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন যে শশাঙ্ক নাকি তাঁর মেয়ের সঙ্গে রাজ্যবর্ধনের বিয়ের মিথ্যা প্রস্তাব দিয়ে তাঁকে প্রলুব্ধ করেছিলেন। আর, হিউয়েন সাঙ লিখেছেন, শশাঙ্ক প্রায়শই বলতেন যে প্রতিবেশী সঙ রাজার রাজত্ব তাঁর নিজের রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই মন্ত্রীরা রাজ্যবর্ধনকে একটি আলোচনায় ডাকেন এবং সেখানেই তাঁকে হত্যা করা হয়।

এই সমস্ত বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে শশাঙ্ক অন্যায়ভাবেই রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু রমাপ্রসাদ চন্দ, রমেশ চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ অনেকেই মনে করেন যে এক তরফের বিবরণ থেকে কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না, বিশেষত সূত্রগুলি যখন নিজেরাই পরস্পর বিরোধী ও অ-সম্ভাব্য

সংবাদ পরিবেশন করে। শশাঙ্ক এই মৃত্যুর সঙ্গে কোনরকমভাবে জড়িত হয়ে থাকলেও তা তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধির ও রাজ্যবর্ধনের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অভাবের প্রকাশ হিসাবেই দেখা উচিত। রাজ্যবর্ধনের উপদেষ্টারা তাঁকে সঠিক পথে চালিত করতে পারেননি—এটাই আসল সত্য।

শশাঙ্কের উল্লেখ আছে এমন চারটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। এর মধ্যে দু'টি পাওয়া গেছে মেদিনীপুর থেকে, একটি পাওয়া গেছে মেদিনীপুর জেলারই এগরা থেকে এবং চতুর্থ লেখটি পাওয়া গেছে ওড়িশার গঞ্জাম থেকে। ওড়িশার বালেশ্বর অঞ্চলের কয়েকটি লেখও শশাঙ্কর রাজত্বের উপর আলোকপাত করে, যদিও এই লেখগুলিতে শশাঙ্কের নাম পাওয়া যায় না। এই তাম্রশাসনগুলির সাহায্যে শশাঙ্কর রাজ্যবিস্তার, রাজ্যশাসন পদ্ধতি ও সমকালীন আর্থ-সামাজিক সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়।

১খ.৩.১ শশাঙ্কর রাজ্যসীমা

গঞ্জাম তাম্রশাসন থেকে বোঝা যায় যে ৬১৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই শশাঙ্কর রাজ্যসীমা উত্তরবঙ্গের গৌড় থেকে দক্ষিণে ওড়িশার কোঙ্গদ অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। ওড়িশার দু'টি রাজবংশের রাজাদের পরাজিত করে তাঁর পক্ষে এই রাজ্যবিস্তার করা সম্ভব হয়েছিল। উত্তর ওড়িশায় তিনি মানবংশীয় কোনও রাজাকে পরাজিত করে তোসলী অঞ্চল জয় করেন। কোঙ্গদ অঞ্চলে তিনি শৈলোদ্ভববংশীয় দ্বিতীয় মাধববর্মাকে পরাজিত করেন। শৈলোদ্ভব রাজা শশাঙ্কর সামন্ত হিসাবে কোঙ্গদ শাসন করতে থাকেন। কিন্তু উত্তর ওড়িশা তিনি তাঁর নিজের শাসনাধীনে আনেন। শশাঙ্ক মেদিনীপুর তাম্রশাসনে মহাপ্রতিহার শুভকীর্তিকে দণ্ডভুক্তির শাসনকর্তা হিসাবে দেখা যায়। সোরো তাম্রশাসনে মহাপ্রতিহার, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, অন্তরঙ্গ সোমদত্ত বলে একজনের নাম পাওয়া গিয়েছিল। যদিও তিনি কোন্ রাজার অধীনে ছিলেন তা জানা ছিল না। মেদিনীপুরের দ্বিতীয় তাম্রশাসনটিতেও সোমদত্তের নাম থাকায় পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে এই দুই সোমদত্ত একই ব্যক্তি। এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলে বলা যায় যে সোমদত্ত প্রথমে শশাঙ্কের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসাবে জীবন শুরু করলেও পরবর্তী কোন সময়ে তিনি সামন্ত পদে উন্নীত হন এবং শশাঙ্কের উনিশ রাজ্যবর্ষে সোমদত্ত উৎকল দেশের সঙ্গে দণ্ডভুক্তিও শাসন করতে থাকেন। এইভাবে সাম্রাজ্যের কিছু অংশ স্বশাসনাধীনে রেখে এবং বাকী অংশ সামন্তদের সাহায্যে তিনি শাসন করতে থাকেন। শশাঙ্কর রাজত্বের বিস্তার সম্পর্কে আমাদের সঠিক তথ্য নেই। তাঁর নামাঙ্কিত কিছু মুদ্রা গৌড় বঙ্গ সমতট অঞ্চলে পাওয়া গেছে। এছাড়া উৎকল-কঙ্গোদ ও মগদ-বুদ্ধগয়া অঞ্চল তাঁর শাসনাধীন ছিল, ফলে এ অনুমান হয়তো মিথ্যা নয় যে শশাঙ্কর সময়ে সমগ্র বাংলা একই রাজচ্ছত্রের অধীনে আনা সম্ভভব হয়েছিল।

শশাঙ্ককে নিহত করে ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার সংকল্প হর্ষবর্ধনের থাকলেও সে ইচ্ছা ফলপ্রসূ হয়েছিল বলে মনে হয় না। বহু পরবর্তী যুগের বৌদ্ধ গ্রন্থ *আর্য-মঞ্জু-মূলকল্প* পুণ্ড্রবর্ধনের যুদ্ধে হর্ষবর্ধনের হাতে শশাঙ্কর পরাজয়ের কথা বললেও তা অসমর্থিত। হর্ষবর্ধন তাঁর কোন লেখাতেই এই বিজয়ের কথা লেখেননি। বরং হিউয়েন সাঙ-এর লেখা থেকে মনে হয় যে শশাঙ্কর মৃত্যুর পরই হর্ষবর্ধন পূর্বদিকে ওড়িশা পর্যন্ত বিজয় অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। এই অভিযানে হর্ষবর্ধনের মিত্র কামরূপরাজ ভাস্করবর্মনও তাঁর সহযোগী ছিলেন। ভাস্করবর্মনের নিধনপুর তাম্রশাসনটি সম্ভবত এই সময়েই কর্ণসুবর্নের জয়স্কন্ধাবার থেকে দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে শশাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য তাঁর মৃত্যুর পর লুপ্ত হয়ে যায়।

১খ.৩.২ শশাঙ্কর শাসনব্যবস্থা

এই যুগে ভুক্তি-বিষয়-বীথী-গ্রাম এইভাবে প্রাদেশিক ভাগগুলি বিন্যস্ত। শশাঙ্কর আমলের শাসনব্যবস্থার মূল কাঠামোটি ছিল গুপ্তযুগের মতোই। রাজ্য কয়েকটি বড় বিভাগে বা ভুক্তিতে সম্ভবত বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেকটি বিভাগ একাধিক বিষয়ে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিছু গ্রাম। কিছু অঞ্চলে বিষয় ও গ্রামের মধ্যে আরেকটি রাজ্যশাসন একক-বীথীও প্রত্যক্ষ হয়। শাসনকার্যের অনেকটাই, যেমন জমি কেনাবেচা ও তার দলিল তৈরি ইত্যাদি বিষয় অধিকরণ থেকেই পরিচালিত হত। বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তত দু'টি বিষয়ের কথা শশাঙ্কর তাম্রশাসন থেকে জানা যায়—একটি তাবীর বিষয়, অন্যটি একতাক্ষ বিষয়। তাবীদের বিষয় অধিকরণটি ছিল ব্রাহ্মণ প্রধান। এই খবরটুকু ছাড়া সেখানকার কার্যাবলী সম্পর্কে আর প্রায় কিছুই জানা যায় না। কিন্তু একতাক্ষ বিষয় সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেছে। একতাক্ষ বিষয়ে এখনকার পঞ্চায়েত বোর্ডের মতো কোন সংস্থা ছিল। এই সংস্থায় পঁয়ত্রিশ অথবা আরও বেশি সদস্য ছিলেন। যে জমির দান উপলক্ষ্যে এগরা তাম্রশাসনটি লেখা হয়েছিল তাতে পঁয়ত্রিশ জন সদস্যের অনুমোদনের উল্লেখ আছে। এই সদস্যদের পরিচিত থেকে বোঝা যায় যে একাধিক গ্রামের প্রতিনিধিদের দ্বারা এই সংস্থা পরিচালিত হত। সদস্যদের তালিকাটি দীর্ঘ হলেও সংস্থার গঠনপ্রণালী বোঝার জন্য সদস্য পরিচিতি জানা দরকার। একতাক্ষ বিষয়ের শাসনকার্যালয়ে অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন মহামহত্তর স্কন্দসেন ও নাগসেন। ঐ অঞ্চলের অগ্রহার বা নিষ্কর জমি ভোগকারী অনেকেই ছিলেন এই সংস্থার সদস্য। এঁদের মধ্যে ছিলেন একতাক্ষর পট, ত্রাণেক অগ্রহারের নাগদেব ও অনন্তদেব, তরোক্তদর্ভ অগ্রহারের মহামহত্তর ধর্মগুপ্ত ও যজ্ঞবসু, লোড্ডাবা অগ্রহারের মহামহত্তর সোমদেব ও গুহদেব, আখবটয়িক অগ্রহারের গোধ্যক্ষিঘোষ ও মোক্ষদেব। অগ্রহার সাধারণত ব্রাহ্মণদের দেওয়া হলেও এঁরা সবাই ব্রাহ্মণ ছিলেন কিনা তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এ কথা বলা যায় যে, তাঁরা ঐসব অগ্রহারের বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। অনেকেই ছিলেন মহামহত্তর পদাধিকারী। এইসব নিষ্কর জমিস্বত্বভোগকারীরা ছাড়াও সভার সদস্য হিসেবে ছিলেন বিংশতি খড্ডানের মহামহত্তর মহীভদ্র, রাত এবং তাঁর একটি ছাত্র, মৃগাটার মহত্তর গোমিদত্ত, গুর্জারপদ্রকের ভট্ট ধনপাল, কাপলাশকের ভট্ট গোপালদেব, সর্ষপবাসিনীর মহাদেব ও ব্রাহ্মণ পদ্রকের রৈথিস্বামী। নিষ্কর জমি ভোগ না করলেও এঁরা অনেকেই যে ব্রাহ্মণ ছিলেন তা এঁদের ভট্ট, স্বামী ইত্যাদি নামাংশ থেকেই বোঝা যাচ্ছে। সামাজিক স্তরে এঁরা যে সবাই সমগোত্রিয় ছিলেন না তাও বোঝা যাচ্ছে মহামহত্তর, মহত্তর ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার ও অ-ব্যবহার থেকে। অপর কয়েকজন সদস্যকে বিশেষ কোন স্থানের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় নি। যেমন, মহামহত্তর বৎসশর্মা, মহাপ্রধান উদয়চন্দ্র, প্রধান জয়দেব, প্রধান ধ্রুবদ, প্রধান যশোনাগ, প্রধান বান্ধবনাগ। রাজকীয় কর্মচারীদের মধ্যে ছিলেন বৈষয়িক অনাম, কারণিক প্রবুদ্ধদত্ত, সমুদ্রদত্ত, উদ্যোতসিংহ, পুস্তপাল জিনসেন, আদামর, অচোন এবং স্থায়িপাল শ্রীধর্ম ও স্বস্তি।

একতাক্ষ বিষয়ের কেউ যদি জমি বেচা-কেনা বা দান করতে চাইতেন তবে তাকে এই সমিতির কাছে আবেদন করতে হত। অনুমোদিত হলে তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মচারীদের উদ্দেশে বিজ্ঞাপিত করা হত। গুপ্তযুগে এ ধরনের সমিতির গ্রামস্তর থেকে শুরু করে বিষয়স্তর পর্যন্ত ছিল। গ্রামের জমি সংক্রান্ত আলোচনায় গ্রামের প্রতিনিধিরাই অংশ নিতে। কোটিবর্ষ বিষয়ের মতো উন্নত শহরাঞ্চলে এ ধরনের বিষয়

সমিতির সদস্য হতেন শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, কুলিকদের মতো ব্যবসায়িক ও কারিগরী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা। কুমারমাত্য, কায়স্থ প্রভৃতি রাজকর্মচারীদের সহায়তায় এঁরা বিষয় সংক্রান্ত নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন। শশাঙ্কর তাম্রশাসনে বিষয়-শাসনাধিকরণে এঁদের অনুপস্থিতি উল্লেখ সময়ে থাকা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু তাঁদের ক্ষমতা ও গঠন প্রণালী জানার মতো কোন উপাদান নেই। এসব সত্ত্বেও বলা যায় যে শশাঙ্কের আমলেও গ্রামগুলি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো ছিল না। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমতের ভিত্তিতে গ্রামীণ প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বিষয় অধিকরণের অনেক কাজ নির্বাহ হত।

শশাঙ্কর তাম্রশাসনগুলি থেকে যে সমস্ত রাজকর্মচারী পদের কথা জানা যায় সেগুলি হত অমাত্য, মহাপ্রতিহার, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, অন্তরঙ্গ ইত্যাদি। নীহাররঞ্জন রায়-এর মতে "বাংলাদেশে এই আমলেই পুরোপুরি সামন্ততন্ত্র রচনারও সূত্রপাত দেখা যায়।"

১খ.৩.৩ শশাঙ্কর শাসনকালীন সময়ে সমাজব্যবস্থা

শশাঙ্কর শাসনকালীন সময়ের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে জনজীবন তখনও ছিল স্তর বিন্যস্ত। সামাজিকভাবে ব্রাহ্মণরা ছিলেন সম্মানিত এবং শাসনকাজের সঙ্গে তাঁরা অনেকেই যে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ছিলেন সে কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মণরাও সবাই সমমর্যাদা সম্পন্ন বা সমক্ষমতা সম্পন্ন ছিলেন এ কথা ভাববার কোন কারণ নেই। রাজকর্মচারীরা অনেকেই ছিলেন ধনাঢ্য। শশাঙ্কের রাজ্যভুক্ত অঞ্চলের সব ক'টি তাম্রশাসনই উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও সামন্তদের ভূমিদানের স্বীকৃতি আছে। এগরা তাম্রশাসনে চণ্ডাল পুষ্করিণীর উল্লেখ থাকায় দীনেশ চন্দ্র সরকার মনে করেন যে জমিতে স্থায়ী প্রজাস্বত্ব না থাকলে পুকুর খোঁড়া যায় না, কাজেই বোধহয় ঐ অঞ্চলে চণ্ডালদের কিছু প্রতিষ্ঠা ছিল। কিন্তু চণ্ডালদের পৃথক পুষ্করিণী থাকার অর্থ সমাজের নিম্নস্তরে তাদের অবস্থিতি। তাদের ছোঁয়ায় অন্য পুকুরের জল দূষিত হবে বলে মনে করা হত।

সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কেও কিছু বলা মুশকিল। এগরা তাম্রশাসনে 'পণ' নামের মুদ্রার কথা থাকলেও তা কড়ির গণনার মানও হতে পারে। গুপ্তযুগেই সাধারণ বেচা-কেনার মাধ্যম ছিল কড়ি। শশাঙ্কর আমলেও সেই ব্যবস্থা প্রচলিত থাকা সম্ভব। শশাঙ্কর নামাঙ্কিত কিছু স্বমুর্ণদ্রাও পাওয়া গেছে। এগুলি গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্ত প্রচলিত সুবর্ণ ও অর্ধ-সুবর্ণ মানের। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সোনার সঙ্গে অন্য ধাতু প্রচুর পরিমাণে মেশানো হয়েছে। এ ধরনের মুদ্রা সাধারণভাবে অর্থনৈতিক অবক্ষয়েরই পরিচয় দেয়।

শশাঙ্ক ছিলেন শৈব। তাঁর মুদ্রাতেও তাই শিবের প্রতিকৃতি। হিউয়েন সাঙ বলেছেন, শশাঙ্ক ছিলেন বৌদ্ধ-বিদ্বেষী। তিনি নাকি গয়ার বোধিবৃক্ষটি কেটে ফেলেছিলেন এবং ফলে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান। কিন্তু এসব কথা সমর্থনযোগ্য নয়, কারণ শশাঙ্কর রাজধানী কর্ণসুবর্ণের কাছেই ছিল বিখ্যাত রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার যেখানে হিউয়েন সাঙও এসেছিলেন। সুধীররঞ্জন দাসের নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উৎখননের ফলে এই মহাবিহারটিকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এটি মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটি অঞ্চলে অবস্থিত।

১খ.৩.৪ শশাঙ্ক-পরবর্তীকালে বাংলার অবস্থা

শশাঙ্কর মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন তাঁর রাজ্যজয় করলেও সে অধিকার সুদৃঢ় হয় নি। ৬৪৬ বা ৫৪৭ খ্রিস্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হলে কনৌজের সিংহাসন অধিকার করেন তাঁর মন্ত্রী। কিন্তু তিনিও চৈনিক ও তিব্বতীয় সেনাবাহিনীর কাছে পরাজিত হন। হর্ষবর্ধনের সহযোগী ভাস্করবর্মনও ঐ বংশের শেষ রাজা। মগধের উত্তরকালীন গুপ্তবংশের রাজারা অষ্টম শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত রাজত্ব করলেও তাঁরাও হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারেন নি। প্রকৃতপক্ষে বাংলায় তখন কোনই ক্ষমতাবান রাজশক্তি ছিল না। ছোট ছোট স্থানীয় শক্তি আবার নিজেদের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু কোন রাজা বা রাজবংশই প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করে সমগ্র বাংলায় অধিকার বিস্তার করতে পারেনি। এই পর্বের ছোট ছোট রাজাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জয়নাগ, লোকনাথ শ্রীধারণারত ও দেবখড়্গ। জয়নাগ কর্ণসুবর্ণের জয়স্কন্ধরার থেকে ভূমিদানের আদেশ দেন, তাঁর নামাঙ্কিত মুদ্রা বীরভূম-মুর্শিদাবাদ থেকে পাওয়া যায় ও *আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্পে*ও এর উল্লেখ আছে। লোকনাথ সমতটের সামন্ত রাজবংশের শিবনাথের উত্তরাধিকারী। শ্রীধারণরাতও সমতটের রাজবংশ জাত। দেবখড়্গ আম্রফপুরের লিপি ও ইৎ-সিউ-এর বিবরণীতে উল্লিখিত খড়্গ সামন্ত বংশজাত। এঁরাই পরে স্বাধীনভাবে বঙ্গসমতটের বিভিন্ন অঞ্চলে শাসন করেন। জয়নাগ ব্যতীত এঁরা সকলেই সমতট অঞ্চলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন। খড়্গরা এ অঞ্চলে অষ্টম শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত রাজত্ব করলেও বাংলাকে তাঁরা এক রাজশক্তির কর্তৃত্বাধীন করতে পারেন নি।

বাংলার দুর্বল রাজশক্তির পরিচয় পেয়ে এ অঞ্চলে বারবার আক্রমণ হতে থাকে। হিমালয়ের উপত্যকা অঞ্চলের শৈলবংশীয় রাজা, পৌণ্ড্রের রাজাকে পরাজিত করেছিলেন বলে দাবী করা হয়েছে। কনৌজের যশোবর্মন গৌড়রাজকে বধ করেছিলেন বলে তাঁর সভাকবি বাক্‌পতিরাজ *গৌড়বহো* কাব্য রচনা করেছিলেন। কাব্যটি থেকে মনে হয় মগধনাথ এবং গৌড়রাজ একই ব্যক্তি ছিলেন, যদিও তাঁর নাম কোথাও লেখা হয়নি। যশোবর্মন বঙ্গের রাজাকেও পরাজিত করেছিলেন। এরপর কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য মুক্তানীড় কনৌজ জয় করে কলিঙ্গ পর্যন্ত অভযান চালান। গৌড়রাজ পরাজিত হন। তাঁকে কাশ্মীরে নিয়ে গিয়ে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়। এই হত্যার প্রতিশোধ নিতে বাংলা থেকে কয়েকজন দুঃসাহসী যুবক নিজেদের জীবন বিপন্ন করে কাশ্মীরে গিয়েছিলেন। সমস্ত ঘটনার বর্ণনা দিয়ে কল্‌হণ এঁদের সাহসিকতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। কল্‌হণের *রাজতরঙ্গিণী* থেকে জানা যায় যে ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড়ও পূর্বদিকে অভিযান চালনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে কাশ্মীরের সিংহাসন অন্যে অধিকার করে নিলে তিনি একা ছদ্মবেশে পুণ্ড্রবর্ধনে এসেছিলেন। সে সময়ে গৌড় ছিল পাঁচ ভাগে বিভক্ত। এই রাজাদের একজনের কন্যাকে জয়াপীড় বিয়ে করেন এবং অন্য রাজাদের জয় করে তাঁর শ্বশুর জয়ন্তকে অধিরাজ পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। এসব কথা *রাজতরঙ্গিনীতে* বলা হলেও জয়ন্ত যে বাংলার রাজশক্তিকে শক্তিশালী করে তুলতে পেরেছিলেন এমন কোন প্রমাণ নেই।

এইভাবে অন্তর্কলহ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে বাংলার জনজীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে। শশাঙ্ক পরবর্তী গৌড়ের অরাজক অবস্থার উল্লেখ *আর্য মঞ্জুশ্রী মূলকল্প*-এ পাওয়া যায়। আর লামা তারনাথ বলেছেন তখন প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, অভিজাত, ব্রাহ্মণ এবং বণিক স্বগৃহে রাজা হয়ে উঠেছিলেন, কেন্দ্রীয় রাজশক্তি বলে কিছুই ছিল না। পরবর্তীকালের খালিমপুর তাম্রশাসনে এই অরাজক অবস্থাকে বলা হয়েছে 'মাৎস্যন্যায়'। অর্থাৎ বড় মাছেরা

যেমন ছোট মাছেদের খেয়ে নেয় সেইরকম তখন সবলের অত্যাচারে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল।

১খ.৪ পালবংশ—গোপাল

এই 'মাৎস্যন্যায়' থেকে বাংলাকে রক্ষা করেন পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল। গোপালের পুত্র ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে মাৎস্যন্যায় থেকে দেশকে রক্ষার জন্য 'প্রকৃতি'রা গোপালের সঙ্গে লক্ষ্মীর বিবাহ দেয়। এই উপমার মাধ্যমে গোপালের রাজপদে অভিষিক্ত হবার কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু 'প্রকৃতি' কারা? 'প্রকৃতি' শব্দটির সাধারণ অর্থ 'জনগণ' হিসাবে এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে ধরে নিতে হয় যে গোপাল ছিলেন আপামর জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। অথচ, বিশৃঙ্খল সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের নির্বাচন অকল্পনীয়। তাই অনেকে মনে করেন, 'প্রকৃতি' শব্দটি এক্ষেত্রে কহ্লনের *রাজতরঙ্গিণীতে* উল্লিখিত 'রাজকর্মচারী' অর্থে ব্যবহৃত করা হয়েছে। কাশ্মীরের রাজা জলৌককে সাতজন 'প্রকৃতি' বা রাজকর্মচারী নির্বাচিত করেছিলেন। একইভাবে গোপালকেও হয়তো রাজপদে অভিষিক্ত করেছিলেন কিছু উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কিন্তু যেখানে শাসনব্যবস্থাই ভঙ্গুর সেখানে কর্মচারীদের দ্বারা গোপালের নির্বাচনের কল্পনাও সহজ নয়। এমন হতে পারে যে বিবদমান ছোট ছোট রাজারা একসময় অনুভব করেছিলেন সুদৃঢ় রাজশক্তির প্রয়োজন এবং তাঁরাই একত্র হয়ে গোপালকে নেতা হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন। জনগণ এই নির্বাচনকে সমর্থন করে। দীনেশ চন্দ্র সরকার অবশ্য একে জনগণের দ্বারা রাজার নির্বাচনই বলতে চান। এ প্রসঙ্গে তাঁর একটি মন্তব্যে উল্লেখ করা প্রয়োজন ঃ "....এ যুগেও রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ঠিক জনসাধারণের দ্বারা হয় না, রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে অনেকেই মনোনীত প্রতিনিধিবর্গের দ্বারা হয়ে থাকে। আবার নির্বাচিত ব্যক্তি সাধারণত প্রতিনিধিবর্গের অধিকাংশের মনোনীত, তাঁদের সকলের নয়। তাই বর্তমান জগতের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত নির্বাচনকে যদি জনসাধারণের নির্বাচন বলতে বাধা না থাকে তবে প্রাচীন ভারতের নরপতি নির্বাচনকে জনসাধারণের নির্বাচন বলে উল্লেখ করায় দোষ আছে বলে মনে হয় না।"

রমেশচন্দ্র মজুমদার গোপালকে রাজপদে অভিষিক্ত করার জন্য সমকালীন বাঙ্গালীদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন ঃ "The people who had suffered untold miseries for a long period, suddenly developed a political wisdom and a spirit of self-sacrifice to which there is no recorded parallel in the history of Bengal. They perceived that the establishment of a single strong central authority offered the only effective remedy against political disintegration within and invasion from abroad to which their unhappy land was so long a victim. They also realised that such a happy state of things could only be brought about by the voluntary surrender of authority to one person by the numerous petty chiefs who had been exercising independent political authority in different parts of the country. The ideal of subordinating individual interests to a national cause was not as common in India in the eighth century A.D. as it was in Europe a thousand years later. Our admiration is, therefore, all the greater,

that without any struggle the independent political chiefs recognised the suzerainty of a popular hero named Gopal. Thus took place a bloodless revolution which both in spirit and subsequent result reminds us of what happened in Japan about A.D. 1870. এ প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায়-এর মতামত, "যাহা হউক, এই শুভ বুদ্ধির ফলে বাঙলাদেশ নৈরাজ্যের অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা এবং বৈদেশিক শত্রুর কাছে বারবার অপমানের হাত হইতে রক্ষা পাইল"।

লামা তারনাথ (সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় তিনি *ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস* লেখেন) গোপালের রাজা হবার একটি গল্প বলেছেন। গল্পটি যদিও সত্যি নয় তবু এই গল্পেও সমকালীন অরাজকতার ছবি ফুটে উঠেছে। ভঙ্গাল বা বঙ্গাল দেশে রাজপদ শূন্য থাকায় জননায়করা একজন রাজা নির্বাচন করেন। কিন্তু এক নাগিনী রাজমহিষীর রূপ ধারণ করে সেই রাজাকে হত্যা করে। প্রতিদিন এইভাবে একজন রাজা হতেন আর মৃত্যুবরণ করতেন। কিন্তু শেষে এক যুবক চুন্দাদেবীর দেওয়া কাঠের গদার আঘাতে সেই নাগিনীকে হত্যা করেন এবং তাঁকেই গোপাল নাম দিয়ে স্থায়ী রাজা নির্বাচিত করা হয়।

খালিমপুর তাম্রশাসন থেকে গোপালের পিতা ও পিতামহ সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তা-ও সমকালীন অরাজক অবস্থারই ইঙ্গিত দেয়। এই উক্তির যথার্থতা স্পষ্ট নয়। গোপালের পিতামহ দয়িতবিষ্ণু ছিলেন সর্ববিদ্যার-বিশারদ। কিন্তু তাঁর পুত্র বপ্যাট শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। তাঁর বীরত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নানা বদান্যতার খ্যাতি।

পালরাজাদের বংশ-পরিচয় কিছু জানা যায় না। হরিভদ্রর *অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা*-এ পালদের 'রাজভটাদি বংশ পতিত' বলা হয়েছে। খড়্গবংশের একজন রাজার নাম রাজরাজভট, তাই অনেকে মনে করেন যে পালরা খড়্গবংশীয়দের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। কিন্তু 'পতিত' শব্দটি গৌরবাত্মক নয়। সেইজন্যে কেউ বা এই অর্থ গ্রহণে অনাগ্রহী। পালরাজাদের সভাকবি সন্ধ্যাকরনন্দীর মতে পালরাজারা সমুদ্রকুল থেকে উৎপন্ন এবং তাঁরা ক্ষত্রিয়। খালিমপুর লিপিতে ভদ্রাত্মজা বলে ধর্মপাল অভিহিত হয়েছেন। এটি কারও কারও মতে ধর্মপালের মাতা দেদ্দাদেবীর বিশ্লেষণ। সন্ধ্যাকরনন্দীও তারানাথের বর্ণনা অনুযায়ী পালদের গৌড়বঙ্গের সমুদ্রাশ্রেয়ী আদি নরগোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সম্ভব বলেছেন। *আর্য-মঞ্জুশ্রী মূলকল্প*-এ গোপালকে 'দাসজীবী' বলা হয়েছে। বহু পরবর্তীকালে আবুল ফজল পালদের 'কায়স্থ' বলে উল্লেখ করেছেন।

তারানাথের গল্পের গোপাল পুণ্ড্রবর্ধনের ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও বঙ্গাল বা বাখরগঞ্জ অঞ্চলে প্রথম রাজা হয়েছিলেন। সমগ্র বাংলাদেশের উপরেই ক্রমে পালরাজাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। গোপাল আনুমানিক ৭৫০ থেকে ৭৭৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন এবং দেশে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলেন। তিনি 'ভদ্র'বংশের দেদ্দাদেবীকে বিবাহ করেন।

১খ.৪.১ ধর্মপাল

গোপাল পালরাজ্যের ভিৎ সুদৃঢ়ভাবেই প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে তাঁর পুত্র ধর্মপাল (আঃ ৭৭৫-৮১০ খ্রিঃ) উত্তরভারতের রাজনীতির মঞ্চে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পেয়েছিলেন এবং আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে বাংলার মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন।

এই সময় কনৌজ বা কান্যকুব্জের সিংহাসন নিয়ে আয়ুধবংশীয় দু'জন রাজার মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। এঁরা হলেন ইন্দ্রায়ুধ ও চক্রায়ুধ। ধর্মপালের প্রশস্তি প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে নারায়ণপালের ভাগলপুর তাম্রশাসনে লেখা হয়েছে ঃ "সেই বলবান রাজা ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি শত্রুবর্গকে জয় করিয়া, (মহোদয়শ্রী) কান্যকুব্জের রাজশ্রী লাভ করিয়াছিলেন; এবং (পুরাণ-প্রসিদ্ধ) বলিরাজ যেমন (পুরাকালে) ইন্দ্রাদি শত্রুগণকে জয় করিয়া, মহোদয়শ্রী লাভ করিয়াও, যাচকরূপী (চক্রায়ুধ) বামনাবতারকে তৎসমস্ত পুনরায় দান করিয়াছিলেন, এই বলবান রাজাও সেইরূপ প্রণতিপরায়ণ (বামনরূপে চরণাবত) চক্রায়ুধ নামক সামন্ত নরপালকে কান্যকুব্জের রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন"। সম্প্রতি প্রকাশিত পালবংশীয় মহেন্দ্রপালের তাম্রশাসনেও ইন্দ্ররাজের পরাজয় এবং চক্রায়ুধের সিংহাসন প্রাপ্তির কথা আছে।

এইসব বর্ণনা থেকে মনে হয় যে চক্রায়ুধ সিংহাসন পাবার জন্য ধর্মপালের সাহায্য চেয়েছিলেন এবং তিনি ইন্দ্রায়ুধকে হারিয়ে চক্রায়ুধকে কনৌজের রাজপদে অভিষিক্ত করান। ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনে এই অভিষেকের বিবরণ পাওয়া যায়। পাঞ্চাল দেশের বৃদ্ধরা যখন অভিষেকের স্বর্ণ-কলস উত্তোলন করেছিলেন তখন ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু যবন, অবন্তি, গান্ধার ও কীরদেশের প্রণতিপরায়ণ রাজারা 'সাধু, সাধু' বলে তাঁদের সমর্থন জানিয়েছিলেন।

অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে এই সমস্ত রাজাদেরও ধর্মপাল পরাজিত করেছিলেন। ভোজরা বর্তমান বেরার, মৎস্যরা আলোয়ার ভরুপুর ও জয়পুর, মদ্রগণ মধ্য পাঞ্জাব, কুরুরা দিল্লী-মীরাট, যদুরা গুজরাত, যবনেরা সিন্ধু, অবন্তিরা পশ্চিমমালব, গান্ধারেরা পেশোয়ার এবং কীররা কাঙ্‌রা অঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন বলে মনে করা হয়। সেক্ষেত্রে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ধর্মপাল বিজয়াভিযান চালিয়েছিলেন ধরে নিতে হয়। কিন্তু দীনেশ চন্দ্র সরকারের গবেষণা থেকে জানতে পারা যায় যে ইন্দ্রায়ুধ যথেষ্ট শক্তিশালী রাজা ছিলেন। *হরিবংশ* গ্রন্থে বলা হয়েছে, গুজরাতের পূর্বদিকে ছিল অবন্তিদেশ এবং উত্তরদিকে ছিল ইন্দ্রায়ুধের রাজ্য। যেহেতু কনৌজ অবন্তির পূর্বোত্তরে, তাই দীনেশচন্দ্র সরকার অনুমান করেছেন যে "ইন্দ্রায়ুধের অধিকার রাজস্থান ও পাঞ্জাব অঞ্চলের কিয়দংশে প্রসারিত না হলে গুজরাতের উত্তরদিগ্‌বর্তী দেশে তাঁর শাসনের উল্লেখ কোনক্রমেই সম্ভব হত না।" তিনি বলেছেন যে উপরে উল্লিখিত রাজাদের অনেকেই হয়তো ইন্দ্রায়ুধের বশীভূত ছিলেন ; কিন্তু ধর্মপাল যখন কনৌজ অধিকার করেন তখন এই রাজারা ধর্মপালের অনুগৃহীত চক্রায়ুধকে তাঁদের সমর্থন জানাতে দ্বিধা করেন নি। এইভাবে ধর্মপালও উত্তর ভারতের শক্তিমান রাজা হিসাবে স্বীকৃত হলেন।

ঘটনা পরম্পরায় ইন্দ্রায়ুধ চক্রায়ুধের কনৌজের সিংহাসন নিয়ে ঝগড়া চতুঃশক্তির লড়াইয়ে পরিণত হয়েছিল এবং এ লড়াই বহুদিন চলেছিল। গৌড়দেশের পালরা এবং কান্যকুব্জের আয়ুধরা ছাড়া প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট বংশীয় রাজারাও এই লড়াই-এ জড়িয়ে পড়েছিলেন। এই লড়াইয়ের কালানুক্রমিক বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়নি। নানা সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ঐতিহাসিকরা তাঁদের সিদ্ধান্ত গড়ে তুলেছেন। ফলে অনেক সময় ঘটনাপরম্পরা নিয়ে তাঁদের মধ্যেও মতানৈক্য দেখা যায়।

সম্ভবত চক্রায়ুধ ধর্মপালের দ্বারস্থ হলে ইন্দ্রায়ুধ প্রতিহাররাজ বৎসরাজের (আনুমানিক ৭৭৫-৮০০ খ্রিঃ) সাহায্যপ্রার্থী হন। রাষ্ট্রকূটদের একটি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে বৎসরাজ গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু বৎসরাজের প্রাধান্য স্থায়ী হয় নি। তিনি রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের (আনুমানিক ৭৮১-৭৯৪ খ্রিঃ; রমেশচন্দ্র মজুমদার

ধ্রুবের সময়সীমা ৭৭৯-৭৯৩ খ্রিঃ ধরেছেন) হাতে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। প্রতিহাররা যোধপুর অঞ্চল থেকে শাসন চালাতেন আর রাষ্ট্রকূটরা ছিলেন দাক্ষিণাত্যের অধিপতি। এই দুই বংশের রাজ্যসীমা এসে মিলেছিল মালব-গুজরত অঞ্চলে। ফলে, এদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই ছিল। গৌড়রাজকে পরাজিত করে উত্তর ভারতে বৎসরাজের প্রাধান্য বিস্তার তাই ধ্রুব সহ্য করেন নি। নিজের শক্তির পরিচয় দেবার জন্য ধ্রুব উত্তর ভারতের গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে গৌড়েশ্বরকেও পরাজিত করেন। কিন্তু যেহেতু ধ্রুব উত্তর ভারতে রাজ্যবিস্তার করতে আগ্রহী ছিলেন না তাই তিনি এই বিজয় অভিযানের পর দাক্ষিণাত্যে ফিরে আসেন। সেই সুযোগেই ধর্মপাল চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসনে অভিষিক্ত করতে পেরেছিলেন বলে ধারণা করা যায়। এই ঘটনা থেকে কান্যকুব্জ যে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ছিল সে কথা পরিষ্কার।

বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্ট (আনুমানিক ৮০০-৮৩৩ খ্রিঃ) পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য কান্যকুব্জ আক্রমণ করেন এবং বঙ্গাপতি ধর্মপাল ও পরাশ্রিত চক্রায়ুধকে পরাজিত করেন। নাগভট্ট যে এই যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর সামন্তদের লেখগুলি থেকে। যে সমস্ত সামন্ত তাঁকে এই যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন, তাঁরাও এই বিজয়ে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করেছিলেন। প্রতিহার সামন্ত বাউক যোধপুর শিলালেখতে উল্লেখ করেছেন যে তাঁর পিতা কক্ক মুদ্গগিরি বা মুঙ্গেরে গৌড়দের সঙ্গে যুদ্ধে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। উপ তাম্রশাসনে অন্য এক সামন্ত দ্বিতীয় অবনীবর্মা জানাচ্ছেন যে তাঁর প্রপিতামহ বহুকধবল যুদ্ধে ধর্মকে পরাজিত করেছিলেন। এই ধর্ম অবশ্যই ধর্মপাল। এমনকী রাষ্ট্রকূট সামন্ত কর্কর বরোদা তাম্রশাসনে প্রতিহার রাজাকে 'গৌড়েন্দ্র-বঙ্গাপতি-নির্জর-দুর্বিদগ্ধ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু নাগভট্টের এই বিজয়ও বোধহয় স্থায়িত্ব লাভ করেনি। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে নাগভট্টের কাছে পরাজিত হয়ে ধর্মপাল ধ্রুবের পুত্র তৃতীয় গোবিন্দের (আনুমানিক ৭৯৪-৮১৩ খ্রিঃ) সাহায্যপ্রার্থী হন। অথবা এমনও হতে পারে যে নাগভট্টের বিজয়ে শঙ্কিত হয়েই তৃতীয় গোবিন্দ উত্তর ভারত আক্রমণ করেন এবং নাগভট্টকে পরাজিত করেন। সঞ্জান তাম্রশাসন অনুসারে তিনি উত্তরপ্রদেশে পৌঁছলে ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। ধ্রুবর মতো তৃতীয় গোবিন্দও বিজয়াভিযান শেষ করে দাক্ষিণাত্যে ফিরে যান, ধর্মপালও আবার উত্তর ভারতে তাঁর প্রভাব বিস্তার করেন। দীনেশ চন্দ্র সরকার অবশ্য মনে করেন যে দ্বিতীয় নাগভট্ট তৃতীয় গোবিন্দের প্রত্যাবর্তনের পর শক্তি সঞ্চয় করে কান্যকুব্জ জয় করেন এবং মুঙ্গের পর্যন্ত এগিয়ে এসে ধর্মপালকে পরাজিত করেন। তিনিই প্রতিহার রাজধানী কান্যকুব্জে স্থানান্তরিত করেছিলেন। কিন্তু নাগভট্টের রাজত্বকালীন কোন লেখতে এই ঘটনার উল্লেখ না থাকায় রমেশ চন্দ্র মজুমদার মনে করেন যে নাগভট্টের বিজয় তৃতীয় গোবিন্দের আক্রমণে স্থায়িত্ব পায়নি।

ধর্মপালের সময় বাংলায় তিব্বতীয় অভিযান হয়ে থাকতে পারে। তিব্বতীয় বংশাবলী অনুযায়ী Khri-srong-lae-btsan (৭৫৫-৯৭ খ্রিঃ) ভারতবর্ষ জয় করেছিলেন। নবম শতাব্দীর একটি তিব্বতীয় গ্রন্থে আছে যে তাঁর পুত্র Mu-tig Btsan-po ভারতীয় রাজা Dharma-dpal-কে বশ্যতাস্বীকারে ও নিয়মিত ধনরত্ন দিতে বাধ্য করেছিলেন। এই বিবৃতির সত্যতা প্রমাণ করার অন্য কোন উপাদান নেই। সমসাময়িক কালে রাজারা বিস্তীর্ণ রাজ্যজয়ের নানাবিধ দাবী করতেন। অনেক ক্ষেত্রে এসব দাবী ছিল শুধুই বাচনিক।

ধর্মপালের ক্ষেত্রেও এ ধরনের দাবী করা হয়েছে। দেবপালের তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে ধর্মপাল দিগ্বিজয়ে

বেরিয়ে কেদার তীর্থে, গঙ্গাসাগরে, গোকর্ণ ও অন্যান্য তীর্থে ধর্মকার্য করেছিলেন। এ ধরনের বর্ণনা থেকে ধর্মপালের রাজ্যসীমা নির্ণয় করতে যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু ধর্মপাল যে সমকালীন রাজনীতিতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন তার অন্য প্রমাণও আছে। একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত গুজরাতী কবি সোড্ঢলের *উদয়সুন্দরীকথায়* তাঁকে বলা হয়েছে 'উত্তরাপথস্বামিন্'। কাজেই এ কথা সহজেই অনুমান করা যায় যে আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে তাঁর উত্থান হলেও এবং কেবলমাত্র বাংলা ও বিহারে তাঁর প্রত্যক্ষ শাসন সীমাবদ্ধ থাকলেও, তিনি নিজের বুদ্ধিমত্তা ও শক্তিতে গৌড় দেশটিকে সর্বভারতীয় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।

১খ.৪.২ দেবপাল

ধর্মপাল রাষ্ট্রকূটবংশের পরবলের কন্যা রণ্ণাদেবীকে বিবাহ করেন। তাঁদের পুত্র দেবপাল পরবর্তী রাজা (আনুমানিক ৮১০-৪৭ খ্রিঃ)। ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনে যুবরাজ ত্রিভুবনপালের নাম পাওয়া গিয়েছিল। তাঁর পরিবর্তে দেবপাল কেন রাজা হলেন তা জানা নেই। আবার সোড্ঢলের *উদয়সুন্দরীকথা* এবং অভিনন্দন *রামচরিতকাব্য* থেকে 'যুবরাজ' বা 'যুবরাজ হারবর্ষ' বলে একজনের কথা জানা যায়। তাঁকে ধর্মপালের কুলের গৌরব ও বিক্রমশীলের পুত্র বলা হয়েছে। বিক্রমশীল ধর্মপালেরই উপাধি। ফলে ত্রিভুবনপালের মতো হারবর্ষও ধর্মপালের পুত্র। কী পরিস্থিতিতে এঁদের পরিবর্তে দেবপাল রাজা হলেন, তা বলার মতো কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই। অনেকে বলেন যুবরাজ ত্রিভুবনপাল ও যুবরাজ হারবর্ষ একই ব্যক্তি।

দেবপালের রাজত্বের কালানুক্রমিক বিবরণ না পাওয়া যাওয়ায় তাঁর রাজ্যসীমা ও যুদ্ধবিজয়ের বর্ণনা কতটা সত্যভিত্তিক তা বলা মুশকিল। তাম্রশাসন ও শিলালেখাদির ভিত্তিতে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে বাংলা-বিহারে তাঁর শাসন সুদৃঢ় ছিল। পরবর্তীকালের বাদাল প্রশস্তিতে বলা হয়েছে যে দেবপাল উৎকল জয় করেছিলেন, হূণদের পরাজিত করেছিলেন এবং দ্রাবিড় ও গুর্জরদের দর্প চূর্ণ করেছিলেন। নারায়ণপালের ভাগলপুর তাম্রশাসনেও দেবপালের রাজত্বকালে উৎকল ও কামরূপ জয়ের উল্লেখ আছে। এসব দাবী কতটা সত্য তা বলা শক্ত। উৎকল জয়ের দাবী সত্য হওয়া সম্ভব। ভৌমকরবংশের কোন রাজাকে বোধহয় তিনি হারিয়েছিলেন। কামরূপ জয়ের দাবীও সত্য হতে পারে। গুর্জর-প্রতিহারদের সঙ্গে যুদ্ধ তো হয়েইছিল। পাঞ্জাব অঞ্চলের হূণরা প্রতিহারদের সামন্ত হিসাবে যুদ্ধ করে পরাজিত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু দ্রাবিড় জয়ের দাবী অনেকে অস্বীকার করেন। দ্রাবিড় বলতে অনেকে রাষ্ট্রকূটদের প্রতি ইঙ্গিত করেন। কিন্তু তারা ছিল কর্ণাটকবাসী। রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন পরাজিত দ্রাবিড় রাজা পাণ্ড্যরাজ শ্রীমার বল্লভ। তাঁর শিন্নামামূর তাম্রশাসনে পল্লব, ঢোল, কলিঙ্গ ও মগধের রাজার সঙ্গে যুদ্ধের কথা আছে। কিন্তু এই মগধ তামিলনাড়ুর মগদৈ নাড়ু বলে অনেকে মনে করেন।

পাল-প্রতিহার সংঘর্ষের কথা বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেলেও তার বিবরণ ও বিশ্লেষণ সহজ নয়। প্রতিহাররাজ ভোজের গোয়ালিয়র প্রশস্তিতে দাবী করা হয়েছে যে, তিনি ধর্মপালের পুত্রের রাজলক্ষ্মী আত্মসাৎ করেছিলেন। তাঁর সামন্ত গোরখপুরের কলচুরিবংশীয় গুণোম্ভধিও গৌড়রাজ্য জয়ের কথা বলেছেন। প্রতিহারদের সামন্ত গুহিলরাও ভোজের পক্ষ অবলম্বন করে গৌড়জয়ের কাহিনী বলেছেন। ভোজের বরাহ তাম্রশাসন কান্যকুব্জ থেকে দেওয়া হয়েছিল। তাই এ কথা অনস্বীকার্য যে ৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই কনৌজ প্রতিহারদের হস্তগত হয়েছিল।

কিন্তু ভোজ রাজাও রাষ্ট্রকূটদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। দেবপালও বিহার থেকে প্রতিহারদের বিতাড়িত করে বারাণসী পর্যন্ত রাজ্যসীমা বিস্তার করেছিলেন বলে মনে হয়। তাই বারাণসীতে পাল মহিষী ও সামন্তদের মন্দির প্রভৃতি তৈরী করা সম্ভব হয়েছিল। লিপিমালা অনুযায়ী দেবপাল বিন্ধ্য থেকে হিমালয় ও পূর্ব থেকে পশ্চিমে ভারতের সমুদ্রতট পর্যন্ত সমস্ত উত্তরভারত থেকে কর ও বশ্যতা আদায় করেছিলেন। এমনকী মুঙ্গের লিপিতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত এক সমরাভিযানের কথা বলা হয়েছে। এই দাবীগুলি অনেকাংশে অত্যুক্তি।

তিব্বতীয় দাবী অনুসারে দেবপালের সমসাময়িক Ral-pa-chan গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ভারত ভূখণ্ড জয় করেছিলেন। অন্যদিকে পাল তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে দেবপাল নেপাল জয় করেছিলেন। নেপাল ছিল তিব্বতের অধীনে। তাই এক্ষেত্রেও উভয়পক্ষের দাবীর সমর্থনে অন্য কোন উপাদান না থাকায় প্রকৃত সত্য জানা সম্ভব নয়।

মনে হয় নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে দেবপালের জীবন অতিবাহিত হয়েছিল। নালন্দা তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে তাঁর রাজ্যসীমা কম্বোজ থেকে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সেতুবন্ধ বা রামেশ্বর, পূর্বে পশ্চিমে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তারিত ছিল তাঁর সাম্রাজ্য। এ ধরনের বর্ণনা আসলে চক্রবর্তী ক্ষেত্র' সূচক, প্রকৃত রাজ্যসীমা নয়। তাই দেবপালের সঠিক রাজ্যসীমা নির্ধারণ করা সহজ নয়।

দেবপালের রাজত্বের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা সুবর্ণদ্বীপাধিপতি বালপুত্রদেবের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তোলা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই রাজা ছিলেন শৈলেন্দ্র বংশোদ্ভূত। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বিহার নির্মাণ করেন ও তার রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির জন্য পাঁচটি গ্রাম দান করেন। নালন্দা তাম্রশাসন থেকে মনে হয় যেন বালপুত্রদেবের অনুরোধে দেবপাল গ্রামগুলি দান করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বালপুত্রদেবই পাল রাজকোষে উপযুক্ত অর্থ দিয়ে গ্রামগুলি কিনে নালন্দার বিহারকে দান করেছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে এই সম্পর্ক কেবলমাত্র ধর্মীয় পরিমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ ছিল এ কথা মনে হয় না। আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে পালদের গৌরবময় উত্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও প্রভাব ফেলেছিল, তাই বালপুত্রদেব এই অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে চেয়েছিলেন। ঐতিহ্যপূর্ণ নালন্দা মহাবিহারে একটি বিহার স্থাপন করে বালপুত্রদেব দুই দেশের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের পথ সুগম করেছিলেন। দেবপাল ও গ্রামদানের অনুমতি দিয়ে এই প্রচেষ্টাকে সফল করতে সাহায্য করেছিলেন। দেবপালের ৩৫ বা ৩৭ রাজ্যবর্ষের এই নালন্দা তাম্রশাসন তাঁর আমলের শেষ লেখ। তাই আনুমানিক পঁয়ত্রিশ-সাঁইত্রিশ বছর তাঁর রাজত্বকাল ধরা হয়। আরব পর্যটক সুলেমান নবম-শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে এসেছিলেন। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী পালরাজ গুর্জর-প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন এবং তাঁর সৈন্যদলে ৫০,০০০ হাতি ও প্রায় ১৫ হাজার সেবক নিযুক্ত ছিল সৈন্যদের পরিচর্যার জন্য।

১খ.৪.৩ মহেন্দ্রপাল

দেবপালের পর তাঁর পুত্র শূরপাল সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন বলে এতদিন মনে করা হত। কিন্তু সম্প্রতি মালদা জেলার জগজ্জীবনপুর থেকে পাওয়া তাম্রশাসন এ ধারণা ভুল প্রতিপন্ন করেছে। প্রকৃতপক্ষে,

দেবপালের পর রাজা হয়েছিলেন তাঁর পুত্র মহেন্দ্রপাল। মহেন্দ্রপাল নামের রাজার শিলালেখ বাংলা, বিহার থেকে পাওয়া গেলেও এতদিন তাঁকে প্রতিহাররাজ মহেন্দ্রপাল হিসাবে সনাক্ত করা হত। জগজ্জীবনপুর তাম্রশাসন নতুনভাবে পাল রাজত্বের পর্যালোচনা দাবী করছে। এই মহেন্দ্রপালও শূরপালের মতো মাহটাদেবীর গর্ভজাত। এই তাম্রশাসনেই প্রথম মাহটাদেবীর পিতা দুর্লভরাজকে চাহমানবংশীয় রাজা হিসাবে চেনা গেল। এই চাহমান রাজা প্রথমে বৎসরাজের সামন্ত হিসাবে ধর্মপালের সঙ্গে যুদ্ধ করলেও পরবর্তী সময়ে দেবপালের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়ে পালদের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র গূবক অবশ্য প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নগভট্টের পক্ষেই অবলম্বন করেছিলেন।

জগজ্জীবনপুর তাম্রশাসন থেকে মহেন্দ্রপালের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তবে তিনি অন্ততঃ পনেরো বছর রাজত্ব করেছিলেন (আনুমানিক ৮৪৮-৮৬৩ খ্রিঃ) এবং বাংলা-বিহারে পালশাসন তখন অক্ষুণ্ণ ছিল।

১খ.৪.৪ শূরপাল

এর পর মহেন্দ্রপালের অনুজ শূরপাল সিংহাসনে বসেন। জগজ্জীবনপুর শাসনের তিনি ছিলেন অন্যতম দ্যোতক। উত্তরপ্রদেশের মীর্জাপুর জেলা থেকে শূরপালের তৃতীয় রাজ্যবর্ষের একটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। তাঁর মা মাহটা দেবীর বারাণসীর শিব মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পাশুপত আচার্যদের ব্যয় নির্বাহের জন্য শাসনের মাধ্যমে চারটি গ্রাম দান করা হয়েছিল। এর মধ্যে একটি গ্রাম ছিল কল্মষনাশপার বিষয়ের অধীন। কল্মষনাশ বা কর্মনাশা নদী বর্তমান বিহার ও উত্তরপ্রদেশের সীমা। ঐ নদীর তীরবর্তী গ্রামটি বারাণসী জেলায় হওয়া সম্ভব। সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হয় যে বারাণসী দেবপালের সময় থেকেই পাল অধিকারে ছিল, প্রতিহারদের অধীনে নয়। সারনাথেও শূরপালের সময়ের একটি মূর্তিলেখ পাওয়া গেছে। রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছিলেন যে দেবপালের পর পালবংশের পতন হয় এবং পালরা উত্তর ভারতের রাজনীতিতে আর তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন নি। দীনেশচন্দ্র সরকার এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নন। শূরপাল অন্তত বারো বছর রাজত্ব করেছিলেন (আনুমানিক ৮৬৪-৮৭৬ খ্রিঃ)।

১খ.৪.৫ পরবর্তী পাল রাজগণ

শূরপালের পর রাজা হন বিগ্রহপাল। একসময় ভাবা হত যে শূরপাল ও বিগ্রহপাল একই ব্যক্তি। কিন্তু তিনি দেবপালের খুল্লতাত (কাকা) জয়পালের পুত্র। তিনি সম্ভবত শূরপালকে উৎখাত করে সিংহাসন দখল করেন। তিনি কলচুরি বা হৈহয় বংশীয়া লজ্জাদেবীকে বিবাহ করেন। তাঁদের পুত্র নারায়ণপাল পরবর্তী পালরাজা। এইভাবে ধর্মপালের বংশের পরিবর্তে তাঁর ভাইয়ের বংশধরদের হাতে পালরাজ্যের শাসনভার হস্তান্তরিত হয়ে গেল। প্রথম বিগ্রহপালের রাজত্বকালে কোন লেখ না পাওয়ায় মনে করা হয় যে তিনি অল্প কিছুদিন রাজত্ব করেছিলেন।

বিহারশরীফ থেকে পাওয়া মূর্তিলেখ থেকে জানা যায় যে, পরবর্তী রাজা নারায়ণপাল অন্তত চুয়ান্ন বছর রাজত্ব করেছিলেন (আনুমানিক ৮৭৭-৯৩১ খ্রিঃ)। তাঁর সতেরো রাজ্যবর্ষের একটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে ভাগলপুর থেকে। তারপর দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বছরের আর কোন লেখ না পাওয়া যাওয়ায় পণ্ডিতেরা ধরে নিয়েছিলেন যে মহেন্দ্রপাল নামের প্রতিহার রাজা (আনুমানিক ৮৮৫-৯০৮ খ্রিঃ) এই সময় বাংলা-বিহারের অনেক অংশ

জয় করে নিয়েছিলেন। কিন্তু জগজ্জীবনপুর তাম্রশাসনের ভিত্তিতে ঐ মহেন্দ্রপালকে পালরাজা হিসাবে সনাক্ত করায় প্রতিহারদের বাংলা-বিহার জয়ের তত্ত্ব বাতিল করা প্রয়োজন। তবে এই সময় উত্তরবঙ্গ কম্বোজ অধিকারভুক্ত হয়ে থাকতে পারে। কম্বোজবংশীয় কুঞ্জরঘটাবর্ষ দিনাজপুর লিপিতে নিজেকে গৌড়পতি বলেছেন। কম্বোজরা সমতট অঞ্চল পর্যন্ত অভিযান চালনা করেছিলেন। পালদের এই বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে বঙ্গালদেশে ত্রৈলোক্যচন্দ্র স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এছাড়ওা নারায়ণপালের কালে রাজা মাধবর্মা শ্রীনিবাসের নেতৃত্বে উড়িষ্যার শৈলোদ্ভববংশ ও রাজা হর্জর ও তাঁর পুত্র বনমালের নেতৃত্বে কামরূপ পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ম (৮৮০-৯১৫ খ্রিঃ অথবা রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতানুযায়ী ৮৭৮-৯১৪ খ্রিঃ) তাঁর লেখতে বলেছেন যে তিনি গৌড়দের বিনয় শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ জয় করেছিলেন। কৃষ্মা জেলার বেলনাণ্ডুর রাজা প্রথম মল্ল সম্ভবত দ্বিতীয় কৃষ্মের সামন্ত ছিলেন। তিনিও বঙ্গ, মগধ ও গৌড় জয়ের দাবী করেছেন। সুতরাং রাষ্ট্রকূটদের হাতেও নারায়ণপালের অস্তিত্ব সাময়িকভাবে বিপন্ন হয়ে থাকতে পারে। নারায়ণপালের পুত্র রাজ্যপালের স্ত্রী রাষ্ট্রকূটবংশীয় জগত্তুঙ্গের কন্যা ভাগ্যদেবী। অনেকে মনে করেন জগত্তুঙ্গ দ্বিতীয় কৃষ্মেরই পুত্র। পারস্পরিক যুদ্ধ ও বৈবাহিক সম্পর্ক সে যুগে একই সঙ্গে হওয়া সম্ভব ছিল।

নারায়ণপালের পুত্র রাজ্যপাল অন্তত বত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন (আনুমানিক ৯৩২-৯৬৪ খ্রিঃ)।

তিনি ম্লেচ্ছ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, ওড্র, পাণ্ড্য, কর্ণাট, লাট, সুহ্ম, গুর্জর, ক্রীত ও চীনদের জয় করেছিলেন বলে দাবী করা হয়েছে। এ ধরনের প্রশস্তির ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে সংশয় থাকে। তবে তিনি চীন বা কম্বোজদের অধিকার থেকে উত্তরবঙ্গ উদ্ধার করে থাকতে পারেন। রাজশাহী জেলার ভাতুড়িয়ায় পাওয়া শিলালেখ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। কামরূপরাজ রত্নপাল এই রাজ্যপালকে পরাজিত করেছিলেন বলে দাবী করেছেন। কিন্তু তার ফল কী হয়েছিল জানার উপায় নেই। বাংলা এবং বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাজ্যপালের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তিনি শক্তিমান রাজা ছিলেন, এ কথা অনস্বীকার্য।

রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্রের রাজত্বকালে প্রতিহার রাজধানী কনৌজ বিজিত হয়েছিল মনে করা হয়। প্রতিহারদের সামন্তরা বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন হয়ে উঠতে থাকে। ফলে, রাজ্যপালের সময়ে পাল সাম্রাজ্যের প্রতিহারদের দিক থেকে কোন আক্রমণের আশঙ্কা ছিল না। মধ্যভারতে নতুন শক্তির উত্থানে পালরাজাকে চন্দেল্ল বা কলচুরিদের মতো নতুন শত্রুর সম্ভবত সম্মুখীন হতে হয়েছিল। চান্দেল্লরাজ যশোবর্মন গৌড় জয়ের দাবী করেছেন, কিন্তু এই দাবী অন্য সূত্রের দ্বারা সমর্থিত নয়।

রাজ্যপালের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় গোপাল রাজা হন। বিহার, উত্তরবঙ্গ এবং সমতট অঞ্চলে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে সমতটের ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিরোধ দেখা যায়। শ্রীচন্দ্র দাবী করেছেন যেতিনি গোপালকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং অবরুদ্ধা পালমহিষীকে গোপালের কাছে প্রত্যর্পণ করেন। দীনেশচন্দ্র সরকার মনে করেন যে গোপাল প্রথমে শ্রীচন্দ্রকে পরাজিত করে চন্দ্ররাজ্যের কিছু অংশ আত্মসাৎ করেন, কিন্তু পরে তিনি শ্রীচন্দ্রের কাছে পরাজিত হন ও তাঁর স্বাধীনতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন। গোপালের তাম্রশাসনে তাঁর রাজত্বকালীন যুদ্ধের কোন নিশ্চিত বিবরণ নেই। তিনি অন্তত পনেরো বছর রাজত্ব করেন (আনুমানিক ৯৬৫-৯৮০ খ্রিঃ)।

দ্বিতীয় গোপালের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল রাজা হন। রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন যে ইনি সম্ভবত সাতাশ বছর রাজত্ব করেছিলেন, কারণ 'পঞ্চরক্ষা'র একটি পুঁথি অনুলিখিত হয়েছিল জনৈক বিগ্রহপালের ছাব্বিশ রাজ্যবর্ষে। দীনেশচন্দ্র সরকার এটি দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালের বলে মনে করেন না, তাঁর মতে দ্বিতীয় বিগ্রহপালের দীর্ঘ রাজত্বের কোনও প্রমাণ নেই; তাঁকে বড়জোর পাঁচ বছরের শাসনকাল দেওয়া যেতে পারে। সম্প্রতি বাংলাদেশের বগুড়া জেলায় দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালীন একটি মূর্তিলেখ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এতে তাঁর রাজ্যবর্ষের উল্লেখ নেই (আনুমানিক ৯৮০-৯৮৫ খ্রিঃ)।

দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পর তাঁর পুত্র মহীপাল সিংহাসনে বসেন। তাঁর পঞ্চম রাজ্যবর্ষের তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে তিনি অনধিকারীদের হাত থেকে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। এর থেকে মনে হয় যে, দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালেই পালরাজ্য বিশেষ সঙ্কটের মুখে পড়েছিল। এই 'অনধিকারীরা' সমতটের চন্দ্রবংশীয় রাজারা হতে পারেন। শ্রীচন্দ্র শক্তিশালী রাজা ছিলেন। আসামের একটি শাসনে শ্রীচন্দ্রের পুত্র কল্যাণচন্দ্রের গৌড়ের রাজাকে পরাজিত করার ইঙ্গিত আছে।

অন্য রাজবংশের রাজারাও গৌড় জয়ের কৃতিত্ব দাবী করেছেন। চান্দেল্লরাজ যশোবর্মন নাকি গৌড়দের লতার মতো কেটে ফেলেছিলেন। তাঁর পুত্র ধঙ্গ রাঢ় ও অঙ্গের রাজাদের মহিষীদের বন্দী করেছিলেন বলে গর্ব করেছেন। ঠিক একইভাবে কলচুরিরাজ প্রথম যুবরাজ গৌড় জয় করেছিলেন বলে দাবী করা হয়েছে। গাঙ্গেয়দেবের সময়ে কলচুরিরা বিহারের কিছু অংশে নিজেদের অধিকার বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল।

অনেকে এই শত্রুদের কম্বোজবংশীয় রাজ্যপাল ও ভাগ্যদেবীর পুত্র নারায়ণপাল ও নয়াপলের উল্লেখ আছে। এঁরা প্রিয়ঙ্গু থেকে শাসন করতেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার এই রাজ্যপাল ও ভাগদেবীকে পাল সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী মনে করে বলেছিলেন যে রাজ্যপালের পর অন্তর্কলহে পাল রাজ্য খণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল। এ সিদ্ধান্ত ভুল। ইর্দা শাসনের রাজারা ছিলেন কম্বোজবংশীয় এবং পালদের সামন্ত। পালরাজাদের নামের অনুকরণে তাঁরা নিজেদের নাম দিয়েছিলেন। মহীপালের পুত্র নয়পালের নামে ইর্দা শাসনের নয়পালের নাম হয়েছিল বলে মনে করা হয়। সুতরাং এঁরা বিগ্রহপালের রাজ্যজয়কারী না হওয়াই সম্ভব। এই সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে প্রথম মহেন্দ্রপাল ও শূরপালের রাজত্বকালের পর থেকেই গৌড়-বঙ্গে পালরাজাদের শক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তো বটেই, এমনকী গৌড়-বঙ্গের ভিতরেও।

মহীপালের রাজ্যত্বকালীন সময়ের লেখ উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উত্তরবঙ্গ ও সমতট অঞ্চলে পাওয়া গেছে। কাজেই এ কথা অনুমান করা যায় যে তিনি সত্যিই পাল গৌরব পুনরুদ্ধার করেছিলেন। মহীপালের ৪৮ রাজ্যবর্ষের দুটি মূর্তিলেখ মজঃফরপুর জেলায় পাওয়া গিয়েছে। অর্থাৎ তিনি কলচুরিদের বিতাড়িত করে বিহারে পাল অধিকার ফিরিয়ে এনেছিলেন। ১০৮৩ বিক্রম সংবৎ বা ১০২৬ খ্রিস্টাব্দে সারনাথ লেখ থেকে জানা যায় যে বারাণসী তখন মহীপালের শাসনাধীন ছিল।

ইতিমধ্যে মহীপালকে হয়তো কিছু যুদ্ধে পরাজয়ও স্বীকার করতে হয়েছিল। রাজেন্দ্র চোলের তিরুমালৈ লেখ থেকে জানা যায় যে, তিনি বাংলায়ও বিজয় অভিযান চালিয়েছিলেন এবং দণ্ডভুক্তির ধর্মপাল, দক্ষিণরাঢ়ের রণশূর, বঙ্গালদেশের গোবিন্দচন্দ্র এবং উত্তররাঢ়ের মহীপালকে পরাজিত করেছিলেন। এই

লেখের উপর ভিত্তি করে রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন যে, এই সময় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন রাজত্ব স্থাপিত হয়েছিল এবং বাংলায় পাল প্রভাব ছিল সীমাবদ্ধ অঞ্চলে। কিন্তু দীনেশচন্দ্র সরকার এরকম সিদ্ধান্তে আসেন নি। তিনি বলেছেন যে এই রাজাদের মধ্যে কেউবা ছিলেন মহীপালের বশীভূত মিত্র এবং কেউবা ছিলেন সামন্ত। তবে এই যুদ্ধের স্থায়ী কোন প্রভাব বাংলায় বোধহয় পড়ে নি। নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর মতে এই আক্রমণ ঝটিকা-যুদ্ধের অতিরিক্ত কিছু নয়।

মহীপাল আনুমানিক ৯৮৫ থেকে ১০২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন (এ বিষয়ে রমেশচন্দ্র মজুমদারের মত ৯৮০-১০৩০ খ্রিঃ ও নীহার রায়ের মত ৯৭৭-১০২৭ খ্রিঃ)। তারপর, তাঁর পুত্র নয়পাল সিংহাসনে বসেন (১০২৭-১০৪৩ খ্রিঃ)। এই সময় পালদের সঙ্গে কলচুরিদের আবার যুদ্ধ বাধে। কলকচুরিজ গাঙ্গেয়দেবের পুত্র কর্ণকে (আনুমানিক ১০৪১-১০৭২ খ্রিঃ) বঙ্গ ও গৌড় বিজেতা বলা হয়েছে। কর্ণের বিজয়াভিযানের প্রমাণ আছে বীরভূম জেলার পাইকোড় গ্রামের শিলালেখতে। কিন্তু ঐ জেলারই সিয়ান গ্রামের শিলালেখ থেকে জানা যায় যে, পরাক্রমশালী চেদিরাজের কোটি কোটি সৈন্য ধ্বংস করে নয়পাল প্রজাদের আনন্দ দিয়েছিলেন। কর্ণের এই পরাজয়ের কাহিনী তিব্বতীয় কিংবদন্তীতেও স্থান পেয়েছে। পশ্চিমদেশের রাজা কর্ণ নয়পালের রাজত্বকালে মগধ আক্রমণ করে পরাজিত হলে বৌদ্ধ অতীশ দীপঙ্করের মধ্যস্থতায় দুই রাজার মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয়। সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত*-এর টীকা অনুযায়ী অবশ্য কর্ণকে পরাজিত করার কৃতিত্ব নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের। তিনি ডাহল দেশের রাজা কর্ণকে পরাজিত করেন এবং তাঁর কন্যা যৌবনশ্রীকে বিবাহ করেন। বিগ্রহপাল সম্ভবত নয়পালের সেনাপতি হিসাবে কর্ণকে পরাজিত করেছিলেন এবং বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়ে থাকতে পারে। সিয়ান শিলালেখতে সুহ্ম দেশের রাজাকে 'ক্রূর' বলা হয়েছে। সুতরাং এ কথা অনুমান করা যেতে পারে যে বর্তমান মেদিনীপুর ও সন্নিহিত অঞ্চলের উত্তরে ছিল সুহ্মদেশ এই পাল সামন্তের বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই কর্ণ সাময়িকভাবে পালরাজ্যের কিছু অংশ অধিকার করে সৈন্য নিয়ে বীরভূম পর্যন্ত এগিয়ে আসতে পেরেছিলেন। কর্ণকে পরাজিত করে নয়পাল আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে পাল রাজত্বকে দীর্ঘস্থায়ী করেন এবং উত্তর ভারতে বাংলার গৌরব প্রতিষ্ঠিত করেন। সুদূর তিব্বত পর্যন্ত এই যুদ্ধ জয়ের কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে। নয়পাল আনুমানিক ১০২৭ থেকে ১০৪৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছিলেন (আনুমানিক ১০৪৩-৭০ খ্রিঃ)। তাঁর রাজত্বকালীন যুদ্ধবিগ্রহের সঠিক কোন উল্লেখ পাল লেখতে পাওয়া যায় নি। তবে পাল-কলচুরি দ্বন্দ্বের বোধহয় অবসান হয় নি। কর্ণের পুত্র যশকর্ণ উত্তর-বিহার জয়ের দাবী করেছেন। কিন্তু ঐ অঞ্চল থেকে বিগ্রহপালের তাম্রশাসন পাওয়ায় ঐ দাবীর যৌক্তিকতা অগ্রাহ্য করা যায়। কল্যাণের চালুক্যবংশীয় প্রথম আহবমল্লের পুত্র বিক্রমাদিত্যও গৌড় ও কামরূপ জয়ে দাবী করেছেন। এক্ষেত্রের সমর্থনযোগ্য প্রমাণের অভাবে দাবীর সত্যাসত্য বিচার করা কঠিন।

অনেকে মনে করেন যে এই সময় পীঠীপতিদের উত্থানের ফলে দক্ষিণ বিহারে পাল আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পীঠীপতিরা ছিলেন পালদের সামন্ত। এই সময় পর্যন্ত বাংলা এবং বিহারে পালশাসন বজায় ছিল বলেই মনে হয়। তবে সমগ্র বাংলায় পালরাজাদের শাসন বজায় ছিল না। বর্ধমান অঞ্চলে সামন্তরাজা

ঈশ্বরঘোষ স্বাধীন রাজত্ব দাবী করেন। পূর্ববঙ্গে ত্রিপুরা অঞ্চলে পট্টিকেরা রাজ্য স্থাপিত হয়। পূর্ববঙ্গের অন্যান্য স্থানে প্রথমে চন্দ্রবংশ ও পরে বর্মনরাজারা শাসন করেন।

তৃতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যুর পরেই পাল রাজত্বে বিপর্যয় শুরু হয়। বিগ্রহপালের তিন পুত্রের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ শুরু হয়। দ্বিতীয় মহীপাল সিংহাসন অধিকার করেন ও অন্য দুই ভাই, শূরপাল ও রামপালকে কারারুদ্ধ করেন। এই সময়েই উত্তর বাংলায় কৈবর্ত দিব্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বঙ্গদেশে তখন শাসনক্ষমতা চন্দ্রদের থেকে বর্মনদের হাতে চলে গিয়েছিল। এই বংশের জাতবর্মা পালরাজার পক্ষ নিয়ে দিব্যকে পরাজিত করে থাকলেও সন্ধ্যাকর নন্দীর *'রামচরিত'* থেকে জানা যায় যে দিব্যর সঙ্গে যুদ্ধে দ্বিতীয় মহীপাল নিহত হন। দিব্য বরেন্দ্র অঞ্চলে স্বাধীন কৈবর্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। মহীপালের মৃত্যুতে শূরপাল ও রামপাল মুক্তি পান। শূরপাল সিংহাসনে বসলেও তাঁর রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয় নি (আনুমানিক ১০৭১-৭২ খ্রিঃ)। এর পর রাজা হলেন রামপাল।

সিংহাসনে বসার পর রামপালের (আনুমানিক ১০৭২-১১২৭ খ্রিঃ) প্রধান কাজ হল কৈবর্তদের হাত থেকে উত্তরবঙ্গ অধিকার করা। দিব্যর এই বিদ্রোহকে অনেকে সামন্ত বিদ্রোহ বলেছেন। কিন্তু অনেকেই মনে করেন যে এটি প্রকৃতপক্ষে কৃষক বিদ্রোহ। পালরাজাদের ভূমি ও রাজস্ব নীতির বিরুদ্ধে কৃষিজীবী কৈবর্ত সম্প্রদায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে কৈবর্তরা উত্তরবঙ্গের শক্তিশালী ও যোদ্ধা সম্প্রদায়। নীহার রঞ্জন রায় এদের জেলে কৈবর্ত বলে মনে করেন। রাজ্যপালের শাসনকালীন ভাতুরিয়ার লেখ থেকে জানা যায় যে রাজ্যপালের মন্ত্রী যশোদাস, কৈবর্ত ছিলেন এবং দিব্য যশোদাসের আত্মীয় ছিলেন। দিব্য হলেন এই বিদ্রোহীদের নেতা। পালদের সভাকবি সন্ধ্যাকরনন্দীর বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে দিব্য দক্ষ শাসক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর রুদোক বিদ্রোহীদের নেতা হন। তারপর রাজা হন ভীম। এইভাবে কৈবর্তরাজারা পঁচিশ-ত্রিশ বছর উত্তরবঙ্গ তাঁদের অধিকারে রাখতে পেরেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। এই সময় পালরাজাদের প্রত্যক্ষ শাসন বিহার অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকায় রামপালের রাজত্বকালীন সমস্ত শিলালেখ বিহার থেকে পাওয়া গেছে।

উত্তরবঙ্গ থেকে কৈবর্তদের উৎখাত করার জন্য রামপাল যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। বিভিন্ন সামন্তরাজার তিনি সাহায্যপ্রার্থী হন। *রামচরিত*-এ এ প্রসঙ্গে বাংলা-বিহারের চোদ্দজন সামন্তরাজার নাম পাই। এই সামন্তরাজাদের সকলকে বা তাঁদের শাসিত অঞ্চলের সবক'টি সনাক্ত করা যায় নি। এই সামন্তদের মধ্যে ছিলেন—

(১) পীঠীপতি কান্যকুব্জরাজ বিজেতা মগধেশ্বর ভীমযশ। পীঠীপতিরা বুদ্ধগয়া অঞ্চলে রাজত্ব করতেন।

(২) 'দক্ষিণ-সিংহাসন-চক্রবর্তী' কোটাটবীর রাজা বীরগুণ। কোটাটবীর স্থান নির্ধারণ করা যায় নি, তবে এটি রাঢ় অঞ্চলে হওয়া সম্ভব।

(৩) উৎকলরাজ কর্ণকেশরী-বিজেতা দণ্ডভুক্তির জয়সিংহ। দণ্ডভুক্তির নগর ছিল বর্তমান মেদিনীপুর জেলায়।

(৪) বালবলভীর রাজা বিক্রমরাজ। 'বালবলভী' নামটি অন্য সূত্র থেকে জানা গেলেও জায়গাটি সনাক্ত করা যায় নি।

(৫) আটবিক সামন্ত-চূড়ামণি অপর-মন্দার পতি লক্ষ্মীশূর। অপরমন্দার রাজ্য বর্তমান হুগলী জেলার গড়মন্দারণ অঞ্চলে ছিল।

(৬) কুব্জবটীর রাজা শূরপাল। কুব্জবটী সাঁওতাল পরগনার নয়া দুমকার চোদ্দ মাইল উত্তরে।

(৭) তৈলকম্পরাজ রুদ্রশিখর। তৈলকম্প বর্তমান পুরুলিয়া জেলার তেলকূপী।

(৮) উচ্ছালরাজ ভাস্কর বা ময়মলসিংহ। এই জায়গাটিও সনাক্ত করা সম্ভব হয় নি।

(৯) ঢেক্করীর প্রতাপসিংহ। ঢেক্করীকে অনেকে বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্তী ঢেকুরীর সাথে অভিন্ন মনে করেন। ঢেক্করীর ইছাইঘোষের তাম্রশাসনটি অবশ্য পাওয়া গেছে দিনাজপুর থেকে।

(১০) কয়ঙ্গাল-মণ্ডলাধিপতি নরসিংহার্জুন। কয়ঙ্গাল যদি কজঙ্গালের অপভ্রংশ হয় তবে এই জায়গাটি বর্তমান রাজমহলের কাঁকজোল অঞ্চল হতে পারে।

(১১) সঙ্কটাগ্রামের রাজা চণ্ডার্জুন। এই অঞ্চলটির সঠিক অবস্থানও আমাদের অজানা।

(১২) নিদ্রাবলীর বিজয়রাজ। নিদ্রাবলী অঞ্চলটি সনাক্ত করা না গেলেও বিজয়রাজকে অনেকে পরবর্তীকালের সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেন মনে করেন।

(১৩) কৌশাম্বীর রাজা দ্বোরপবর্ধন। এই কৌশাম্বী বাংলা দেশের বগুড়া জেলার কুশুম্বী হতে পারে। সেনবংশের বিজয়সেনের দেওপাড়া তাম্রশাসনেও এঁর উল্লেখ আছে।

(১৪) পাদুবম্বা মণ্ডলের সোম। পাদুবম্বা বর্তমান বাংলা দেশের পাবনা হতে পারে।

এই চোদ্দজন সামন্ত ছাড়াও 'রামচরিতে' বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে অঙ্গদেশের অধিপতি রামপালের মাতুল রাষ্ট্রকূটবংশীয় মথন বা মহণের কথা। মহণের ভ্রাতুষ্পুত্র মহাপ্রতিহার শিবরাজ এবং তাঁর দুই পুত্র মহামাণ্ডলিক কাহ্নুর এবং সুবর্ণও রামপালকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

রামপালের সঙ্গে যুদ্ধে কৈবর্তরাজ ভীম পরাজিত ও বন্দী হন। ভীম বন্দী হলে কৈবর্ত সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে থাকে। তখন বঙ্গের হরিবর্মা কৈবর্ত সৈন্যদের সংগঠিত করে পালদের বাধা দিতে থাকেন। এই হরিবর্মার পিতা জাতবর্মা ছিলেন পালদের সামন্ত। কিন্তু হরিবর্মা ভীমের সহযোগী হয়েছিলেন। রামপাল কূটনীতি প্রয়োগ করে শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিরস্ত করতে সক্ষম হলেন। হরিবর্মা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজা বলে স্বীকৃত হলেন। পরাজিত ভীমকে অনুচরসহ হত্যা করা হল। এইভাবে কৈবর্তদের বিদ্রোহ দমন করে রামপাল উত্তরবঙ্গ আবার অধিকার করলেন। কৈবর্ত বিদ্রোহ দমন করা গেলেও এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই বিদ্রোহ পাল রাজ্যকে যথেষ্ট দুর্বল করে দিয়েছিল।

রামপালের রাজত্বের প্রথমদিকে কলিঙ্গের সোমবংশীরাজা কর্ণ বাংলায় অভিযান চালালেও দণ্ডভুক্তির জয়সিংহের হাতে পরাজিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গা তাঁকে উৎখাত করেন। চোড়গঙ্গাও ভাগীরথী পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিলেন এবং তার ফলে দক্ষিণ পশ্চিমবাংলার কিছু অংশে পালরাজাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়।

রামপালের সময়েই সেনাপতি তিম্গদেবকে কামরূপ জয়ের জন্য পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু কামরূপ জয় করার পর নিজেই সেখানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন।

গাহড়বালবংশীয় রাজা গোবিন্দচন্দ্রের তাম্রশাসন থেকে মনে হয় যে বিহারের কিছু অংশও পালদের হস্তচ্যুত

হয়ে গিয়েছিল। কাজেই, রামপাল কৈবর্তদের কাছে থেকে বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধার করতে পারলেও তাঁরই সময়ে অন্যত্র পাল অধিকার সঙ্কুচিত হতে থাকে। তবে কুলোত্তুঙ্গচোলের বঙ্গ, বঙ্গাল ও মগধ জয়ের দাবী ঐতিহাসিক সত্য বলে মনে হয় না। একথা ধরা যেতে পারে যে গঙ্গাদের বিরুদ্ধে রামপাল এবং কুলত্তুঙ্গ মিলিত হয়েছিলেন। *রামচরিতে* পাওয়া যায় যে রামপাল কর্ণাটদের লুব্ধদৃষ্টির হাতে থেকে বরেন্দ্রীকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি সম্ভবত চুয়ান্ন বছর রাজত্ব করেন।

পরবর্তী রাজা কুমারপাল (আনুমানিক ১১২৬-২৮ খ্রিঃ) অল্পদিন রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকালে তিম্‌গদেবের বিদ্রোহ দমন করার জন্য বৈদ্যদেবকে পাঠানো হয়। তিনি তিম্‌গদেবকে পরাজিত করেন এবং পালদের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসাবেই বোধহয় কামরূপ শাসন করতে থাকেন এবং সেইজন্যই তাঁর কমৌলি তাম্রশাসনে প্রাগ্‌জ্যোতিষকে 'ভুক্তি' বা পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রদেশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ঐ শাসনে পালরাজার নাম না থাকায় এ কথাও মনে হয় যে প্রকৃতপক্ষে বৈদ্যদেব স্বাধীনভাবেই কামরূপ শাসন করছিলেন।

কুমারপালের পুত্র তৃতীয় গোপাল শৈশবেই রাজ্যভার গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি আনুমানিক চোদ্দো-পনেরো বছর রাজত্ব করেছিলেন (আনুমানিক ১১২৮-৪৩ খ্রিঃ)। *রামচরিত* থেকে মনে হয় যে তিনি কোন এক যুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত করলেও দুর্ভাগ্যবশত নিজে মৃত্যুবরণ করেন। কোন্ রাজার বিরুদ্ধে গোপাল যুদ্ধ করেছিলেন তাও জা সম্ভভব নয়। কিন্তু রাজশাহী জেলার নিমদীঘির শিলালেখতেও এই ঘটনার সমর্থন রয়েছে বলে মনে হয়। গোপাল ও তাঁর সামন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যান। কিন্তু ঐ অঞ্চল শত্রু কবলিত হয় নি। ঐড়দেবের আত্মীয় ভবদাস মৃতদের সৎকার স্থানে একটি মন্দির তৈরি করেন এবং নিমদীঘির প্রশস্তিটি খোদাই করান।

তৃতীয় গোপালের রাজত্বের অন্য কোন ঘটনা আমাদের জানা নেই। সম্প্রতি রাজীবপুর থেকে তৃতীয় গোপালের দ্বিতীয় রাজ্যবর্ষের একটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। কিন্তু তার থেকেও নতুন কোন তথ্য পাওয়া যায় নি।

পরবর্তী রাজা মদনপাল ছিলেন রামপালের পুত্র। ইনি পালবংশের একমাত্র রাজা যাঁর তারিখ দেওয়া শিলালেখ পাওয়া গেছে। মুঙ্গের জেলার বাল্‌ণ্ডদরে তাঁর ১৮ রাজ্যবর্ষের লেখটির তারিখ ১০৮৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১১৬১ খ্রিঃ। সুতরাং মদনপাল ১১৪৩-৪৪ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। এতদিন মনে করা হত যে তিনি ১৮ রাজ্যবর্ষ বা ১১৬১ খ্রিস্টাব্দের পর আর রাজত্ব করেন নি। সম্প্রতি আবিষ্কৃত মদনপালের রাজীবপুর তাম্রশাসন থেকে জানা গেছে যে তিনি আরও দীর্ঘদিন রাজত্ব করেছিলেন। এই তাম্রশাসনের তারিখ কেউ কেউ ৩২ পড়ে থাকলেও মনে হয় গৌরীশ্বর ভট্টাচার্যের পাঠ অনুযায়ী এটি তাঁর ২২ রাজ্যবর্ষের শাসন বলেই ধরা উচিত। অর্থাৎ ১৮ নয় মদনপাল অন্তত ২২ বছর রাজত্ব করেছিলেন। এছাড়া *রামচরিত*-য়েও তাঁর সম্পর্কে ৩৬টি শ্লোক রয়েছে।

মদনপালের রাজত্বকালও শান্তিপূর্ণ ছিল না। গাহড়বালরা বিহার পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিলেন, তবে মদনপাল সাময়িকভাবে তাঁদের নিরস্ত করতে পেরেছিলেন মনে হয়। নইলে, তাঁর সান্ধিবিগ্রহিক ভীমদেবের পক্ষে বারাণসীতে শিবমন্দির করা সম্ভব ছিল না। ভীমদেবের রাজঘাট শিলালেখতে বলা হয়েছে যে তিনি কলিঙ্গরাজ এবং রায়ারি

বংশের রাজার হাত থেকে মদনপালের রাজ্য উদ্ধার করেছিলেন। ওড়িশার গঙ্গারাজা ও শ্রীহট্টের রায়ারিবংশীয় রাজার সঙ্গে যুদ্ধে পালরা জয়ী হয়েছিলেন ধরে নেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে পাল রাজ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেও মদনপাল সামন্তদের শক্তিবৃদ্ধি রোধ করতে পারেন নি। এই সামন্তদের অন্যতম ছিলেন বিজয় সেন, যাঁকে রামপালের সামন্তচক্রের বিজয়রাজের সঙ্গে অভিন্ন বলা হয়। বিজয় সেনের বিজয় অভিযানের কাহিনী সেনরাজাদের প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হবে। তবে মদনপালই বাংলার শেষ পালরাজা। পরবর্তী কোন পালরাজার তাম্রশাসন বা মূর্তিলেখ বাংলা থেকে পাওয়া যায় নি।

পরবর্তী পালরাজা গোবিন্দপাল। গয়াতে পাওয়া একটি শিলালেখর তারিখ "বিকারী নামক বিক্রমসংবৎ ১২৩২ অর্থাৎ ১১৭৫ খ্রিঃ এবং গোবিন্দপালের 'বিনষ্ট' রাজ্যের ১৪ বৎসর"। এই লেখ-এর উপর ভিত্তি করে দীনেশচন্দ্র সরকার অনুমান করেছিলেন যে ১১৬১ বা ১১৬২ খ্রিস্টাব্দে গোবিন্দপাল রাজত্ব করতে শুরু করেন। কিন্তু মদনপালের রাজীবপুর তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হবার পর দেখা যাচ্ছে যে ঐ সময় মদনপালই পালরাজা ছিলেন। সুতরাং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দু'টি বিষয় গবেষণা দাবী করে। প্রথমত দেখা দরকার বিকারী সংবৎ এবং বিক্রম সংবৎ সত্যিই এক কিনা। দ্বিতীয়ত মদনপাল ও গোবিন্দপালের পারস্পরিক সম্পর্ক কী ছিল।

যেহেতু গোবিন্দপালের কোন তাম্রশাসন পাওয়া যায় নি তাই মদনপালের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা আমাদের জানা নেই। যদি 'বিকারী সংবৎ' এবং 'বিক্রম সংবৎ' একই হয় তবে ধরে নিতে হবে যে মদনপাল ১১৬১ খ্রিস্টাব্দের পরও উত্তরবঙ্গ শাসন করতেন কিন্তু বিহার অঞ্চলে ১১৬১-৬২ খ্রিস্টাব্দ থেকে জনৈক গোবিন্দপাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। কিন্তু গোবিন্দপাল বোধহয় সিংহাসন লাভের কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্য হারান।

এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সমসাময়িক কিছু পাণ্ডুলিপিতে গোবিন্দপালের মৃত্যুর পরও তাঁর রাজ্যসংবৎ অনুযায়ী তারিখ দেওয়া হয়েছে। গোবিন্দপালের নাম সম্বলিত এরকম এগারোটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। দীনেশচন্দ্র সরকার বলেছেন যে এই সময় গাহড়বালেরা পাটনা-গয়া অঞ্চল অধিকার করে ফেলেছিল, কিন্তু গাহড়বাল সৈন্যদের অত্যাচারের জন্য ক্ষোভবশত স্থানীয় লোকেরা বোধহয় বিজেতা রাজার নামোল্লেখ না করে ভূতপূর্ব রাজা গোবিন্দপালের নামই তারিখে উল্লেখ করত।

গোবিন্দপালের সঙ্গে সেনবংশীয় রাজা বিজয় সেনের সম্পর্কের কথাও কিছু জানা যায় না।

পলপালকে শেষ পালরাজা বলে ভাবা হয় যদিও পূববর্তী পালরাজাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা কিছুই জানা নেই। তিনি অন্তত পঁয়ত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর পঁয়ত্রিশ রাজ্যবর্ষের একটি মূর্তিলেখ বিহারের লক্ষ্মীসরাইয়ের কাছাকাছি কাবায়া জয়নগরে পাওয়া গেছে। পলপালের রাজ্যের মধ্যেই বল্লাল সেনের আমলেরও একটি মূর্তিলেখ পাওয়া যাওয়ায় পণ্ডিতেরা এই দুই রাজার মধ্যে সম্পর্কের একটি সূত্র খুঁজেছেন। তিনি সেনবংশীয় রাজার বশীভূত মিত্র হিসাবে মুসলমান বিজয় পর্যন্ত ভাগলপুর অঞ্চলের শাসক ছিলেন বলে অনুমান করা হয়।

এইভাবে প্রায় সাড়ে চারশো বছর ধরে পালবংশের রাজারা বাংলা-বিহারে তাঁদের শাসন চালিয়েছিলেন।

বাংলার কোন রাজবংশই এতদিন একটানা শাসনক্ষমতায় থাকতে পারে নি। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থান যে সবসময়ই দৃঢ় ছিল তা হয়তো নয়। কিন্তু যে অরাজক অবস্থা থেকে বাংলাকে উদ্ধার করে তাঁরা শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেছিলেন তা নিশ্চয়ই উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখলেও পালরাজারা সর্বভারতীয় রাজনীতির মঞ্চে বাংলাকে বিশিষ্ট মর্যাদার আসনে বসাতে পেরেছিলেন। এটা একাধারে তাঁদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বীর্যবত্তার পরিচয় দেয়। নানা রাজনৈতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও, নানা পতন-উত্থানের মধ্য দিয়ে পালরাজারা আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে বাংলার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছেন। উত্তর বা দক্ষিণ ভারতের কোন রাজশক্তিই এখানে তাদের স্থায়ী অধিকার বিস্তার করতে পারেন নি। বিভিন্ন অঞ্চল সাময়িকভাবে তাদের হস্তগত হলেও পালরাজারা তাঁদের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। শেষ পর্যন্ত আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে গড়ে ওঠা সেন রাজবংশের হাতে বাংলার অধিকার তুলে দিতে তাঁরা বাধ্য হলেন। এবিষয়ে উল্লেখ্য যে পালরাজাদের তারিখগুলির প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই একটু সমস্যা রয়েছে।

১খ.৫ পালবংশের সমসায়িক বাংলার অন্যান্য রাজবংশ

আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে পালরাজাদের উত্থানের ইতিহাস জানার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার অন্যান্য রাজবংশের পরিচয় ও পালদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের কথাও জানা দরকার।

১খ.৫.১ দেববংশ

গোপালের সিংহাসনে বসার আগেই কুমিল্লার দেবপর্বতে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এদের দেববংশ বলা হয়। এই বংশের আনন্দদেব গোপালের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি শ্রীবঙ্গালমৃগাঙ্ক' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তারনাথের বর্ণনা থেকে মনে হয় গোপাল বঙ্গালদেশের প্রথম রাজপদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। সিয়ান শিলালেখ থেকেও মনে হয় যে গোপালের সময়েই সমতট পাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। অথচ আনন্দদেবের পুত্র ভবদেবকেও তাঁর দ্বিতীয় রাজ্যবর্ষে কুমিল্লা অঞ্চলে ভূমিদান করতে দেখা যায়। কাছেই পালরাজাদের সঙ্গে এই দেববংশীয় রাজাদের সম্পর্ক কেমন ছিল তা নির্ধারণ করা দরকার। কিন্তু প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বলা সম্ভব নয়। ভবদেবেই এই বংশের শেষ রাজা।

ভবদেবের পর দেববংশের কথা জানা না গেলেও চট্টগ্রাম অঞ্চলে হরিকেল মণ্ডলাধিপতি কান্তদেবকে তাম্রশাসনের মাধ্যমে ভূমিদান করতে দেখা যায়। কান্তিদেবের রাষ্ট্রকেন্দ্র ছিল সম্ভবত শ্রীহট্ট-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম অঞ্চলের বর্ধমানপুর নামক এক স্থানে। তাঁর পিতা ধনদত্ত, পিতামহ ভদ্রদত্ত। কান্তিদেব 'দত্ত'র পরিবর্তে 'দেব' শব্দটি নামের সঙ্গে যোগ করায় পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন যে তিনি ছিলেন ভবদেবের দৌহিত্র ও মাতামহের রাজত্বের উত্তরাধিকারী। তিনি আনুমানিক ৮০০ থেকে ৮২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। সেক্ষেত্রে তাঁকে ধর্মপাল ও দেবপালের সামসাময়িক রাজা বলে গণ্য করা যায়। কিন্তু পালরাজাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কেও কথাও আমাদের জানা নেই। কান্তিদেবের বংশধরদের সম্বন্ধে কোন তথ্য নেই।

১খ.৫.২ চন্দ্রবংশ

এরপর বঙ্গালদেশে দীর্ঘকাল চন্দ্রবংশীয় রাজারা রাজত্ব করেছেন। এই বংশের সাতজনের নাম জানা গেছে। প্রথম পূর্ণচন্দ্র (আনুমানিক ৮৬৫-৮৫ খ্রিঃ)। তাঁর পুত্র সুবর্ণচন্দ্র এবং পৌত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র। চন্দ্রদের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে ত্রৈলোক্যচন্দ্র সমতট আক্রমণ করেন এবং ক্ষীরোদা নদীর তীরবর্তী রাজধানী দেবপর্বত জয় করেন। তাঁর বঙ্গ আক্রমণেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন দেবপর্বত কোন রাজা বা রাজবংশের অধীন ছিল তা জানা নেই। কিন্তু এই বিজয়াভিযানের আগেই যে দেবপর্বত কম্বোজ সৈন্যদের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছিল তা জানা যাচ্ছে। এই কম্বোজরা যে পাল সাম্রাজ্যের ভিত সাময়িকভাবে টলিয়ে দিয়েছিল তা নারায়ণপালের রাজ্যপাল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। ত্রৈলোক্যচন্দ্র সম্পর্কে তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন 'আধারো হরিকেল রাজ-কুকুদ-চ্ছত্র-স্মিতানাং শ্রিয়াম্' অর্থাৎ 'হরিকেলের স্বেতচ্ছত্রই যাঁর আশ্রয় সেই রাজলক্ষ্মীর আশ্রয়'। এই বিশেষণের প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি। ফলে, তিনি হরিকেল রাজার মিত্র ছিলেন না-কি হরিকেল রাজাকে জয় করে সেখানকার রাজলক্ষ্মীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দীনেশচন্দ্র সরকার লিখছেন ঃ "ত্রৈলোক্যচন্দ্রের রাজত্বের প্রথম দিকে উত্তর-বাংলায় ও দক্ষিণ-বিহারে প্রতিহার মহেন্দ্রপালের অধিকার ছিল। তাঁর সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হয়ে হরিকেলরাজের পক্ষে পূর্ব-দক্ষিণ বাংলা থেকে পাল প্রভুত্ব উচ্ছেদ করা অসম্ভব নয়"। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে, প্রতিহার মহেন্দ্রপাল বলে এতদিন যাঁকে ভাবা হয় তিনি প্রকৃতপক্ষে পাল সম্রাট। তাই নতুন তথ্যের আলোয় দীনেশচন্দ্রের বক্তব্য গ্রহণ করা সম্ভব নয়। বরং, কম্বোজ বিজয়ে পাল ক্ষমতার সাময়িক বিপর্যয়ের সুযোগে ত্রৈলোক্যচন্দ্র কম্বোজ আক্রমণ-বিধ্বস্ত হরিকেল অঞ্চল জয় করেছিলেন এমন সিদ্ধান্তে আসাই বোধহয় সমীচীন। দেবপর্বত জয় করার পর ত্রৈলোক্যচন্দ্রের সেনাবাহিনী বিন্ধ্যর সূরূদাঁ নদীতীরবর্তী অঞ্চলে ও কাবেরী তীরবর্তী মলয় উপত্যকায় গিয়েছিল বলে দাবী করা হয়েছে। এগুলি অতিশয়োক্তি বলেই ধরা উচিত। এঁদের রাষ্ট্রকেন্দ্র চন্দ্রদ্বীপ বাখরগঞ্জ, এবং এঁরা শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, ঢাকা ও ফরিদপুর অঞ্চলে শাসন করেন।

ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্রশ্রীচন্দ্র (আনুমানিক ৯২৫-৭৫ খ্রিঃ) গৌড় ও কামরূপ জয় করেছিলেন বলে দাবী করা হয়েছে। তিনি যুদ্ধে পালরাজাকে পরাজিত করলেও পাল মহিষীকে প্রত্যপর্ণ করেছিলেন। কিন্তু পরাজিত পালরাজার নাম তাম্রশাসনে বলা হয়নি। ঠিক একইভাবে তিনি লৌহিত্যবাসী ম্লেচ্ছদের পরাজিত করার দাবী জানালেও পরাজিত কামরূপ রাজের নাম উল্লেখ করেন নি।

শ্রীচন্দ্রের পুত্র কল্যাণচন্দ্র (আনুমানিক ৯৭৫-১০০০ খ্রিঃ)। এই সময় পালরাজারা আবার শক্তি সঞ্চয় করে উঠতে থাকেন। বর্তমান কুমিল্লা জেলার মনধুক গ্রামে দ্বিতীয় গোপালের রাজত্বকালীন একটি মূর্তিলেখ পাওয়া গেছে। প্রথম মহীপালের রাজত্বকালীন দু'টি মূর্তিলেখ কুমিল্লায় পাওয়া গেছে। ফলে, পালরাজাদের সঙ্গে চন্দ্রদের সম্পর্ক নির্ধারণ করা সহজ নয়। কল্যাণচন্দ্র, তাঁর পুত্র লড়হচন্দ্র ও পৌত্র গোবিন্দ্রচন্দ্র সমসাময়িক পালরাজাদের লঘু মিত্র হিসাবে সম্ভবত রাজত্ব করতেন। কামরূপের পালবংশীয় রাজা রত্নপাল বাংলার পালরাজা রাজ্যপালকে এবং তাঁর পুত্র ইন্দ্রপাল শ্রীচন্দ্রের পুত্র কল্যাণচন্দ্রকে পরাজিত করেছিলেন বলে দাবী করেছেন।

রাজেন্দ্রচোলের তিরুমালৈ লেখতে পূর্ব-ভারতের যে সমস্ত পরাজিত রাজার নাম আছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম বঙ্গাল দেশের গোবিন্দচন্দ্র। ইনি চন্দ্রবংশীয় গোবিন্দচন্দ্র হওয়াই সম্ভব।

১খ.৫.৩ বর্মনবংশ

গোবিন্দচন্দ্রের পর চন্দ্রবংশীয় রাজাদের সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না। এরপর বঙ্গ অঞ্চলে অন্য একটি রাজবংশকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। এই বংশের প্রথম রাজা বজ্রবর্মা। তাঁর পুত্র জাতবর্মা। তিনি কলচুরি রাজা কর্ণের সামন্ত হিসাবে জীবন শুরু করে থাকতে পারেন। কারণ, কর্ণের রেওয়া শিলালেখতে জাত নামের সামন্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে কীভাবে জাতবর্মা বাংলার রাজা হয়ে বসেন তা জানা নেই। কলচুরিদের সঙ্গে পাল- রাজাদের সংঘর্ষের কথা আমাদের জানা আছে। তৃতীয় বিগ্রহপাল কলচুরি রাজা কর্ণকে পরাজিত করেন ও তাঁর কন্যা যৌবনশ্রীকে বিবাহ করেন। জাতবর্মা কর্ণের অপর এক কন্যা বীরশ্রীকে বিবাহ করেন। কলচুরিরাজের পরাজয়ের পর জাতবর্মা পালদের সঙ্গে মিত্রতা করে থাকতে পারেন। জাতবর্মার সঙ্গে পাল রাজার সুসম্পর্কের কথা বেলাবো তাম্রশাসনে বলা হয়েছে। জাতবর্মা তৃতীয় বিগ্রহপালের অধীনস্থ রাজা ছিলেন মনে করা যায়। তিনি সম্ভবত কৈবর্ত দিব্যকে পালরাজার পক্ষ অবলম্বন করেই পরাজিত করেছিলেন। তাম্রশাসনের দাবী অনুযায়ী তিনি অঙ্গ ও কামরূপ জয় করেন এবং গোবর্ধন নামের রাজাকে পরাজিত করেন।

জাতবর্মার পুত্র হরিবর্মা। এইসময় কৈবর্ত নেতা ভীমের শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় হরিবর্মা ভীমের সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হন। রামপাল ভীমকে পরাজিত ও বন্দী করলে হরিবর্মা কৈবর্ত সৈন্যদের সংগঠিত করে পালরাজার সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কূটনীতি প্রয়োগ করে রামপাল তাঁকে নিবৃত্ত করেন। রামপাল সম্ভবত হরিবর্মার স্বাধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

হরিবর্মার পর সামলবর্মা রাজত্ব করেন। কিন্তু তাঁর বজ্রযোগিনী শাসনে খণ্ডাংশ থেকে দু'জনের সম্পর্কের কথা জানা যায় না। তিনি হরিবর্মার উত্তরাধিকারীকে উৎখাত করে সিংহাসন দখল করে থাকতে পারেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পরবর্তী রাজা ভোজবর্মার বেলাবো তাম্রশাসনেও সামলবর্মার নাম নেই। ভোজবর্মা এই বংশের শেষ রাজা। ভোজবর্মার রাষ্ট্রকেন্দ্র ছিল বিক্রমপুর। তিনি পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির কোন কোন অংশে ভূমি দান করেছিলেন যা থেকে মনে হয় পুণ্ড্রবর্ধনের রাজশাহী ও বগুড়া অঞ্চলেও তাঁর শাসন বা আধিপত্য ছিল। এরপর বিক্রমপুর অঞ্চল, যেখানে থেকে বর্মনরাজাদের তাম্রশাসনগুলি প্রচারিত হয়েছিল, সেনরাজাদের হস্তগত হয়।

এই বর্মনরাজাদের পাল সম্রাটদের অধীনস্থ রাজা হিসাবে মেনে নিলে বঙ্গ-সমতট অঞ্চলে এই সময় পাল প্রভুত্বের কথা স্বীকার করা যায়। অন্যথায় বর্মনদের স্বাধীন স্থানীয় রাজা ভাবতে হয় যাঁরা কখনও পালরাজাদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন, আবার কখনও বা পাল রাজাদের বিদ্রোহী সামন্তদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁদের উৎখাত করতে চেয়েছেন। পাল সাম্রাজ্যের চরম বিপদের সময় যখন রামপাল বিভিন্ন সামন্তদের সাহায্যপ্রার্থী তখন হরিবর্মা কৈবর্ত ভীমের মিত্র। হরিবর্মা যদি কৈবর্ত সৈন্যদের সাহায্যে রামপালকে পরাজিত করতে পারতেন তবে হয়তো বর্মনদের ইতিহাস ভিন্নভাবে লেখা হত। কিন্তু তা না হওয়ায় বাংলা ইতিহাসে বর্মনরাজাদের ভূমিকার কথা তেমনভাবে উল্লেখ করা হয় না।

১খ.৫.৪ অন্যান্য বংশ

বঙ্গ-সমতটের এইসব রাজবংশের কথা ছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলের ভূস্বামীদের কথা তাম্রশাসন থেকে সামান্য জানা গেছে। প্রিয়ঙ্গুর কম্বোজবংশীয় রাজারা বর্তমান মেদিনীপুর-বালেশ্বর অঞ্চলে শাসন

করতেন। তাঁরা পালস্রাটদের অনুকরণে নাম গ্রহণ করলেও তাম্রশাসনে কোন পালরাজাকে অধীশ্বর হিসাবে উল্লেখ করেন নি।

ঢেক্করীর ঈশ্বরঘোষ দিনাজপুর থেকে তাম্রশাসন দিয়েছিলেন। রামপালের সামন্ত ঢেক্করীর প্রতাপসিংহের সঙ্গে এঁর সম্পর্কের কথা জানা নেই। তবে ঈশ্বরঘোষের পূর্বপুরুষেরা অন্তনাম হিসাবে সিংহ ব্যবহার করেন নি, ঘোষ ব্যবহার করেছেন। কৈবর্ত বিদ্রোহের সুযোগে 'মহামান্ডলিক' ঈশ্বরঘোষ সাময়িকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারেন, তাই ঈশ্বরঘোষের বংশধরদের সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

গয়ার পীঠীপতি রাজারা পালদের সামন্ত ছিলেন। কৈবর্ত বিদ্রোহ দমন করার জন্য পীঠীপতি ভীমযশা রামপালকে সাহায্য করেছিলেন। পরে বোধহয় এই অঞ্চলটি সিন্দবংশীয়দের হাত থেকে কোন আচার্য বংশের হাতে চলে যায়। এই পীঠীপতির আচার্যরাও পালদের সামন্ত ছিলেন। এঁদের কখনও কখনও 'মগধরাজ' বলা হয়েছে। গয়া অঞ্চলের ব্রাহ্মণ শূদ্রকের বংশের যক্ষপালও পালদের সামন্ত ছিলেন।

উত্তর বিহারের দারভাঙ্গা অঞ্চল থেকে মহামাণ্ডলিপ সংগ্রামগুপ্তের তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। পালরাজাদের দুর্বলতার সুযোগে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নিজেকে পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ বলেন।

এই সমস্ত রাজারা ছাড়াও পালদের বহু সামন্ত যে বাংলা-বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত*-এ উল্লিখিত রামপালের সামন্তচক্রের তালিকায়।

১খ.৬ সেনবংশ

কিন্তু পাল সম্রাটদের পর যে রাজবংশ বাংলার ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হল সেনবংশ। এই বংশের বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে, সেনরা ছিলেন কর্ণাটকের অধিবাসী। মাধাইনগর তাম্রশাসনে তাঁদের কর্ণাটকের ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত বলা হয়েছে।

কীভাবে সেনরা বাংলার রাজা হন তা অনুমানসাপেক্ষ। এ বিষয়ে নীহার রঞ্জন রায়ের মত সমর্থনযোগ্য। তিনি বিল্‌হনের রচনায় উল্লিখিত চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের দিগ্বিজয় যাত্রা ও চালুক্য লিপিতে বর্ণিত একাধিক চালুক্যরাজের একাধিক যুদ্ধযাত্রার কাহিনীগুলিকে নির্দেশ করে বলেছেন যে, "এইসব কর্ণাট দেশীয় সমরাভিযানকে আশ্রয় করিয়াই কিছু কিছু কর্ণাট্য ক্ষত্রিয় সামন্ত পরিবার এবং অন্যান্য কিছু লোক বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন এবং সৈন্যাভিযানে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরও তাঁহারা এইখানেই থাকিয়া গিয়াছিলেন।" বিহার ও বাংলাদেশের সেন রাজবংশ এইসব দক্ষিণী কর্ণাট পরিবার থেকে উদ্ভূত বলে তিনি মনে করেছেন। পালরাজাদের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, পাল সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠী থেকে আসা সৈন্য নিযুক্ত হত। তেমনিভাবে কর্ণাটক থেকে আসা কোন সৈনিক সেনরাজাদের পূর্বপুরুষ হতে পারেন। পালরাজাদের অন্য কর্ণাটকদেশীয় সামন্তদের কথাও আমাদের জানা আছে। যেমন পীঠীপতি দেবরক্ষিতও ছিলেন কর্ণাটকদেশীয়।

পণ্ডিতেরা দ্বিতীয় একটি সম্ভাবনার কথাও বলেন। বাংলায় বিজয় অভিযানকারী কোন কর্ণাটক রাজার সঙ্গে এসেছিলেন সেনরাজাদের পূর্বপুরুষ। সৈন্য ঘাঁটির অধিকর্তা হিসাবে তিনি থেকে যান। কর্ণাটকের রাজবংশের সঙ্গে দীর্ঘদিন তাঁরা সুসম্পর্ক রাখেন। কর্ণাটকের রাজবংশকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার কৃতিত্ব তাঁরা দাবী করেছেন।

এই সেনরা নিজেদের চন্দ্রবংশীয় বলেছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষের অনেক রাজবংশের মতো এঁরাও ছিলেন 'ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়'। এই শব্দটির অর্থ নিয়ে মতবিরোধ আছে। কেউ কেউ বলেছেন যে ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও যারা ক্ষত্রিয়দের মতো যুদ্ধবিদ্যা ও রাজকার্যনির্ভর পেশায় নিযুক্ত হয়েছিলেন তারাই ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত হন। দীনেশচন্দ্র সরকার এ মত ভ্রান্ত মনে করেন। তিনি বলেন যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের রক্তের সংমিশ্রণ এঁদের মধ্যে হয়েছিল বলেই এঁরা ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়।

এই রাজাদের বংশতালিকা শুরু হয়েছে বীরসেনকে দিয়ে। সেই বংশের সন্তান সামন্ত সেন। তিনি কর্ণাটকের চালুক্য রাজাদের সাহায্যার্থে দক্ষিণ ভারতে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। এই সময় চালুক্য রাজাদের সঙ্গে চোলরাজাদের সংঘর্ষ চলছিল। সামন্তসেন শেষ বয়সে গঙ্গাতীরের পুণ্যাশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিলেন। হয়তো এই সময় থেকেই বাংলার সঙ্গে কর্ণাটক থেকে আসা এই সৈনিক বংশের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বাংলার রাঢ় অঞ্চলের সঙ্গে সেনাদের যুক্ত করায় এ কথা বলা যায় যে, এই অঞ্চলের সামন্ত রাজা হিসাবেই তাঁদের যাত্রা শুরু হয়েছিল।

১খ.৬.১ বিজয় সেন

সামন্তসেনের পুত্র হেমন্ত সেন। তাঁর পুত্র বিজয় সেন। কৈবর্ত বিদ্রোহ দমন করতে রামপালকে যে যে সামন্তরা সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন নিদ্রাবলীর বিজয়রাজ। অনেকে মনে করেন ইনিই বিজয় সেন (আনুমানিক ১০৯৫-১১৫৯ খ্রিঃ)। প্রথম জীবনে তিনি পালদের সামন্ত থাকলেও পরবর্তীকালে পালরাজাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন এবং ক্রমশ নিজের শক্তি বৃদ্ধি করে বাংলার বৃহত্তর অংশের উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। বিজয় সেনের দেওপাড়া প্রশস্তি থেকে তাঁর এই অগ্রগতির ইতিহাস জানা যায়।

বীরভূম জেলার পাইকোড়ে বিজয় সেনের শিলালেখ এর একটি ভাঙা অংশ পাওয়া গেছে। ফলে, রাঢ় অন্তর্ভুক্ত এই অঞ্চল যে বিজয় সেনের অধিকারে ছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গও তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই রাজশাহী জেলার দেওপাড়ায় তাঁর শিলালেখ পাওয়া সম্ভব হয়েছে। তাঁর ব্যারাকপুর তাম্রশাসনটি ঢাকা জেলার বিক্রমপুর থেকে দেওয়া। অর্থাৎ এই অঞ্চলেও বিজয় সেনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

দেওপাড়া প্রশস্তিতে বলা হয়েছে যে, বিজয় সেন নান্য, বীর, রাঘব ও বর্ধন নামক রাজাদের পরাজিত করে ছিলেন। নান্য মিথিলার রাজা নান্যদেব। এই বংশের রাজারাও সেনদের মতো কর্ণাটক দেশ থেকেই এসেছিলেন। এই নান্যদেবকে পরাজিত করায় উত্তর বিহারে বিজয় সেনের আধিপত্য প্রসারিত হয়ে থাকতে পারে। রামপালের সাহায্যকারী সামন্তচক্রের মধ্যে কোটাটবীর বীরওণ ও কৌশাম্বীর দ্বোরপবর্ধনের নাম পাওয়া যায়। বিজয় সেন কর্তৃক পরাজিত বীর ও বর্ধন এঁরাই হওয়া সম্ভব। কাজেই বাংলার সমসাময়িক শক্তিশালী সামন্তরাজাদের যুদ্ধে পরাজিত করেই বিজয় সেনকে সেনরাজবংশর ভিত্তি স্থাপন করতে হয়েছিল। অন্য পরাজিত রাজা রাঘব ছিলেন ওড়িশার গঙ্গা- বংশীয় রাজা। রাঘবের পিতা অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গ গোদাবরী থেকে ভাগীরথী পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল জয় করার দাবী জানিয়েছেন। তিনি মন্দাররাজ্যের আরম্যাননগরী জয় করেছিলেন। আরম্যা বর্তমান হুগলী জেলার আরামবাগ ও মন্দার বর্তমান মন্দারণ। পালরাজ্যের বিরুদ্ধে এই আক্রমণে বিজয় সেন

চোড়গঙ্গাকে সাহায্য করে থাকতেন পারেন। আনন্দভট্টের *বল্লালচরিত*-এ বিজয় সেনকে 'চোড়গঙ্গ-সখ' বলা হয়েছে। কিন্তু দেওপাড়া প্রশস্তি প্রমাণ করে যে, কলিঙ্গের গঙ্গাবংশের সঙ্গে বিজয় সেনের বন্ধুত্ব স্থায়ী হয় নি। বিজয় সেন কলিঙ্গ ছাড়া গৌড় ও কামরূপ জয়েরও দাবী করেছেন। গৌড়ের সমকালীন রাজা মদনপাল। দেওপাড়া প্রশস্তিতে এ কথাও বলা হয়েছে যে, পশ্চিমদিকের রাজাদের জয় করার জন্য তিনি গঙ্গা ধরে নৌবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে এ থেকে বিহারে অবস্থিত পালরাজ ও তাঁর সামন্তগণের সঙ্গে যুদ্ধের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভাগলপুরে পাওয়া একটি শিলালেখ থেকে সাহুর নামক ব্যক্তির কথা জানা যায়। লেখটিতে বলা হয়েছে যে গৌড়েশ্বরের হয়ে তিনি বঙ্গেশ্বরের নৌবাহিনী ধ্বংস করেছিলেন। এই গৌড়েশ্বর মদনপাল ও বঙ্গাপতি বিজয় সেন হওয়া সম্ভভব।

দীনেশচন্দ্র সরকার অনুমান করেছিলেন যে বিজয় সেন পালবংশীয় মদনপালের অধিকার বিলুপ্ত করে উত্তর বাংলায় আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন এবং এই ঘটনা মদনপালের রাজত্বের অষ্টম বর্ষের অর্থাৎ আনুমানিক ১১৫১ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তীকালের ঘটনা। এরপর মদনপাল ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা দক্ষিণ বিহারে রাজত্ব করতেন। কিন্তু রাজীবপুত্র তাম্রশাসন প্রমাণ করেছে যে, উত্তরবঙ্গে মদনপালের কর্তৃত্ব ২২ (অথবা ৩২) রাজ্য সংবৎ পর্যন্ত বহাল ছিল। ফলে, বিজয় সেনের উত্তরবঙ্গ জয়ের সময় সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা সম্ভভব নয়।

বিজয় সেন অন্তত বাষট্টি বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর বাষট্টিতম রাজ্যবর্ষে তিনি খাড়ী বিষয়ে (বর্তমান চব্বিশ পরগনা) নিষ্কর জমিদান করেছিলেন। এইভাবে বিজয় সেনের রাজত্বকালেই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সেন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি শূরবংশের রাজকন্যা বিলাসদেবীকে বিবাহ করেছিলেন। রামপালের সামন্তচক্রের তালিকায় আমরা আটবিক-সামন্ত-চক্র-চূড়ামণি অপরমন্দারপতি লক্ষ্মীশূরের নাম পাই। বিলাসদেবী এই বংশোদ্ভূতা হতে পারেন।

১খ.৬.২ বল্লাল সেন (আনুমানিক ১১৫৯-৭৯ খ্রিঃ)

বিজয় সেন ও বিলাসদেবীর পুত্র বল্লাল সেন। তাঁর সময় সেন অধিকার সম্ভবত বিহারের ভাগলপুর অঞ্চলেও বিস্তৃত হয়েছিল। সনোখার থেকে বল্লাল সেনের নবম রাজ্যবর্ষের একটি মূর্তিলেখ পাওয়া গেছে। কিন্তু তাঁর আমলের বিজয়াভিযানের কোন বিবরণ সেনদের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় না।

এই সময় বিহারে পাল ও গাহড়বাল সংঘর্ষ চলছিল। গোবিন্দচন্দ্রের হাত থেকে মদনপাল বিহার উদ্ধার করতে পারলেও কিছুদিনের মধ্যেই আবার গাহড়বালরা পাটনা পর্যন্ত জয় করে নেয়। গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র জয়চন্দ্র ১১৭৫ খ্রিস্টাব্দে পাটনা জেলার একটি গ্রাম দান করে তাম্রশাসন প্রকাশ করেছিলেন। তিনি সম্ভবত গোবিন্দপালকে পরাজিত করে ঐ অঞ্চল অধিকার করেন। পালগাহড়বাল বিরোধের সুযোগে সেনরা ভাগলপুর অঞ্চল পর্যন্ত অধিকার প্রসারিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। দীনেশচন্দ্র সরকার মনে করেন শেষ পালরাজা পলপাল। তাঁর সময়কালীন মূর্তিলেখ চম্পানগরীতে পাওয়া গেলেও তাঁকে সেনরাজার বশীভূত মিত্র মনে করা উচিত।

১খ.৬.৩ লক্ষ্মণ সেন (আনুমানিক ১১৭৯-১২০৬/৭ খ্রিঃ)

বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন। তিনি প্রায় ষাট বৎসর বয়সে ১১৭৯-৮০ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সময়ে পাল—গাহড়বাল বিরোধ সেন-গাহড়বাল বিরোধে পরিণত হয়। তিনি গাহড়বাল রাজা

জয়চন্দ্রকে পরাজিত করেন এবং বারাণসী ও প্রয়াগে জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। তিনি দক্ষিণে কলিঙ্গা পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন এবং সেখানেও জয়স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন। তিনি পূর্বদিকে কামরূপ বা আসামের রাজাকেও পরাজিত করেছিলেন বলে দাবী করেছেন। কিন্তু লক্ষ্মণ সেন শক্তিমান রাজা হওয়া সত্ত্বেও বৈদেশিক আক্রমণ থেকে বাংলাকে রক্ষা করতে পারেন নি। ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে তিরৌরীর যুদ্ধে দিল্লীর চৌহানবংশীয় রাজা পৃথ্বীরাজ তুর্কী মুহম্মদ ঘোরী কর্তৃক পরাজিত হন। এরপর গাহড়বাল রাজা পরাজিত হলেন। তুর্কীসৈন্য বাংলার দিকে এগোতে থাকে। মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে তুর্কী সেনাবাহিনী বিহার অধিকার করে লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী নদীয়ার দিকে অগ্রসর হয়। মিনহাজউদ্দীনের *তবকাৎ-ই-নাসির*-এতে এই তুর্কীদের নদীয়া জয়ের একটি কাহিনী বলা হয়েছে। এই কাহিনী অনুসারে অষ্টাদশ অশ্বারোহী লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদের দিকে এগিয়ে যায়। তাদের ঘোড়া ব্যবসায়ী মনে করে কেউ বাধা দেবার প্রয়োজন অনুভব করেনি। ফলে, তাদের অতর্কিত আক্রমণে সেন সৈন্যরা বিভ্রান্ত হল। লক্ষ্মণ সেন পালিয়ে যান। ইতিমধ্যে মুহম্মদের অন্যান্য সৈন্যরা নগরে পৌঁছে যায়। বাংলা তুর্কী বাহিনীর কবলিত হয়। তাছাড়া আনুমানিক ১১৯৬ খ্রিঃ সুন্দরবনের (পূর্বখাটিকা) একাংশ বিদ্রোহ করে ও জনৈক মহামাণ্ডলিকের পুত্র মহারাজাধিরাজ ডোম্মনপাল স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

লক্ষ্মণ সেন তাঁর রাজ্যের পশ্চিমাংশ হারালেও তখনও সেনরাজ্যের অবসান হয় নি। লক্ষ্মণ সেন আনুমানিক ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন। ইতিমধ্যে ১২০৫ সালে মুহম্মদ ঘোরীর নামে স্বর্ণমুদ্রা প্রচারিত হয়েছে। এই স্বর্ণমুদ্রায় এক পিঠে 'গৌড়-বিজয়ে' শব্দটি নাগরীলিপিতে লেখা আছে।

১খ.৬.৪ বিশ্বরূপ সেন

এইভাবে অঞ্চলিক শক্তি হিসেবে বাংলার ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল দিনের অবসান হলেও এর পরেও সেনরাজারা কিছুদিন বিক্রমপুর থেকে শাসন চালিয়েছেন। লক্ষ্মণ সেনের পুত্র বিশ্বরূপ সেনের মদনপাড়া তাম্রশাসনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মূল তাম্রশাসনটি বিশ্বরূপ সেনের পুত্র সূর্য সেনের দ্বিতীয় রাজ্যবর্ষের। কিন্তু পরে মূল দলিলের কিছু অংশ ঘষে তুলে আবার লেখা হয়। শাসনটি এর ফলে হয়ে দাঁড়াল বিশ্বরূপ সেনের চতুর্দশ রাজ্যবর্ষের। এই দলিলের ভিত্তিতে দীনেশ চন্দ্র সরকার মনে করেন যে, বিশ্বরূপ সেন কিছুদিনের জন্য রাজ্যশাসনে অক্ষম ছিলেন। তখন তাঁর পুত্র সূর্য সেনকে সিংহাসনে বসানো হয়। পরে বিশ্বরূপ সেনই রাজপদ গ্রহণ করেন। এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে জানা সম্ভব হয় নি। 'বিশ্বরূপের এই সাময়িক অক্ষমতার কারণ দুরারোগ্য ব্যাধি, শত্রু-হস্তে বন্দিত্ব, প্রভৃতি কিছু হতে পারে'।

ইদিলপুর তাম্রশাসনটি সূর্য সেনের তৃতীয় বর্ষের। কিন্তু এটিও পরে ঘষে তুলে বিশ্বরূপ সেনের নামে প্রচারিত হয়। এই তাম্রশাসনে গর্গ যবনদের পরাজয়ের কথা লেখা আছে। এই গর্গ যবন বলতে পৌরাণিক কাল-যবনদের বোঝানো হয়েছে। গৌরবর্ণ যবন বা গ্রীকদের থেকে এই বিদেশী তুর্কীদের পৃথক করার জন্য তাদের কৃষ্ণ যবন বলা হত। এই যুদ্ধজয়ের কৃতিত্ব সূর্য সেনের। কিন্তু নামের পরিবর্তন করার ফলে এটি বিশ্বরূপ সেনের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। যাইহোক বাংলার পূর্ণ অধিকার নিয়ে তুর্কীদের সঙ্গে সেনদের যুদ্ধবিগ্রহ চলছিল এবং সেনরাজারা তাদের বাধা দেওয়ায় এ অঞ্চল বহুদিন তুর্কী শাসনমুক্ত ছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সেনবংশের রাজারা বিক্রমপুর অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। তারপর এই অঞ্চল সমতটের দেববংশীয় রাজাদের অধিকারে আসে। এইভাবে বাংলার অধিকার সম্পূর্ণভাবে সেনদের হস্তচ্যুত

হয়। দেব বংশীয় রাজারা বিক্রমপুরকে রাষ্ট্রকেন্দ্র করে বর্তমান ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেছিলেন।

তুর্কী আক্রমণের পর থেকে বাংলার ইতিহাসের মধ্যযুগ ধরা হয়। ইতিহাসের যে পর্বে পাল-সেনবংশীয় রাজারা আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন তা আদি মধ্যযুগের অন্তর্গত। এই আদি মধ্যযুগের সমস্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের প্রেক্ষাপটে পাল-সেন রাজাদের মূল্যায়ন করা চলে।

১খ.৭ পালদের শাসনকাঠামো

পালরাজারা দীর্ঘকাল আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে শাসন করলেও তাঁদের শাসনব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার মতো তথ্য আমাদের নেই। তাম্রশাসন, শিলালেখ ও *রামচরিত*-এর বিবরণ থেকে এ কথা বলা যায় যে, পাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ সামন্ত বা লঘু মিত্রদের দ্বারা শাসিত হয়। বাকী অংশ পালরাজাদের প্রত্যক্ষ শাসনে ছিল। ধর্মপালের প্রচেষ্টায় কনৌজ থেকে ইন্দ্রায়ুধ বিতাড়িত হলেও ঐ অঞ্চলে ধর্মপাল তাঁর প্রত্যক্ষ শাসন চালাতে সচেষ্ট হন নি। সেসব অঞ্চলে ধর্মপালের কোন ধরনের লেখও পাওয়া যায় নি। তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ শাসন বাংলা-বিহারে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। পরবর্তী পাল রাজারাও কলিঙ্গ বা আসাম জয়ের দাবী করলেও তাঁদের প্রত্যক্ষ শাসন সম্ভবত ঐসব অঞ্চলেও ছিল না। বৈদ্যদেবের কমৌলি তাম্রশাসনে প্রাক্‌জ্যোতিষপুর 'ভুক্তি' হিসাবে বর্ণনায় থাকলেও তিনি প্রায় স্বাধীন রাজার মতোই ব্যবহার করেছেন। তাম্রশাসনে কোন পালরাজার উল্লেখ করেন নি।

রামচরিত-এর সামন্তচক্রের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে সামন্তরা সম্রাটের প্রয়োজনে সৈন্যাদি দিয়ে সাহায্য করতেন। আবার এ কথাও সত্য যে সম্রাটের দুর্বলতার সন্ধান পেলে সামন্তরা স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনে উদ্যোগী হতেন। পাল আমলে সামন্তচক্র আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে। পালদের লেখগুলিতে রাজন, রাজনক, রানক, সামন্ত, মহাসামন্ত ইত্যাদির বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং সম্রাটের সঙ্গে তাঁর সামন্ত এবং লঘু মিত্রদের সম্পর্ক সবসময় একরকম থাকতো না। অনেক সময়ই পালরাজাদের সঙ্গে সমকালীন অন্যান্য ছোট ছোট রাজবংশের সম্পর্ক নির্ণয় করা তাই সহজ হয় না। যেমন, বঙ্গের জাতবর্মাকে আমরা পালদের সহায়ক হয়ে দিব্যকে পরাজিত করতে দেখি, অথচ তাঁর পুত্র হরিবর্মাকে দেখা যায় বিদ্রোহী ভীমের পক্ষ অবলম্বন করে পালরাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। চন্দ্রবংশীয় রাজাদের সঙ্গে পাল সম্রাটদের সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দেয়।

পালরাজারা গুপ্তসম্রাটদের মতোই পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করতেন। রাজন্, রাজন্যক, রাজনক, মহাসামন্ত, সামন্ত ইত্যাদি উপাধিধারী ব্যক্তিরা ছিলেন পাল শাসনকাঠামোর উপরিভাগে। এঁরা যে ক্ষমতাবান ও বিত্তবান ছিলেন তা পাল লেখ ও তাম্রশাসন থেকে জানা যায়। ধর্মপালের মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণবর্মা শুভস্থলী গ্রামে নন্ন-নারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই মন্দিরে পূজা, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির জন্য ধর্মপাল চারটি গ্রাম দান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু নারায়ণবর্মাই গ্রামগুলি রাজার কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন। দীনেশচন্দ্র সরকার লিখেছেন ঃ "তিনি যে ভূমির মূল্য রাজকোষে জমা দিয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই"। ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলাধিপতি বলবর্মাও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

সুবর্ণাধিপতি বালপুত্রদেব যখন নালন্দার বিহার করে তার রক্ষণাবেক্ষণ পূজা-পাঠ ইত্যাদির জন্য পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলেন তখন বলবর্মাই দেবপাল ও বালপুত্রদেবের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেছিলেন। মণ্ডলাধিপতিরা যে শক্তিমান হয়ে উঠে স্বাধীন রাজার মতো ব্যবহার করতে পারতেন পরবর্তীকালের ঢেক্করীর মণ্ডলাধিপতি ঈশ্বরঘোষ তার প্রমাণ। 'দূতক'রা সর্বদাই উচ্চপদাধিকারী হতেন। খালিমপুর তাম্রশাসনের 'দূতক' ছিলেন যুবরাজ ত্রিভুবনপাল। মহেন্দ্রপালের জগজ্জীবনপুর তাম্রশাসনের 'দূতক' ছিলেন তাঁর ভাই শূরপাল। কাজেই রাজপুত্ররা অনেক সময়ই 'দূতক' হিসাবে কাজ করতেন। মহেন্দ্রপালের তাম্রশাসনে দু'জন দূতকের নাম আছে। শূরপাল ছাড়া অন্য 'দূতক' ছিলেন 'মহাসেনাপতি' বজ্রদেব।

১খ.৭.১ মন্ত্রী, সচিব এবং অমাত্য

রাজার শাসনকার্যের প্রধান সহায়ক ছিলেন মন্ত্রী এবং সচিবরা। নারায়ণপালের সমকালীন বাদাল প্রশস্তি থেকে একটি মন্ত্রী পরিবারের কথা জানা যায়। এই বংশের লোকেরা পুরুষানুক্রমে পালরাজাদের মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। এই ধরনের মন্ত্রীরা যে কী পরিমাণ ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারেন তা প্রশস্তিটির ভাষা থেকেই বোঝা যায়। এই বংশের গর্গ পূর্বদিকের অধিপতি ধর্ম নামের রাজাকে অখিল দিকের স্বামী করে দিয়েছিলেন বলে দাবী করা হয়েছে। গর্গের পুত্র দর্ভপানির উপদেশ গ্রহণের জন্য দেবপাল তাঁর অবসরের অপেক্ষায় দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং তাঁকে মহার্ঘ আসন দিয়ে তবে রাজা সিংহাসনে বসতেন। এই বংশের কেদারমিশ্রের যজ্ঞে শূরপাল স্বয়ং উপস্থিত থেকে শান্তি জল নিতেন। শ্রীগুরবমিশ্রকে নারায়ণপাল মাননীয় মনে করতেন। এই গুরুবমিশ্র নারায়ণপালের ভাগলপুর তাম্রশাসনের 'দূতক' ছিলেন।

পালরাজাদের অপর একটি সচিব পরিবারের কথা জানা যায় কমৌলি তাম্রশাসন থেকে। এই বংশের যোগদেব তৃতীয় বিগ্রহপালের সচিব ছিলেন। তাঁর পুত্র বোধিদেব রামপালের সচিব ছিলেন। বোধিদেবের পুত্র বৈদ্যদেব গৌড়েশ্বরের প্রিয় বন্ধু ছিলেন এবং প্রধান অমাত্য হিসেবে সর্বদা রাজাকে রক্ষার চেষ্টা করতেন। তিম্গদেবের বিদ্রোহ দমনের জন্য এই বৈদ্যদেবকে আসামে পাঠানো হয়েছিল। তিনি বিদ্রোহ দমন করে নিজেকে সেই রাজ্যের মহীপতি বলে ঘোষণা করলেন। তবে তাঁর তাম্রশাসনে প্রাক্জ্যোতিষকে 'ভুক্তি' বলায় বোঝা যায় যে পালশাসকের নামের ব্যাপারে তিনি নীরব থাকলেও তিনি পালরাজাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন নি।

মহাসান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ক বিভাগের উচ্চ রাজপদাধিকারী কর্মচারী। মহাসান্ধিবিগ্রহিক ভীমদেব বারাণসীতে শিব মন্দির তৈরি করেছিলেন। মনহলি তাম্রশাসন প্রকাশিত হবার সময় তিনি ছিলেন সান্ধিবিগ্রহিক। ঐ তাম্রশাসনের 'দূতক'ও তিনিই ছিলেন।

এই সমস্ত বিশিষ্ট পদাধিকারীরা ছাড়াও রাজাকে শাসনকার্যে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন ধরনের রাজকর্মচারী ছিলেন। পালরাজাদের তাম্রশাসনে এইসব পদের দীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায়। তাঁদের সকলের প্রশাসনিক দায়িত্বের কথা তাঁদের পদ-নাম থেকে বোঝা সম্ভব নয়। তবু পাল শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু ধারণা এইসব তালিকা থেকেই পাওয়া যায়। পালদের প্রত্যক্ষ শাসনভুক্ত অঞ্চল কয়েকটি 'ভুক্তি'তে বিভক্ত ছিল। ভুক্তিগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিষয় এবং বিষয়গুলি অন্যান্য ছোট ছোট বিভাগে বিভক্ত ছিল। শাসনব্যবস্থার সর্বনিম্ন একক ছিল গ্রাম। এইসব বিভাগের বিবরণ ও কর্মচারীদের তালিকা থেকে মনে হয় যে, শাসনকাঠামো স্তর বিন্যস্ত ছিল। যেমন, সামন্তদের নিজস্ব একটি অভ্যন্তরীণ শাসনসংক্রান্ত কর্মচারী পরিকাঠামো ছিল; পাল সম্রাটের কেন্দ্রীয়

শাসন চালাবার জন্য একশ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক বিভাগের কাজকর্ম চালাবার জন্য আলাদা কর্মচারী থাকতেন।

বাংলার পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, দণ্ডভুক্তি, বিহারের তীরভুক্তি শ্রীনগরভুক্তি এবং আসামের প্রাক্‌জ্যোতিষ ভুক্তির নাম পালযুগের তাম্রশাসন থেকে জানা যায়। ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির পরবর্তী বিভাগ হিসেবে একবার ব্যাঘ্রতটীমণ্ডল এবং আর একবার স্থালীক্কট বিষয়ের নাম পাই। ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলের অন্তর্গত ছিল মহন্তাপ্রকাশ বিষয়, আর স্থালীক্কট বিষয়ের অন্তর্গত ছিল আম্রষণ্ডিকামণ্ডল। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ভুক্তি বিষয়ে না মণ্ডলে বিভক্ত হবে সে সম্পর্কে পালদের কোন সুনির্দিষ্ট নীতি ছিল না। দেবপালের নালন্দা তাম্রশাসনে আবার অন্য ধরনের বিভাগের নাম পাই। এক্ষেত্রে জমি দেওয়া হয়েছিল শ্রীনগর ভুক্তিতে। এই ভুক্তির অন্তর্গত ছিল রাজগৃহ এবং গয়া বিষয়। কিন্তু রাজগৃহের ক্ষেত্রে পরবর্তী বিভাগ হিসেবে অজপুর 'নয়', পিলিপিন্‌কা 'নয়', অচলা 'নয়' প্রভৃতি 'নয়'র উল্লেখ পাই। গয়া বিষয়ের ক্ষেত্রে পরবর্তী বিভাগ বীথী। যেমন কুমুদসূত্র বীথী। 'নয়' বা 'বীথী'র অন্তর্ভুক্ত ছিল গ্রাম। তাহলে দেখা যাচ্ছে গ্রাম, নয় বা বীথী, বিষয় বা মণ্ডল ও সবশেষে ভুক্তি ক্রমশ বৃহত্তর রাষ্ট্র বিভাগের এককগুলির নাম ছিল।

১খ.৭.২ সৈন্যবাহিনী

পালরাজাদের সেনাবাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন মহাসেনাপতি বা সেনাপতি। অনেক সময় রাজপরিবারের লোকেরাই এই পদাধিকারী হতেন। দেবপালের সেনাবাহিনীর নায়ক ছিলেন তাঁর ভাই জয়পাল। সেনাবাহিনীর সর্বনিম্ন স্তরে ছিলেন চাট, ভটরা অর্থাৎ স্থায়ী ও অস্থায়ী সৈনিক। দেবপালের নালন্দা তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে গৌড়, মালব, খশ, কুলিক, কর্ণাট, গুণ প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল ও জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা সৈনিকের পদে যোগ দিতে পারতেন। বলাধ্যক্ষ এই সেনাবিভাগেরই অধ্যক্ষ হওয়া সম্ভব। কোট্টপাল ছিলেন দুর্গগুলির দায়িত্বে। মহাদণ্ডনায়কও বোধহয় এই বিভাগের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। অন্যান্য যে পদগুলি সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিল সেগুলি হল গৌল্মিক, প্রান্ত পাল, নাবাধ্যক্ষ।

১খ.৭.৩ পুলিশ বিভাগ

দাণ্ডিক, দাণ্ডপাশিক এবং দণ্ডশক্তি পুলিশ বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকতে পারেন। ছোট ছোট অপরাধের শাস্তিও এই বিভাগের আধিকারিকরা দিতে পারতেন। দশাপরাধিক দশ রকম অপরাধের জন্য শাস্তি দিতে পারতেন। চৌরোদ্ধরণিক চোর ধরা ও চোরাই মালের ব্যবস্থা করতেন। খোল ছিলেন গুপ্তচর বিভাগের অধিকর্তা।

১খ.৭.৪ মহাফেজখানা

মহাফেজখানার দায়িত্বে ছিলেন মহাক্ষপাটলিক। তাঁর অধীনে ছিল অক্ষপাটলিক ও কায়স্থরা। গুপ্তযুগের তাম্রশাসনে কায়স্থদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় দেখা যায়, খালিমপুর তাম্রশাসনে জ্যেষ্ঠ কায়স্থের উল্লেখ আছে। কিন্তু পালরাজাদের অন্যান্য কর্মচারী তালিকায় আর কায়স্থদের দেখা পাওয়া যায় না। আযুক্তক, বিনিযুক্তক এই বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১খ.৭.৫ রাজস্ব বিভাগ

ষষ্ঠাধিকৃত সংজ্ঞক কর্মচারী ছিলেন রাজস্ব সংগ্রহকারী। উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসেবে ধার্য করা হত বলে রাজস্ব সংগ্রহকারীকে ষষ্ঠাধিকৃত বলা হয়েছে। তরিক, শৌল্কিক, গৌল্মিক প্রভৃতি কর্মচারীরাও রাজস্ব বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আযুক্তক, বিনিযুক্তক, ক্ষেত্রপ, প্রমাতৃরা জরীপ বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। রাষ্ট্রের আয় নানা উৎস থেকে আসত। মূল উৎস ছিল কর। পাঁচ প্রকার করের উল্লেখ সাধারণভাবে পাওয়া যায় : ভাগ, ভোগ, কর, হিরণ্য ও উপরিকর। কৃষি ছাড়া ফেরি বা জলপথে পারাপার, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অরণ্য থেকে রাষ্ট্রের আয় হত।

নৌকাধ্যক্ষ নৌকার ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হাতি, ঘোড়া, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি পশুদের যিনি অধ্যক্ষ হিসেবে উল্লিখিত হয়েছেন তিনি অবশ্যই পশুপালন দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বিষয়পতি ছিলেন বিষয়ের শাসক। দশগ্রামিক নিশ্চয়ই দশটি গ্রামের শাসনব্যবস্থার তত্ত্বাবধানে ছিলেন। মহামহত্তর ছিলেন গ্রামের প্রতিনিধি। গুপ্তযুগের তাম্রশাসনে দেখা যায় যে, গ্রামের জমি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে গ্রামসভার পরামর্শ নেওয়া হত। ঐসব সভায় মহত্তর, মহত্তম সংজ্ঞক গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও যেমন থাকতেন তেমনি থাকতেন সাধারণ কুটুম্বিন বা কৃষক। পালদের কোন তাম্রশাসনেই এই ধরনের গ্রামসভার উল্লেখ নেই। তবে মহামহত্তর, দশগ্রামিক ইত্যাদি পদনাম থেকে মনে হয় গ্রামসভা হয়তো একেবারে লুপ্ত হয় নি। জনজীবন ছিল শ্রেণী-বিন্যস্ত। সামাজিক স্তরে ব্রাহ্মণরা সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী ছিলেন আর মেদ, অন্ধ্র, চণ্ডালরা ছিলেন সর্বনিম্ন স্থানে। কিন্তু ভূমিদান দলিলে ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে, বিশিষ্ট এবং সাধারণ কৃষিজীবীদের সঙ্গে সমাজের নিম্নস্তরের অধিবাসীদেরও জমিদান সংক্রান্ত ঘোষণা জানানো হয়েছে।

পাল রাজাদের তাম্রশাসন থেকে সমকালীন ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত কিছু তথ্য জানা যায়। পালরাজাদের অনেকেই ব্রাহ্মণদের অথবা মঠ-মন্দিরের জন্য নিষ্কর জমি দান করেছিলেন। খালিমপুর তাম্রশাসনের মাধ্যমে ধর্মপাল চারটি গ্রাম নন্ন নারায়ণের মন্দিরের ও মন্দিরের ব্রাহ্মণদের উদ্দেশে দান করেছিলেন। ধর্মপালের নালন্দা তাম্রশাসনে আর্যতারা ভট্টারিকার দেবমন্দিরের জন্য গ্রামদানের উল্লেখ আছে। দেবপালের নালন্দা তাম্রশাসনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কারণ সুবর্ণদ্বীপাধিপতি বালপুত্রদের প্রতিষ্ঠিত নালন্দার বিহারের জন্য দেবপাল পাঁচটি গ্রামদানের অনুমতি দিয়েছিলেন। দেবপালের মুঙ্গের তাম্রশাসনে জনৈক ব্রাহ্মণকে গ্রামদানের উল্লেখ আছে। মহেন্দ্রপালের জগজ্জীবনপুর তাম্রশাসনে একটি বৌদ্ধ বিহারে জমিদানের কথা বলা আছে। শূরপালের একটি তাম্রশাসনে বারাণসীতে রাজামাতা মাহটাদেবী প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির ও সেখানকার পাশুপত আচার্যদের জন্য চারটি গ্রামদানের কথা আছে। নারায়ণপালের ভাগলপুর তাম্রশাসনেও উত্তর বিহারের একটি শিবমন্দির ও পাশুপত আচার্য পর্যদের জন্য গ্রামদানের কথা আছে। দ্বিতীয় গোপালের জাজিলপাড়া তাম্রশাসন একটি শিবমন্দিরের জন্য দু'টি গ্রামদানের দলিল। প্রথম মহীপালের রাজত্বের দু'টি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। অবিভক্ত দিনাজপুর থেকে দুটিই ব্রাহ্মণদের গ্রামদানের দলিল। তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বের তিনটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। দুটির মাধ্যমে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তিতে দুজন ব্রাহ্মণকে জমিদানের কথা লেখা আছে। অপর একটিতে বিহারের তীরভুক্তিতে জনৈক ব্রাহ্মণকে জমিদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। মদনপালের মনহলি তাম্রশাসনের মাধ্যমে পট্টমহাদেবী চিত্রমতিকাকে মহাভারত পড়ে শোনাবার দক্ষিণা হিসাবে ব্রাহ্মণ বটেশ্বরস্বামীকে জমি দান করা হয়েছিল। মদনপালের পরবর্তী কোন পালরাজার রাজত্বকালের জমিদানের উল্লেখ সহ তাম্রশাসন পাওয়া যায় নি।

এই সমস্ত জমি শুধু নিষ্কর ছিল তাই নয়, দানগ্রহণকারীরা আর কী কী অধিকারে পাবেন তাও তাম্রশাসনগুলিতে বিশদভাবে বলা আছে। যেমন, খালিমপুর তাম্রশাসনের মাধ্যমে কেবলমাত্র চারটি গ্রামই দেওয়া হয় নি, একটি হাট ও তলপাটকও দেওয়া হয়েছিল। দেবপালের মুঙ্গের তাম্রশাসনের মাধ্যমে মেষিকা গ্রাম দেওয়া হয়েছিল "তৃণ-যুতি গোচর পর্যন্ত" সীমা নির্ধারণ করে। সেখানকার আম্র-মধুক-জল-স্থল-মৎস্য, তৃণ ইত্যাদি সবকিছুর উপর দান-গ্রহীতার অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। দশপরাধ, চৌরোদ্ধরণ ইত্যাদির জন্য শাস্তিদান ও অন্যান্য ব্যবস্থা করবার অধিকারও তাঁদের ছিল। তাঁদের রাজাকে কিছু দিতে হত না। এমনকি রজার সৈন্যদেরও ঐ গ্রামে ঢুকবার অনুমতি ছিল না।

এই জমিদান প্রসঙ্গে একটি ঐতিহাসিক বিতর্কের উল্লেখ করা উচিত। রামশরণ শর্মা ও তাঁর অনুগামীরা মনে করেন যে এই জমি-দান প্রথার প্রসার হয় গুপ্তযুগ থেকে। এর আগে জমি দানের উল্লেখ পাওয়া গেলেও তা ছিল সীমিত। এই জমিদান প্রথার প্রসারে এঁরা রাষ্ট্রক্ষমতার অবক্ষয়ের ছবি খুঁজে পেয়েছেন। বিভিন্ন কারণে এই সময় থেকে রাষ্ট্র-পরিচালনের প্রয়োজনীয় রাজস্বাদি সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে বলে এঁরা মনে করেন। ফলে রাষ্ট্র, ব্রাহ্মণ, ধর্মীয় সংস্থা ও বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের ভূমিদান করার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সমস্ত অঞ্চলের শাসনক্ষমতাও তাদের হাতে অনেকাংশে তুলে দেয়। এইভাবে রাজা ও কৃষকশ্রেণীর মধ্যে নানা ধরনের স্বত্বভোগী শ্রেণী গড়ে ওঠে ও সামন্তপ্রথার মতো রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে ওঠে। ইউরোপের সামন্তপ্রথার সঙ্গে ভারতীয় কাঠামোর সম্পূর্ণ মিল না থাকায় রামশরণ শর্মা একে "ভারতীয় সামন্ততন্ত্র" আখ্যায় ভূষিত করতে চান।

পালযুগের ভূমিদানের দলিল থেকে শর্মা তাঁর সমর্থনে তথ্য পেয়েছেন। তিনি মনে করেন যে দানগ্রহীতারা শক্তিশালী ভূস্বামীতে পরিণত হয়েছিলেন এবং নানা ধরনের কর আদায় করে কৃষকদের উৎপীড়ন করতেন। অর্থনৈতিক সুবিধার সঙ্গে প্রশাসনিক ক্ষমতা যুক্ত করে রাষ্ট্র দানগ্রহীতাদের সামন্তশ্রেণীতে পরিণত করে। যেমন, গ্রহীতাদের অধিকার দেওয়া হয়েছিল যে, তারা গ্রামের অধিবাসীদের দশাপরাধের জন্য জরিমানা করতে পারবে। দশ অপরাধ হল— (১) কোন জিনিসে অধিকার না থাকলেও তা নেওয়া; (২) বিচারকের আদেশ ছাড়া কাউকে হত্যা করা; (৩) পরদারগমন; (৪) অনুচিত বাক্য প্রয়োগ; (৫) মিথ্যাচরণ; (৬) কুৎসা রটনা; (৭) অসংলগ্ন কথা বলা; (৮) অপরের সম্পত্তির উপর লোভ; (৯) অলীক বস্তুর চিন্তা; (১০) অসত্যের প্রতি আসক্তি। রামশরণ শর্মা বলেন যে, "এই তালিকায় পারিবারিক, অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগত প্রায় সমস্ত অপরাধই এসে যায়।" তিনি আরও বলেছেন যে, দশাপরাধ দন্ডের অর্থ করা হয় যে এই দশ রকমের অপরাধের জন্য জরিমানা আদায়। কিন্তু যদি 'দণ্ড' শব্দটির 'জরিমানা' অর্থ না গ্রহণ করে 'শাস্তি' অর্থ গ্রহণ করা হয় তবে "স্বীকার করতে হয় যে ভোক্তাগণ এই সকল অপরাধের জন্য দোষী ব্যক্তিকে দৈহিক বা কায়িক উভয় প্রকারের দণ্ডই দিতে পারত। এইভাবে দানগ্রহীতাকে ফৌজদারী মামলার বিচার সম্বন্ধীয় অধিকারদানের এই প্রথা অষ্টম শতাব্দীর মধ্যকাল থেকে শুরু হয়ে পাল সাম্রাজ্যের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল"।

পাল তাম্রশাসনে রাজকর্মচারীদের যে দীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায় তা থেকে অবশ্য শর্মা ধারণা করেছেন যে, বিহার ও বাংলাদেশ জুড়ে তাঁদের সাম্রজ্যের বৃহত্তর অংশের শাসন এইসব রাজকর্মচারীদের মাধ্যমেই পরিচালিত হত। "তারা রাজ্যের নানান স্থানের লোকেদের কেন্দ্রীয় অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে দিত।"

রামশরণ শর্মা মনে করেন যে, এই সময় রাষ্ট্রব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাহত হয়েছিল। তার প্রধান প্রমাণ

মুদ্রা ব্যবহার হ্রাস পাওয়া। চারশো বছরেরও বেশি সময় পালরাজারা রাজত্ব করা সত্ত্বেও তাদের কোন মুদ্রা পাওয়া যায় নি। "মধ্যকালীন স্বনির্ভর অর্থব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুদ্রার অভাব কিছু আশ্চর্যজনক বলে মনে হয় না" বলে শর্মা মন্তব্য করেছেন।

কিন্তু দীনেশচন্দ্র সরকার প্রমুখ অনেকে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের এই মতবাদ স্বীকার করে না। পালরাজাদের জমিদানের মাধ্যমে রাজার অধিকার খর্ব হয়েছিল, রাজশক্তি দুর্বল হয়েছিল এ কথা তাঁরা মানেন না। দীনেশচন্দ্র সরকার তা মনে করেন না যে জমিদানের ফলে রাজার রাজস্বের উৎস সংকুচিত হয়েছিল। তিনি মনে করেন যে, প্রাচীন ভারতীয় রাজাগণের প্রদত্ত তাম্রশাসনের বেশিরভাগই পূণ্যলোভী ব্যক্তিদের কাছ থেকে ভূমির মূল্য নিয়ে দেওয়া হত। তাতে ভূমিদান জনিত পুণ্যলাভ হত রাজার এক-ষষ্ঠাংশ এবং ভূমিক্রেতার পাঁচ-ষষ্ঠাংশ"। অর্থাৎ খালিপুর তাম্রশাসনের মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণবর্মা শুভস্থলীতে নন্ন-নারায়ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে ঐ মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ও পুরোহিতদের জন্য ভূমিদান করার জন্য ভূমির মূল্য রাজকোষে জমা দিয়েছিলেন। দেবপালের নালন্দা তাম্রশাসনের উল্লেখ করে সরকার বলেছেন যে, দেবপাল বালপুত্রদেবের প্রার্থনানুসারে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিহারের জন্য পাঁচটি গ্রাম দান করেছিলেন। কিন্তু "এই নিষ্কর সম্পত্তি সৃষ্টির জন্য বালপুত্রকে পাল রাজকোষে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হয়েছিল।"

তাছাড়া, সরকারের মতে, ভূমিদান গ্রহণকারীরা ছিলেন প্রধানত ব্রাহ্মণ বা মন্দির মঠের মতো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। সুতরাং রাজকীয় ক্ষমতা এদের হাতে হস্তান্তরিত হয়েছিল এমন কথা ভাবার কোন কারণ নেই। তবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সামন্তদের প্রভাব ছাড়া 'আমলাতন্ত্র' ইত্যাদির ছায়া একাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলায় স্পষ্টরূপে প্রতীয় হয়। সাধারণ জনজীবন এই স্তর বিভক্ত শাসনবিন্যাস সম্ভবত প্রভাব রেখে যায়।

১খ.৭.৬ মুদ্রাব্যবস্থা

পালরাজাদের নামাঙ্কিত মুদ্রা না পাওয়া গেলেও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কথা মানতে সরকার ও তাঁর অনুগামীরা নারাজ। গুপ্তযুগে যেমন তেমনি পরবর্তী যুগেও সাধারণ বেচা-কেনার মাধ্যমে হিসেবে কড়ির বহুল প্রচলন ছিল। এছাড়া পূর্ববর্তী রাজাদের মুদ্রা বাজারে থাকায় নতুন করে মুদ্রা তৈরি করবার প্রয়োজনীয়তা পালরাজারা অনুভব করেন নি।

এই বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে পালযুগের রাষ্ট্রকাঠামো ও সমাজব্যবস্থার সর্বসম্মত কোন রূপরেখা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে কোন রাজবংশই পালরাজাদের মতো এত দীর্ঘকাল বাংলা শাসন করেনি। বাংলার অঞ্চলিক ইতিহাসে তাই পাল শাসনকাল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১খ.৮ সেনদের শাসনকাঠামো

পালরাজাদের মতো সেনবংশীয় রাজারাও পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ উপাধি নিতেন। এছাড়াও প্রত্যেক সেনরাজার বিশেষ একটি বিরুদ ছিল। বিজয়সেন ছিলেন অরিরাজবৃষভশঙ্কর, বল্লালসেন ছিলেন অরিরাজ নিঃশঙ্কশঙ্কর, লক্ষ্মণসেন ছিলেন অরিরাজ মদনশঙ্কর। বিশ্বরূপ সেন তাঁর প্রপিতামহের মতো অরিরাজবৃষভশঙ্কর উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। এই উপাধিগুলি থেকে সেনরাজাদের শৈবধর্মের প্রতি আকর্ষণ বোঝা যায়। সেনরাজাদের

সীলমোহরেও ছিল সদাশিবের প্রতিকৃতি। লক্ষণসেনের উপাধি সম্ভবত তাঁর বৈষ্ণব ধর্মাসক্তির কথাও বলে। তিনি পিতা বা পিতামহের মতো 'পরমমাহেশ্বর' ছিলেন না; তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব।

১খ.৮.১ প্রশাসনিক বিভাগ

সেন রাষ্ট্রও বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত ছিল। সেনদের তাম্রশাসন থেকে তিনটি ভুক্তির নাম জানা যায়— (১) পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি (২) বর্ধমান ভুক্তি এবং (৩) পঙ্ক গ্রামভুক্তি। বিহার থেকে সেন আমলের মূর্তিলেখ পাওয়া গেলেও কোন তাম্রশাসন পাওয়া যায় নি। সুতরাং এ কথা অনুমান করা যেতে পারে যে সেনরাজাদের প্রত্যক্ষ শাসন বাংলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিহারের কোন কোন অংশ তাঁরা পলপালের মতো সামন্তদের মাধ্যমে শাসন করতেন। গুপ্ত আমলে রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর অঞ্চল নিয়ে ছিল পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি। পাল আমলে পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির সীমা বৃদ্ধি পায়। সমগ্র উত্তরবঙ্গই ভুক্তিটির অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল হয়ে ওঠে। মালদার জগজ্জীবনপুর তাম্রশাসনের ভূমিও পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত। কিন্তু সেনযুগের পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ বাংলার বৃহত্তর অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেন আমলের বারোটি তাম্রশাসনের মধ্যে নয়টিই পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্ত জমির দানের দলিল। বর্ধমান ভুক্তির মধ্যে ছিল রাঢ় অঞ্চল। পরে এই অঞ্চল ভেঙে দু'টি ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অপর ভুক্তির নাম হল কঙ্কগ্রাম ভুক্তি। কঙ্কগ্রাম ভুক্তির প্রধান নগর বোধহয় ছিল রাজমহলের কাঁকজোল। সেনরাজাদের দেওয়া অন্তত দু'টি জমি বর্ধমান এবং একটি কঙ্কগ্রাম ভুক্তির অন্তর্গত ছিল বলে তাম্রশাসন থেকে জানা যায়।

সেনরাজাদের তাম্রশাসনেও ভূমিদান প্রসঙ্গে শাসনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত পদাধিকারীদের দীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায়। এই তালিকায় রাজা, রাজকন্যাদের পরেই যাঁর নাম পাওয়া যায় তিনি মহিষী বা রাজ্ঞী। এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পাল তাম্রশাসনে রানীদের জন্য তালিকায় কোন স্থান নির্দিষ্ট ছিল না। এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে এই রানীরা বিপুল সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন এবং সম্পত্তির তত্ত্বাবধানও করতেন। বিজয়সেনের আমলের একটি তাম্রশাসনের ভূমি দিয়েছিলেন সম্ভবত রাজ্ঞী বিলাসদেবীই, তাঁর কনক-তুলাপুরুষ দান উপলক্ষ্যে। বল্লালসেনের আমলের একমাত্র তাম্রশাসনও এই বিলাসদেবীর নামের সঙ্গেই যুক্ত। রাজমাতার সূর্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে গঙ্গাস্নানের সময় হেমাশ্ব মহাদানের দক্ষিণা হিসাবে এই তাম্রশাসনে উল্লিখিত ভূমি দেওয়া হয়েছিল। লক্ষ্মণসেনের আমলের ভাওয়াল তাম্রশাসনের ভূমি দেওয়া হয়েছিল শ্রিয়াদেবী ও কল্যাণদেবী নামের মহিষীদের পুণ্যের জন্য। বিশ্বরূপ সেনের মধ্যপাড়া তাম্রশাসনে যেসব ভূমিদানের উল্লেখ আছে তার একটি রাজমাতার চন্দ্রগ্রহণ দেখার উপলক্ষ্যে দেওয়া।

চন্দ্র, বর্মন এবং কম্বোজবংশীয় রাজাদের তাম্রশাসনেও রাজ্ঞীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং সেনদের তাম্রশাসনে রাজ্ঞীদের উল্লেখ একক দৃষ্টান্ত না হলেও গুরুত্বপূর্ণ।

ঠিক একইভাবে বর্মন ও কম্বোজবংশীয় রাজাদের শাসনের মতো সেনরাজাদের তাম্রশাসনের তালিকাভুক্ত পুরোহিতরাও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও সামাজিক পট পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেন। প্রথম দিকের পালরাজারা ছিলেন পরমসৌগত বা বৌদ্ধ। পরবর্তীকালে পালরাজারা শৈবধর্মের পৃষ্ঠপোষক হলেও তাঁদের তাম্রশাসনেও পুরোহিতদের জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থান ভূমিদান প্রসঙ্গে তালিকাভুক্ত হয় নি। সেনরাজারা প্রথম থেকেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। তাই তাঁদের তাম্রশাসনে রাজ্ঞী, রাণক, রাজপুত্র, রাজমাত্যের পরেই পুরোহিতের স্থান নির্দিষ্ট হতে দেখা যায়। পরবর্তীকালে তিনি মহাপুরোহিত পদ নামে অভিহিত হতেন।

পাল আমলের মতো সেনরাজাদের শাসনপর্বেও প্রশাসনিক বিভাগগুলি একই ছাঁচের ছিল না। যেমন, বিজয় সেনের ব্যারাকপুর তাম্রশাসনের মাধ্যমে দেওয়া ভূমিখণ্ড ছিল পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির খাড়ী বিষয়ের ঘাসসম্ভোগ ভাট্টবড়া গ্রামে। বল্লালসেনের নৈহাটী তাম্রশাসনের জমি ছিল বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত উত্তর রাঢ়া মণ্ডলের স্বল্প দক্ষিণ বীথির বাল্লাহিট্ঠা গ্রাম। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর তাম্রশাসনে উল্লিখিত দানের জমি ছিল বর্ধমান ভুক্তির পশ্চিম খাটিকার অন্তর্গত বেতড্ড-চতুরকের বিড্ডারশাসন গ্রাম। লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর শাসনটিও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই তাম্রশাসনের মাধ্যমে দামরবড়াপাটক ও বিজহারপুরপাটকের ছয় পাটক জমি দান করা হয়েছিল। এই জমি কঙ্কগ্রামভুক্তির মধুগিরি কুম্ভীনগর সম্বন্ধ এবং দক্ষিণ বীথির অন্তর্গত কুমারপুর চতুরকে অবস্থিত ছিল। এছাড়াও ভূমিব্যবস্থার এককগুলি সব স্থানে সমানভাবে বিন্যস্ত ছিল না, তবে এই নামগুলি বিভিন্ন অঞ্চলের নথি থেকে পাওয়া যায়। এইভাবে ভুক্তি বিষয় অথবা মণ্ডলে, মণ্ডল বীথিতে, বীথি চতুরকে এবং চতুরক গ্রামে বিভক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

১খ.৮.২ রাজকর্মচারী

ভুক্তির শাসনকর্তাকে বোধহয় এই সময় বলা হত বৃহৎ-উপরিক। বিষয়ের অধিকর্তা ছিলেন বিষয়পতি। মহাধর্মাধ্যক্ষ বোধহয় বিচারব্যবস্থার অধিকর্তা ছিলেন। মহামুদ্রাধিকৃত পাল আমলের কর্মচারী তালিকায় স্থান পাননি। তিনি বোধহয় রাজকীয় সিলমোহরের দায়িত্বে ছিলেন। মহাসর্বাধিকৃত নামক পদটিও নতুন। ইনি হয়তো শাসন-ব্যবস্থার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

যে সমস্ত রাজকর্মচারীদের নাম পাল ও সেন উভয় আমলের তালিকাতেই পাওয়া যায় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজ, রাজন্যক, রাণক, রাজপুত্র, সেনাপতি, ভোগপতি বা মহাভোগির, দৌঃসাধনিক, চৌরোদ্ধরণিক, নৌবলাধ্যক্ষ, গোমহিষাজাবিকাদিব্যাপৃতক, গৌল্মিক, দণ্ডপাশিক। কর্মচারী তালিকার এই মিল থেকে মনে হয় যে প্রশাসনের পরিকাঠামোতে সেন আমলে আমূল কোন পরিবর্তন করা হয় নি। পাল আমলের শাসনব্যবস্থারই তাঁরা উত্তরাধিকারী ছিলেন। যদিও পাল আমলের তুলনায় সেনরাজাদের কর্মচারী তালিকার দৈর্ঘ্য কম, তবুও তার থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে পালযুগের অন্যান্য পদগুলি সেন পর্বে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সেনদের তাম্রশাসনে কর্মচারী তালিকাটি দেওয়ার পর বলা হয়েছে যে রাজাদেশ অন্যান্য অধ্যক্ষদেরও জানানো হচ্ছে যদিও সকলের উল্লেখ তালিকায় করা সম্ভব হয় নি। তবে কিছু পুরোনো পদের বিলুপ্তি ও নতুন পদের সৃষ্টির সম্ভাবনা বাতিল করা যায় না। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পদের তুলনামূলক উচ্চতর অবস্থান। সেন আমলে সামরিক বিভাগে মহাগণস্থ, মহাব্যূহেপীতি মহাপীলুপতি, পদগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়।

১খ.৮.৩ ভূমি ও রাজস্বব্যবস্থা

তাম্রশাসনগুলির ভিত্তিতে সেন আমলের ভূমি ও রাজস্বব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা সম্ভব হয়েছে। কৈবর্ত বিদ্রোহকে যদি কৃষক বিদ্রোহ বলে ধরা যায় তবে এ কথা নিশ্চিত যে প্রথম দিকের পালরাজারা দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেও পরবর্তী পালরাজাদের আমলে কৃষকদের স্বার্থের পরিপন্থী ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থার জন্য রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। বিজয়সেন এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন তাঁর প্রধান প্রমাণ তাঁর রাজত্বকালের তাম্রশাসনের স্বল্পতা। তাঁর বাষট্টি রাজ্যবর্ষের একটি মাত্র ভূমিদান দলিল পাওয়া গেছে।

সে জমিও রাজ্ঞী বিলাসদেবীর অধিকারভুক্ত জমি থেকে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে। জমিদানের সময়সীমা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

বিজয়সেন সম্ভবত ভূমির পরিমাপের ক্ষেত্রে সমতা আনার চেষ্টা করে একটি বিশেষ 'গল'-এর মাপের সূচনা করেছিলেন। এটি তাঁর উপাধি অনুসারে 'বৃষভ-শঙ্কর-গল' নামে পরিচিত। কিন্তু রাজ্যের সর্বত্র এই 'গল'-এর প্রচলন করা সেন আমলেও সম্ভব হয় নি। বিজয় সেনের আমলের ব্যারাকপুর তাম্রশাসনে অবশ্য অন্য একটি গলের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। খাড়ী অঞ্চলে প্রচলিত ছিল সমতটীয় গল। চন্দ্ররাজাদের তাম্রশাসনেও বঙ্গ অঞ্চলে সমতটীর গলের প্রচলনের কথা জানা যায়। রাঢ় অঞ্চলে 'বৃষভ-শঙ্কর-গলের'র ব্যবহারের কথা বল্লালসেনের নৈহাটী তাম্রশাসনে বলা হয়েছে। বাগড়ি অঞ্চলেও এই গলের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, এ ছাড়াও অন্য ধরনের গলের ব্যবহার বিভিন্ন অঞ্চলে থাকা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গুপ্ত ও গুপ্ত পরবর্তী যুগের 'অষ্ট-নবক-গলের'র ব্যবহার বোধহয় এ যুগে আর ছিল না। কোন তাম্রশাসনেই এর উল্লেখ নেই।

ভূমির পরিমাপসূচক অনেক শব্দের কথা সেনরাজাদের তাম্রশাসন থেকে জানা যায়। পাটক, খাড়ী, কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ, উন্মান ও কাকলীর মধ্যে মাপের পার্থক্য বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা সম্ভব হয়েছে।

৪ কাকনী = ১ উন্মান বা উদান

৫০ উন্মান = ১ আঢ়বাপ

৪ আঢ়বাপ = ১ দ্রোণবাপ

৮ দ্রোণবাপ = ১ কুল্যবাপ

১৬ দ্রোণবাপ ১ খাড়ী

৪০ দ্রোণবাপ = ১ পাটক

পরবর্তীকালে চন্দ্ররাজাদের আমলে ১০ দ্রোণের পাটকের প্রচলন করা হয়েছিল। উপরের তালিকা থেকে বোঝা যাবে যে 'দ্রোণ' দিয়েই প্রধানত জমির মাপ হত। কিন্তু কোন কোন অঞ্চলের মাপে আঢ়বাপের ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য। সেন তাম্রশাসনের ছোট ছোট ভূমিমাপের ব্যবহার থেকে মনে হয় যে জমির উপর অধিকারবোধ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং প্রত্যেক ভূখণ্ড সুনির্দিষ্ট মাপে সীমা চিহ্নিত করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। দেখা যাচ্ছে যে সেন আমলের গোড়ায় জমি ও গ্রাম জরিপের একটি চালু ও নিপুণ ব্যবস্থা ছিল। জমিজমা সংক্রান্ত দলিল বিষয়ক একটি পদ হয়তো মহামুদ্রাধিকৃত নামে পরিচিত ছিল। এই কর্মচারীটির দায়িত্ব ছিল প্রতিটি দলিলে রাজকীয় সীলমোহর অঙ্কিত করা।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও বলা যায় যে পরবর্তী সেনরাজারা ভূমি ও রাজস্ব বিভাগের উপর যথেষ্ট সচেতন দৃষ্টি দিতে পারেননি। তাম্রশাসন থেকে তিন ধরনের জমির কথা জানা যায়— (১) বাস্তুক্ষেত্র, যেখানে বসতবাড়ি তৈরি হয়, (২) বাপক্ষেত্র বা নালক্ষেত্র, যে জমিতে চাষ-আবাদ হয়, এবং (৩) খিলক্ষেত্র বা অনাবাদী জমি, গুপ্তযুগে খিলক্ষেত্রকে বাপক্ষেত্রে পরিণত করার উদ্দেশ্যে অল্প দামে এ ধরনের জমি বিক্রির দলিল পাওয়া গেছে। কিন্তু পাল-সেনযুগের এ ধরনের কোন ছবি তাম্রশাসনে ধরা পড়ে নি।

গুপ্তযুগের তাম্রশাসন থেকে মনে হয় সাধারণত উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে ধার্য করা হত। এ ছাড়াও জমির জন্য খাজনা দিতে হত। পালযুগের 'ষষ্ঠাধিকৃত' নামক কর্মচারীও এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু ধর্মপালের পরবর্তী কোন পালরাজার অথবা সেনরাজার কর্মচারী তালিকায় এই পদের উল্লেখ না থাকায় আমাদের সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে অসুবিধা হয়। পরবর্তী পালরাজাদের তাম্রশাসন ও প্রথম দিকের সেনরাজাদের তাম্রশাসন একসঙ্গে পড়লে মনে হয় সেনরাজারা তাঁদের পূর্ববর্তী পালরাজাদের রাজস্বব্যবস্থাই চালু রেখেছিলেন। যেমন, তৃতীয় বিগ্রহপালের বনগাঁও তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে প্রদত্ত ভূমিখণ্ড থেকে বছরে পাঁচশো 'পুরাণ' রাজস্ব আয় হত। বিজয়সেনের ব্যারাকপুর তাম্রশাসনেও বলা হয়েছে যে প্রদত্ত ভূমির বাৎসরিক আয় ছিল দুশো 'কপর্দ্দক পুরাণ'। অর্থাৎ, বিশেষ পরিমাণের কড়ির গণনায় বছরের রাজস্ব আয় নির্ধারিত হত। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে প্রতি দ্রোণতে পনেরো 'পুরাণ' আয় নির্ধারণ করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থা যদি সেন রাজত্বের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত করা হয়ে থাকে তবে মনে করা উচিত যে জমিপ্রতি আয় আগেই নির্ধারিত হত এবং কৃষককে সেই অনুযায়ী রাজস্ব দিতে হত, প্রতি বছরের উৎপাদনের ভিত্তিতে প্রতি বছর রাজস্ব নির্ধারিত হত না। তবে লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘি তাম্রশাসন থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে প্রত্যেক জমির ক্ষেত্রে একই হারের রাজস্ব-আয় নির্দিষ্ট হত না। সম্ভবত জমির উর্বরতা ও উৎপাদনক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন জমির বিভিন্ন রাজস্বসীমা নির্ধারণ করা হত।

সাধারণের ব্যবহার করা রাস্তা, গ্রামের গোচারণ-ভূমি ইত্যাদি রাজস্ব আয়ের তালিকার বাইরে ছিল। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের জমি এমনকী সংলগ্ন বনাঞ্চলও রাজস্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিচার্য ছিল। বিশ্বরূপ সেনের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাম্রশাসনের ভিত্তিতে বলা যায় যে বিভিন্ন ধরনের জমি থেকে বিভিন্ন হারে রাজস্ব আদায় করা হত। এই তাম্রশাসনের মাধ্যমে যে জমি দেওয়া হয়েছিল তার বাৎসরিক আয় ছিল আশি পুরাণের কিছু বেশি। তার মধ্যে ৪$^{৩}/_{৪}$ উদানের বাস্তুজমির রাজস্ব ছিল উদানপ্রতি ১$^{৩}/_{৮}$ পুরাণ। দুই উদানের 'ণাল' জমির রাজস্ব ছিল উদানপ্রতি ১$^{১}/_{৮}$ পুরাণ। জমির রাজস্ব নির্ধারণ করার সময় পানের বরজ, কলা, নারকেল, সুপারী গাছেরও হিসাব নেওয়া হত। নতুন ও পুরনো বরজের হিসাব রাখা হত। ফল-ফলাদির হিসাবও রাখা হত বলে মনে হয়।

যে সমস্ত জমি ব্রাহ্মণদের দান করা হত তা ছিল সাধারণত নিষ্কর। ঐ জমির থেকে যে রাজস্ব রাজার রাজকোষে জমা পড়ার কথা ছিল তা রাজা দানগ্রহণকারী ব্রাহ্মণদের ভোগ করার অধিকার দিতেন। কখনও কখনও এ ধরনের নিষ্কর জমি একজন ব্রাহ্মণের অধিকার থেকে নিয়ে অন্য ব্রাহ্মণকে দান করা হত। এ ধরনের নিষ্কর জমি যদি কোন ব্রাহ্মণ অপর কোন ব্রাহ্মণকে বিক্রি করতেন তবে সেই জমি আর নিষ্কর থাকত না, যদি না সেই জমি আবার রাজা নিষ্কর বলে ঘোষণা করতেন। বিশ্বরূপ সেনের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে রাজপণ্ডিত মহশ্বেরের ১২$^{৩}/_{৪}$ দানের নিষ্কর জমি পণ্ডিত হলায়ুধ কিনে নিয়েছিলেন।

রাজা, রানী, রাজপুত্ররাও জমি ভোগ করতেন, অর্থাৎ ঐ সমস্ত জমি থেকে আয় তাঁদের ব্যক্তিগত খরচের জন্য নির্দিষ্ট হত। ঐ সমস্ত জমি থেকে তাঁরা দানও করতেন এবং অনেক সময় সেইসব দানের জমি 'নিষ্কর' বলে ঘোষণা করা হত। বিজয়সেনের স্ত্রী ও বল্লালসেনের মা বিলাসদেবীকে দু'বার নিষ্কর জমি দান করা হয়।

বড় বড় পদাধিকারী ব্যক্তিরাও তাঁদের জায়গীরের অন্তর্ভুক্ত জমি দান করতেন। সান্ধিবিগ্রহিক নাঞিংসিংহ হলায়ুধ নামের ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে জমিদান করেছিলেন এবং সে জমি 'নিষ্কর' ঘোষিত হয়েছিল।

ব্রাহ্মণ ছাড়া দেবতা, মঠ, মন্দিরের জন্যও নিষ্কর জমি দেওয়া হত। কখনও কখনও দানের জমি সম্পূর্ণ নিষ্কর করার পরিবর্তে অল্প রাজস্ব ধার্য করা হত।

সেন আমলের তাম্রশাসনগুলি পড়লে মনে হয় যে বিজয়সেন, বল্লালসেনের মতো রাজারা রাজস্ব বিভাগটি শক্তিশালী করার চেষ্টা করলেও তাঁদের সে চেষ্টা সার্থক হয় নি। প্রথম দিকের সেন তাম্রশাসনে ণলের ব্যবহার জমির মাপ ও সীমা সম্পর্কে যে ধরনের কঠোরতা অবলম্বন করতে দেখা যায় তা লক্ষ্মণসেন ও বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনে পাওয়া যায় না। প্রথম দু'জন নিষ্কর ভূমিদানের ক্ষেত্রেও যে সংযম দেখিয়েছেন তা লক্ষ্মণসেনের আমল থেকে আর দেখা যায় না। কেবলমাত্র লক্ষ্মণসেনের আমলে রাজস্ব বিভাগের কাজ যে অত্যন্ত শিথিলভাবে চলতো তাম্রশাসনগুলি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। লক্ষ্মণসেন আচার্য কুবেরকে ছয় 'পাটক' জমি দিয়েছিলেন। রাজস্ব বিভাগ তাঁকে জানায়-ই নি যে ঐ জমি তাঁর বাবা গয়াল ব্রাহ্মণ হরিদাসকে আগেই দান করেছেন। এই ত্রুটি আবিষ্কৃত হবার পর নতুন ব্যবস্থা নেওয়া হল। বিশ্বরূপ সেনের আমলেও একই রকমের ঘটনা ঘটতে দেখি। ১৩২ পুরাণ বা চুর্ণি আয়ের একটি ভূখণ্ড বিশ্বরূপ দেবশর্মন নামের ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয়েছিল। পরে দেখা গেল যে ঐ জমি আসলে কন্দর্প-শঙ্কর আশ্রমের নিজস্ব।

লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর তাম্রশাসনের মাধ্যমে বর্ধমানভুক্তির পশ্চিম খাটিকা অঞ্চলের ৬০ দ্রোণ এবং ১৭ উন্মান পরিমাণ জমি জনৈক ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয়েছিল। দ্রোণপ্রতি ১৫ পুরাণ ছিল রাজস্ব এবং ঐ জমির রাজস্ব আয় ছিল নশো পুরাণ। কিন্তু আমরা হিসাব করলে দেখতে পাই যে দ্রোণপ্রতি পনেরো পুরাণ রাজস্ব ধার্য করলে ষাট দ্রোণেরই আয় হয় নশো পুরাণ। অর্থাৎ বাকী সতেরো উন্মান পরিমাণ জমির রাজস্বের কোন হিসাবই ছিল না।

ব্যক্তিগত জমির ঊর্ধ্বতন সীমাও নির্দিষ্ট করা ছিল না। ফলে, প্রভাবশালী ও সম্পন্ন ব্যক্তিরা দান ও ক্রয়ের মাধ্যমে বিশাল জমির অধিকারী হয়ে বসতেন। যেমন ধরা যাক হলায়ুধ পণ্ডিতের কথা। রাজা তাঁকে 'নিষ্কর' জমি দান করেছেন। তিনি নিজেও নানা ব্যক্তির কাছ থেকে জমি কিনেছেন এবং সেই সব জমিও 'নিষ্কর' বলে ঘোষিত হয়েছে। এই সমস্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিরা যে নানাভাবে রাজার ক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করতেন সে কথা বলাই বাহুল্য।

বহিরাগত তুর্কীসেনাদের আক্রমণে বাংলায় সেনদের আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। কিন্তু এই পতনের বীজ বোধহয় নিহিত ছিল লক্ষ্মণসেন ও তাঁর উত্তরসূরিদের শাসনকাঠামোর দুর্বলতায়। ভূমি ও রাজস্বের মতো বিশেষ প্রয়োজনীয় বিভাগেই যখন এত গাফিলতি তখন অন্যান্য বিভাগের শাসনব্যবস্থা যে কতদূর শক্তিশালী ছিল তা ধারণা করা কঠিন। এ ছাড়া এরকমও দেখা যায় যে বিষয়পতিগণ মাঝে মাঝে প্রজাদের উৎপীড়ন করতেন। ভাট ভাইগণও নানারকম চাপ সৃষ্টি করতেন। প্রজাদের উপর করের বোঝা চাপানো হয়েছিল। সদুক্তিকর্ণমৃত বা সহজিয়া দোহাগুলি থেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের ছবি পাওয়া যায়। সম্ভবত শাসনবিভাগেই দুর্বলতা, অরাজকতা, ব্রাহ্মণ বা সামন্ত বা বিষয়পতিগণের উৎপীড়ন এ সবই রাজ্য শাসনকাঠামোকে দুর্বল করে দিয়েছিল।

১খ.৮.৪ উপসংহার

সপ্তম শতাব্দী থেকে বাংলায় আঞ্চলিক শক্তির উত্থানের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক সমাজের সম্প্রসারণ হয়। বন কেটে বসতি গড়া হয়। পুণ্ড্র, বঙ্গ, রাঢ়, সুহ্ম, সমতটের বিভিন্ন অঞ্চল মানুষের বসবাসের যোগ্য হয়ে ওঠে। শশাঙ্কের মতো শক্তিশালী রাজা হয়তো এই সমস্ত বিভিন্ন অঞ্চলের উপর তাঁর অধিকার বিস্তৃত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু যেই মুহূর্তে বাংলায় শক্তিশালী শক্তির অভাব হয়েছে সেই সময়ই ছোট ছোট ভূস্বামীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবার চেষ্টা করেছেন। এঁরা যে শক্তিশালী কোন শাসনকাঠামো গড়ে তুলতে পারবেন না তা ধরেই নেওয়া যায়। ফলে, দেখা দিয়েছে মাৎস্যন্যায়। পালরাজারা এই অরাজকতা দূর করতে পারলেও তঁদের সাড়ে চারশো বছরের রাজত্বের সবসময়ই তাঁরা যে সমস্ত অঞ্চলগুলির উপর তাঁদের আধিপত্য বজায় রাখতে পেরেছিলেন তা নয়। দুর্বল রাজাদের আমলে সামন্তরা স্বাধীন হয়েছে, আবার ছোট ছোট ভূখণ্ড নিজস্ব শাসনব্যবস্থার আওতায় এসেছে। একই সাথে পাল-সেন রাজাদের মতো আঞ্চলিক শক্তিকে লড়তে হয়েছে বৃহত্তর ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের শক্তিশালী রাজশক্তির বিরুদ্ধে। যখন যে রাজশক্তি শক্তিমান হয়ে উঠেছে তখনই তারা তাদের সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করতে চেয়েছে, অন্যান্য অঞ্চলে নিজেদের অধিকার প্রসারিত করতে চেয়েছে। এর ফলে পাল-সেন রাজাদের যেমন উত্তরপ্রদেশ বা মধ্যপ্রদেশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে তেমনি লড়তে হয়েছে উড়িষ্যা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটকের রাজশক্তির সঙ্গে। এই সমস্ত যুদ্ধে তাঁদের জয়-পরাজয়ের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে তাঁদের স্থায়িত্বের কথা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক শক্তি বা সামন্তচক্রের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের কথা। কিন্তু যে কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল, বাংলায় যে সমস্ত রাজশক্তি প্রবল হয়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে সেনরাজাদের মতো কেউ কেউ বহিরাগত হলেও বাংলার সাংস্কৃতিক স্থিতি তাদের দ্বারা বিঘ্নিত হয় নি। শাসনকাঠামোর অবশ্যই পরিবর্তন হয়েছে। গুপ্তযুগের তাম্রশাসনের সঙ্গে পাল-সেনযুগের তাম্রশাসনের তুলনা করলেই এই প্রশাসনিক পরিবর্তনের ছবি ধরা পড়ে যদিও বিভিন্ন রাজবংশের অনুসৃত শাসনপদ্ধতি বিস্তৃত আলোচনা করার মতো তথ্য অপ্রতুল। পাল আমলের তাম্রশাসনে বিপুলসংখ্যক রাজকর্মচারীর পদ ও নাম পাওয়া গেলেও শাসনকাঠামোর রূপটি পরিষ্কার নয়। পাল রাজত্বের শেষের দিকের তাম্রশাসন অর্থনৈতিক সংকটের আভাস দেয়। কৈবর্তবিদ্রোহ দমন করা হলেও সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তি নিশ্চয়ই ভেঙে যাচ্ছিল। সেনরাজারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই ভূমি-রাজস্বনির্ভর অর্থনৈতিক কাঠামো সতেজ করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, হয়তো অনেকাংশে তাঁরা সফলও হয়েছিলেন। তাই বাংলার বুকে দীর্ঘ সেন রাজত্বও সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সেন- রাজাদের আমলে শাসনব্যবস্থার রাশ নিশ্চয়ই টেনে ধরা হয় নি। তুর্কী আক্রমণে বিধ্বস্ত সেনরাজাদের পক্ষে তাই বিক্রমপুর অঞ্চলেও আর দীর্ঘকাল ক্ষুদ্র আঞ্চলিক শক্তি হিসাবেও টিকে থাকা সম্ভবপর হল না।

১খ.৯ অনুশীলনী

১। শশাঙ্কের সময়ে বাংলার সমাজব্যবস্থা কীরূপ ছিল?

২। দেবপালের রাজত্বকালে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর বর্ণনা দিন।

৩। সেনরাজবংশের শাসনকাঠামো আলোচনা করুন।

৪। টীকা লিখুন ঃ

(ক) মহেন্দ্রপাল

(খ) চন্দ্রবংশ

(গ) বল্লালসেন

(ঘ) পালরাজাদের রাজস্ব বিভাগ

১খ.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। রমেশচন্দ্র মজুমদার ঃ *দ্য হিস্ট্রী অফ্ বেঙ্গল,* প্রথম খণ্ড (১৯৪৩)।

২। নীহাররঞ্জন রায় ঃ *বাঙ্গালীর ইতিহাস,* আদি পর্ব (১৯৮০)।

৩। দীনেশচন্দ্র সরকার ঃ *পাল-পূর্বযুগের বংশানুচরিত* (১৯৮৫)।

৪। দীনেশচন্দ্র সরকার ঃ *পাল-সেনযুগের বংশানুচরিত,* (১৯৮২)।

৫। রামশরণ শর্মা ঃ *ভারতের সামন্ততন্ত্র* (চতুর্থ হইতে দ্বাদশ শতাব্দী) (১৯৮৫)।

৬। দীনেশচন্দ্র সরকার ঃ *সিলেক্ট ইনস্ক্রিপসনস্ বিয়ারিং অন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রী অ্যান্ড সিভিলাইজেশন,* প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৬৫, ১৯৮৩)।

একক ১গ ❐ সুদূর দাক্ষিণাত্যের রাজবংশসমূহ

গঠন

১গ.১ উদ্দেশ্য

১গ.২ প্রস্তাবনা

১গ.৩ কাঞ্চিপুরমের পল্লবরা

১গ.৩.১ সিংহবর্মন এবং সিংহবিষ্ণু (৫৫০-৬০০ খ্রিঃ)

১গ.৩.২ প্রথম মহেন্দ্রবর্মন (৬০০-৬৩০ খ্রিঃ)

১গ.৩.৩ প্রথম নরসিংহবর্মন (৬৩০-৬৬৮ খ্রিঃ)

১গ.৩.৪ দ্বিতীয় মহেন্দ্রবর্মন (৬৬৮-৬৭০ খ্রিঃ)

১গ.৩.৫ প্রথম পরমেশ্বরবর্মন (৬৭০-৭০০ খ্রিঃ)

১গ.৩.৬ দ্বিতীয় নরসিংহবর্মন রাজসিংহ (৭০০-৭২৮ খ্রিঃ)

১গ.৩.৭ দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মন (৭২৮-৭৩১ খ্রিঃ)

১গ.৪ চোলবংশ—সূচনা

১গ.৪.১ রাজরাজ চোল (৯৮৫-১০১৪ খ্রিঃ)

১গ.৪.২ রাজেন্দ্র চোল

১গ.৪.৩ পরবর্তী চোলশাসক

১গ.৫ চোল শিল্প স্থাপত্য

১গ.৬ চোলদের শাসনব্যবস্থা

১গ.৭ অনুশীলনী

১গ.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১গ.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন ঃ

- কাঞ্চিপুরমের পল্লববংশীয় রাজাদের ইতিহাস
- চোল-রাজবংশের ইতিহাস
- চোলদের শিল্প স্থাপত্যের ইতিবৃত্ত এবং
- চোলদের শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি

১গ.২ প্রস্তাবনা

উপদ্বীপীয় ভারতের দক্ষিণ অংশে খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময় রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময় দক্ষিণ ভারতে তিনটি প্রধান রাজবংশের উত্থান ও পতন ঘটেছিল। এদের মধ্যে একটি হল চালুক্যরাজবংশ। এর ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল উত্তর কর্ণাটক। অন্য দুটি রাজবংশ হল পল্লব এবং পাণ্ড্য। এদের ক্ষমতার জায়গা ছিল তামিল ভাষাভাষী এলাকাগুলি। এই দুটির মধ্যে পল্লবরা, যাদের রাজধানী হল কাঞ্চিপুরম, খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং পরবর্তী দুটি শতক জুড়ে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অবয়ব নির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। পল্লবদের রাজত্বকালে রাজনৈতিক দিক থেকে উপরোক্ত তিনটি শক্তির মধ্যে ক্রমান্বয়ে তিক্ত সংঘর্ষ চলেছিল; কিন্তু সাংস্কৃতিক দিকে এই সময়ে দেখা গিয়েছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত ধর্মীয় 'ভক্তি' আন্দোলন। একইরকম গুরত্বপূর্ণ ছিল মন্দির তৈরির কলাকৌশলের উন্নতি।

১গ.৩ কাঞ্চিপুরমের পল্লবরা

পল্লবদের আদি ইতিহাস অন্ধকারে ঢাকা। সম্ভ বত অন্ধ্রে এদের আদিবাস ছিল এবং দক্ষিণে অন্ধ্রের কোনও অংশ এদের অধিকারে ছিল। প্রস্তরলিপির তথ্য থেকে জানা যায় যে, খ্রিস্টীয় চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত পল্লবরা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। পল্লবদের একটি শাখা বাসস্থান ছেড়ে আরও দক্ষিণদিকে এগিয়ে তোণ্ডাইমণ্ডলম অঞ্চলে চলে আসে এবং কাঞ্চিকে রাজধানী করে তাদের ক্ষমতা বিস্তার করে। পল্লবশাসকদের মধ্যে এরাই অতি শীঘ্র খ্যাতি লাভ করে এবং খ্রিস্টীয় নবম শতক পর্যন্ত তাঁদের এই গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে।

১গ.৩.১ সিংহবর্মন এবং সিংহবিষ্ণু (৫৫০-৬০০ খ্রিঃ)

সিংহবর্মন ও সিংহবিষ্ণুর রাজত্বকালে কাঞ্চির পল্লবদের ইতিহাসের সূচনা। এঁরা বংশপরম্পরায় ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় ভাগ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। এই দুজনেরই মধ্যে সিংহবর্মন সম্পর্কে খুবই কম জানা যায়। সম্ভবত তিনি দশ বছরেরও কম সময় রাজত্ব করেছিলেন। সুতরাং পল্লববংশের যথার্থ প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সিংহবিষ্ণু। কাসাককণ্ডিলিপি অনুসারে তিনি মালয়, কালাভ্র, মালব, চোল, পাণ্ড্য এবং সিংহলের রাজাদের পরাজিত করেন। তাঁর চোলরাজ্য জয়ের কথা বেলুরপালাইয়াম লিপিতেও বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এ থেকে একথা বলা যায় যে, সিংহবিষ্ণুর রাজত্বকালে চোলমণ্ডলম ছিল পল্লব সাম্রাজ্যের দক্ষিণভাগ। তাঁর রাজত্বের সঠিক সময়কাল নির্ণয় করা বেশ কঠিন, কিন্তু তা ষষ্ঠ শতকের শেষ দশকের কোনও একসময় শেষ হয়েছিল একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

১গ.৩.২ প্রথম মহেন্দ্রবর্মন (৬০০-৬৩০ খ্রিঃ)

সিংহবিষ্ণুর পুত্র এবং উত্তরাধিকারী প্রথম মহেন্দ্রবর্মন এক বিশাল সাম্রাজ্য উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল তামিল ভাষাভাষী অঞ্চলের কেন্দ্রীয় ও উত্তর-অঞ্চলসমূহ। মহেন্দ্রবর্মনের রাজত্বকাল দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস এবং সংস্কৃতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত। আগেই বলা হয়েছে, এই

সময় ধর্মীয় 'ভক্তি' আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে, যার নেতৃত্বে ছিলেন শৈব্য নায়ানার এবং বৈষ্ণব আলবাররা। এই সকল সন্ন্যাসীদের নেতৃত্বে পরিচালিত ভক্তি আন্দোলন ব্রাহ্মণ্য ধর্মে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল এবং একইসঙ্গে দক্ষিণ ভারতের জৈন ও বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা তৈরি করেছিল। এ ছাড়াও দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের রাজত্বকাল একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। তাঁর রাজত্বকালেই সর্বপ্রথম তোণ্ডাইমণ্ডালের পাথর কেটে মন্দির তৈরি হয়। আবার তাঁর সময়েই সংস্কৃত সাহিত্য এবং সংস্কৃতি সুদৃঢ় দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারবি এবং দণ্ডিণ-এর মতো সাহিত্যের বিখ্যাত পণ্ডিত পল্লব-রাজসভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পল্লবদের সময়ে কাঞ্চিপুরম শুধুমাত্র বিখ্যাত ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবেই নয়, শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করেছিল। মহেন্দ্রবর্মনের রাজত্বকাল থেকে তামিল সংস্কৃতির রূপায়ণ সূচিত হয়।

রাজনৈতিক দিক থেকে অবশ্য মহেন্দ্রবর্মনের রাজত্বকাল ব্যাপক কোনও সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। অন্যদিকে, তাঁর সমসাময়িক চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল লিপি ইঙ্গিত দেয় যে, প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের রাজত্বকালেই দ্বিতীয় পুলকেশী কাঞ্চিপুরম আক্রমণ করেন এবং সম্ভবত তাঁকে পরাজিত করেন।

প্রথম মহেন্দ্রবর্মন সংস্কৃত তামিল এবং তেলেগু ভাষায় কয়েকটি পদবী গ্রহণ করেছিলেন। এইসব পদবী সঠিক হলে একথা বলা যেতে পারে যে, প্রথম মহেন্দ্রবর্মন ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। পদবীগুলির কয়েকটি হলঃ সংকীর্ণজাতি, মত্তবিলাস, বিচিত্র-চিত্ত, চিত্রকারাপ্পুলি (শিল্পীদের মধ্যে ব্যাঘ্রবিশেষ) প্রভৃতি। তবে মহেন্দ্রবর্মন যে একজন নামী লেখক ছিলেন একথা সুবিদিত, কারণ সংস্কৃত ভাষার অন্যতম ব্যাঙ্গাত্মক রচনা *মত্তবিলাসপ্রহসনম্* তাঁর রচনা। সংস্কৃত ব্যাঙ্গ রসাত্মক রচনাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম *ভাগবদাজ্জুকীয়ম্* তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু এই মতের ভিত যথেষ্ট দুর্বল। তামিল শৈব্য ঐতিহ্যানুসারে প্রথম মহেন্দ্রবর্মন ছিলেন জৈন, পরে নায়নারদের মধ্যে অন্যতম আপ্পার-এর দ্বারা শৈবমতে দীক্ষিত হন। আপ্পারকে 'তিরুনাভাক্কারাসু' নামেও অভিহিত করা হয়। পাথর কেটে তৈরি মন্দিরের অন্তত ছয়টি নির্মাণ-কৃতিত্ব প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের। এর সবকটিতেই লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে। এর মধ্যে তিরুচিরাপল্লির পাথর কেটে তৈরি মন্দিরের লেখতে তাঁর ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তনের কথা উল্লিখিত। ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের মৃত্যু হয় এবং তাঁর পুত্র প্রথম নরসিংহবর্মন সিংহাসনে বসেন। ইনি 'মমল্ল' নামেই বেশি পরিচিত।

১গ.৩.৩ প্রথম নরসিংহবর্মন (৬৩০-৬৬৮ খ্রিঃ)

নরসিংহবর্মন ওরফে 'মমল্ল' পল্লবরাজবংশের স্মরণীয় শাসক ছিলেন। তাঁর লেখগুলি ছাড়াও চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে পল্লব দেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে কৌতূহলজনক বিবরণ পাওয়া যায়। হিউয়েন সাঙ ৬৪০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ পল্লবদের রাজধানীতে এসেছিলেন। সিংহলী বিবরণ 'মহাবংশ' থেকে সিংহলের রাজবংশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে পল্লব হস্তক্ষেপের কথা জানা যায়। নরসিংহবর্মন তাঁর মিত্র সিংহলরাজ মানববর্মাকে সিংহাসন পেতে সাহায্য করেছিলেন।

প্রথম নরসিংহবর্মনের সবচেয়ে বৃহৎ রাজনৈতিক সাফল্য চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভ। ৬৪১-৪২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ দ্বিতীয় পুলকেশী দ্বিতীয়বার কাঞ্চিপুরম আক্রমণ করেন কিন্তু এবারে তাঁর বিপক্ষে ছিলেন প্রবল প্রতাপশালী প্রথম নরসিংহবর্মন। তাঁর পৌত্র পরমেশ্বরবর্মনের কুমারলিপি অনুসারে, দ্বিতীয় পুলকেশীর নেতত্বে চালুক্য সেনাবাহিনী কাঞ্চিপুরমের কুড়ি মাইল ভেতরে ঢুকে আসে। অনুপ্রবেশকারী

সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে প্রথমে মণিমঙ্গলমে তীব্র সংঘর্ষ হয় এবং পল্লববাহিনী জয়লাভ করে। চালুক্যসেনা ক্রমে পিছু হটতে থাকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিয়ালা এবং সুরমারাতের যুদ্ধে চালুক্যসেনার চরম পরাজয় ঘটে। অবশেষ পল্লব-সৈন্য সরাসরি বাতাপিতে প্রবেশ করে এবং শহরটি দখল করে। সকল সম্ভাবনা যাচাই করে বলা যায় যে এই যুদ্ধগুলির কোনও একটিতেও দ্বিতীয় পুলকেশীর মৃত্যু ঘটে, কারণ, এরপরে তাঁর সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায় না।

প্রথম নরসিংহবর্মনের বাতাপি-লিপি উৎকীর্ণ হয়েছিল তাঁর রাজত্বকালের ত্রয়োদশ বছরে; সুতরাং বলা চলে যে ৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম নরসিংহবর্মন বাতাপি জয় করেন। তিনি 'বাতাপি-কোণ্ড' (বাতাপি-বিজয়ী) উপাধি গ্রহণ করেন। পল্লবদের এই জয় চালুক্য রাজনীতিতে তীব্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল এবং রাজধানীটি এক দশকেরও বেশি সময় পল্লবদের অধীনে ছিল। ৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে পুলকেশীর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য বাতাপিতে চালুক্যশাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। প্রথম বিক্রমাদিত্যের ক্ষমতালাভের সঙ্গে সঙ্গে পল্লবদের সঙ্গে চালুক্যদের এক তিক্ত শত্রুতার সূচনা হয়, যা এরপরের প্রায় একশ বছর ধরে বজায় ছিল।

প্রথম নরসিংহবর্মন পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে দক্ষিণ ভারতীয় কলা এবং স্থাপত্যশিল্পে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ও অবদান রেখেছিলেন। পাথর কেটে তৈরি মহাবলিপুরমের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুহামন্দিরগুলি স্থাপত্যশিল্পে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ও অবদান রেখেছিলেন। পাথর কেটে তৈরী মহাবলিপুরমের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুহামন্দিরগুলি স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাসে তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে।

১গ.৩.৪ দ্বিতীয় মহেন্দ্রবর্মন (৬৬৮-৬৭০ খ্রিঃ)

৬৬৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মমল্লর পুত্র দ্বিতীয় মহেন্দ্রবর্মন সিংহাসনে বসেন। এখনও পর্যন্ত তাঁর কোনও লেখ পাওয়া যায় নি এবং তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রথম পরমেশ্বরবর্মনের সময়কার বর্ণনায় তাঁকে বাঁধা গতে সামান্য প্রশংসা করা হয়েছে। গাড্ডেমান লেখতে সম্ভবত দ্বিতীয় মহেন্দ্রবর্মনের সঙ্গে জয়সিংহের পুত্রর এবং চালুক্যরাজের ভাগনে শিলাদিত্য-এর সংঘর্ষের কথা বলা হয়েছে। হয়তো এই যুদ্ধেই মহেন্দ্রবর্মন প্রাণ হারিয়েছিলেন।

১গ.৩.৫ প্রথম পরমেশ্বরবর্মন (৬৭০-৭০০ খ্রিঃ)

দ্বিতীয় মহেন্দ্রবর্মনের পুত্র প্রথম পরমেশ্বরবর্মন এক সঙ্কটময় মুহূর্তে সিংহাসনে বসেন এবং পল্লব রাজনীতি তথা সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের মধ্য দিয়ে একজন সুযোগ্য শাসক হিসেবে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। কুরাম লেখ, ভুন্না গুরুভায়াপালেম লেখ এবং মমল্লপুরমের বেশকিছু প্রস্তর লেখ থেকে তাঁর কৃতিত্বের কথা জানা যায়।

পশ্চিমের চালুক্যদের সঙ্গে পারিবারিক শত্রুতা প্রথম পরমেশ্বরবর্মনের সময়েও বজায় ছিল। হৃত অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য চালুক্যরাজ প্রথম বিক্রমাদিত্য (৬৫৫-৬৮১ খ্রিঃ) ৬৭৪ খ্রিস্টাব্দের আগেই পল্লবশাসক—প্রথম নরসিংহ, দ্বিতীয় মহেন্দ্র এবং প্রথম পরমেশ্বরবর্মনের সময়ে লড়াই চালিয়েছিলেন। তবে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংঘাতটি ঘটেছিল ৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে, প্রথম পরমেশ্বরবর্মনের সিংহাসন আরোহণের মাত্র তিন বছর পরে। হোনুর লেখ এবং গাঢ় ভাল লেখ অনুসারে ৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে কাঞ্চিপুরমের কাছে মল্লিউর-

এ তিনি শিবির স্থাপন করেন এবং শীঘ্রই শহর আক্রমণ করেন যাতে পল্লবরাজ পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। তিনি এরপর আরও দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে কাবেরী নদীর তীরে উরগপুর-এ শিবির স্থাপন করেন। চূড়ান্ত পরাজয়ের পরেও নির্ভীক রাজা প্রথম পরমেশ্বরবর্মন তিরুচির কাছে পেরুভালানাল্লুর-এর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন তিনি চালুক্যরাজকে চাপে ফেলার জন্য তাঁর অন্যতম সেনাপতি পরনজ্যোতির নেতৃত্বে একটি সৈন্যদলকে চালুক্য রাজধানী আক্রমণের জন্য পাঠান। কৌশলটি কাজ করেছিল এবং কুরম লেখ অনুসারে প্রথম পরমেশ্বরবর্মন তাঁর অধিকৃত অঞ্চল থেকে চালুক্য সেনাবাহিনীকে হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাতাপির দিকে পল্লব বাহিনীর পরিচালক সেনাপতি পরমজ্যোতি পরবর্তীকালে তামিল শৈবধর্মের নায়নার-এ পরিণত হন। তাঁকে 'চিরুট্টনডার' (ছোট্ট ভৃত্য) নামে স্মরণ করা হয়।

চালুক্যদের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত ছাড়াও প্রথম পরমেশ্বরবর্মন তাঁর দক্ষিণের প্রতিবেশী সঙ্গেও পাণ্ড্যদের সঙ্গেও সংঘর্ষে লিপ্ত হন। পাণ্ড্যরাজ অরিকেশরী নরবর্মন (৬৭০-৭০০ খ্রিঃ) নেলভেলির যুদ্ধে পল্লবরাজকে পরাজিত করেন। প্রথম পরমেশ্বরবর্মন গঙ্গারাজ ভূবিক্রম-এর সঙ্গেও যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বকালের ভালো সময়টাই আক্রমণাত্মক ও রক্ষণাত্মক যুদ্ধের নিরবচ্ছিন্ন কাহিনী।

প্রথম পরমেশ্বরবর্মন ছিলেন অত্যন্ত শিবভক্ত, যদিও তিনি গণেশ রথ নির্মাণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রামানুজমণ্ডলম, ধর্মাজমণ্ডলম, মমল্লাপুরমের আদি-বরাহ গুহামন্দির প্রভৃতি তাঁরই পৃষ্ঠপোষণায় নির্মিত হয়। সর্বোপরি, তিনি হলেন তামিলনাড়ুতে পাথরের মন্দিরের গঠনগত স্থাপত্যশৈলীর প্রবক্তা। কুরমের 'বিদ্যাবিনিতা-পল্লব' পরমেশ্বর-গৃহ হল তামিলনাড়ুর প্রাচীনতম গঠনগত মন্দির স্থাপত্যের নিদর্শন।

১গ.৩.৬ দ্বিতীয় নরসিংহবর্মন রাজসিংহ (৭০০-৭২৮ খ্রিঃ)

৭০০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পরমেশ্বরবর্মনের পুত্র দ্বিতীয় নরসিংহবর্মন সিংহাসনে বসেন এবং পরবর্তীকালে 'রাজসিংহ' উপাধি দ্বারা পরিচিত হন। রাজসিংহ তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ রাজত্ব চালিয়েছিলেন, কারণ তাঁর সময়ে চালুক্যপল্লব-পাণ্ড্য সংঘর্ষে ছেদ পড়েছিল। সেইজন্যই তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি এবং সম্পদ শিল্পকলার বিকাশে কাজে লাগাতে সক্ষম হন। বস্তুত, তাঁর রাজত্বকালেই তোণ্ডাইমণ্ডলের দ্রাবিড় স্থাপত্যের সবচেয়ে বিখ্যাত মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল। এই মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম হল ঃ মমল্লপুরমের সমুদ্রতট মন্দির, কাঞ্চিপুরমের কৈলাশনাথ মন্দির চত্তরে একটি ছোট মন্দির নির্মাণ করেন।

রাজসিংহ তাঁর বৃদ্ধ-প্রপিতামহ প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের মতো বিভিন্ন ধরনের উপাধি গ্রহণ পছন্দ করতেন। যেমন রণবিক্রম, অমিত্রমল্ল, অখণ্ডশনি, অতিরণচণ্ড, চিত্রকরমুক, সমরধনঞ্জয়, ধানসুর প্রভৃতি রাজত্বের প্রথমদিকের মতো শেষের বছরগুলি কিন্তু রাজসিংহের শান্তিপূর্ণ ছিল না। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তৃতীয় মহেন্দ্রবর্মন তাঁর আগেই মারা যান। বৈকুণ্ঠপেরামল-এর প্রাচীরের ঐতিহাসিক স্থাপত্যের প্যানেল থেকে একথা বলা যায় যে, তৃতীয় মহেন্দ্রবর্মন গাঙ্গারাজের সঙ্গে যুদ্ধে আহত এবং শেষ পর্যন্ত নিহত হন। প্যানেলে দেখা যায় যে রাজসিংহ এবং তাঁর রানীর সামনে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একজন আহত ব্যক্তিকে শিবিকায় শুইয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে। এই ঘটনার পর রাজসিংহ বেশিদিন বাঁচেন নি।

১গ.৩.৭ দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মন (৭২৮-৭৩১ খ্রিঃ)

রাজসিংহের মৃত্যুর পর সম্ভবত তাঁর দ্বিতীয় পুত্র দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মন সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজত্বকাল মাত্র তিন বছর। এর মধ্যেই পশ্চিমের চালুক্য সাম্রাজ্যের যুবরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের কাছে তাঁর চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে।

দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মনের মৃত্যুর পর চরম বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য দেখা যায়। ক্ষমতা দখল করার মতো যোগ্য ব্যক্তির অভাব ঘটে। এই সঙ্কটময় মুহূর্তের ঘটনাবলী কাঞ্চির বৈকুণ্ঠপেরামলের ঐতিহাসিক স্থাপত্যে মূর্ত হয়ে আছে। প্যানেল থেকে যোগ্য উত্তরাধিকার খোঁজার জন্য মাত্রা, মূল-পুরুষদের নিয়োগের কথা জানা যায় এবং অন্যান্যরা এ ব্যাপারে হিরণ্যবর্মন (রাজবংশের একজন সদস্য)-কে অনুরোধ জানান। তিনি যাদরেই জিজ্ঞাসা করেন, তারা সকলেই অসম্মতি জানান। শেষ পর্যন্ত হিরণ্যবর্মনের বারো বছরের পুত্র নন্দীবর্মনকে মনোনীত করা হয়। কিন্তু কাঞ্চি পৌঁছতে এবং সিংহাসনে বসতে হলে নন্দীবর্মনকে অনেক পাহাড়, নদনদী পেরিয়ে যেতে হয়। তাঁর এই মনোনয়ন মসৃণ বা শান্তিপূর্ণ ছিল না। তাঁকে পাণ্ড্যরাজ নববর্মন রাজসিংহের (৭৩০-৭৬৫ খ্রিঃ) সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। পাণ্ড্যরাজা অসন্তুষ্ট পল্লব রাজপুত্র চিত্রময়কে যোগ্য উত্তরাধিকারী বলে তুলে ধরে এই যুদ্ধ করেন। তাছাড়া পল্লব রাজবংশের অন্যান্য প্রতিপক্ষের সঙ্গেও নন্দীবর্মনকে যুঝতে হয়েছিল। কয়েক বছরের মধ্যেই এইসব ঘটনা একসঙ্গে ঘটে যায় এবং শেষ পর্যন্ত, ৭৩১ খিস্টাব্দে দ্বিতীয় নন্দীবর্মনের পল্লবমল্লের শাসন শুরু হয়। দ্বিতীয় নন্দীবর্মনের পর পল্লববংশ দীর্ঘকাল ধরে কাঞ্চিপুরমকে কেন্দ্র করে সুদূর দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করেন। পল্লবরাজ অপরাজিত এই বংশের শেষ রাজা যিনি আদিত্য চোলের হাতে পরাজিত ও উচ্ছেদ হন আনুমানিক ৮৯০ খ্রিস্টাব্দে।

১গ.৪ চোলবংশ—সূচনা

পল্লবরাজশক্তির প্রাধান্য থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন চোল-শক্তির প্রতিষ্ঠা দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নবম শতাব্দের মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দের শেষদিক পর্যন্ত চোলরাষ্ট্রকে কেন্দ্র করেই ঐ অঞ্চলের ইতিহাস গড়ে ওঠে। অবশ্য তার আগেও চোলদের পরিচিতি কম ছিল না। অশোকের শিলালিপিতে *পেরিপ্লাস* গ্রন্থে, টলেমির বর্ণনায়, পালিগ্রন্থ *মহাবংশ*-এ এবং *মিলিন্দ পঞ্হো*-তে চোলদের বন্দর হিসেবে কোলপত্তন বা কাবেরীপত্তন এবং নেগপত্তমের উল্লেখ আছে। তবে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে তাদের মূল উত্থান নবম শতাব্দে।

দক্ষিণ ভারতে চোলশক্তির প্রথম স্রষ্টা বিজয়ালয় (৮৫০-৮৭১ খ্রিঃ) পল্লবরাজা নৃপতুঙ্গের সামন্তরাজা হিসেবে জীবন শুরু করেন। কিন্তু প্রথম আদিত্য (৮৭১-৯০৭ খ্রিঃ) পল্লবদের অধীনতা অস্বীকার করেন। তিরুবালঙ্গারুপট্ট এবং কন্যাকুমারী লেখ থেকে জানা যায় যে, পল্লবরাজ অপরাজিতকে রাজ্যচ্যুত করে তোণ্ডাইনাদে প্রথম আদিত্য পল্লব শাসনের অবসান ঘটান এবং রাষ্ট্রকূট রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত চোল-নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেন। প্রথম আদিত্য-র পুত্র প্রথম পরান্তক (৯০৭-৯৫৫ খ্রিঃ) পাণ্ড্য রাজ্য আক্রমণ করে 'মাদুরাইকোণ্ড' অভিধা নিয়েছিলেন। আবার ৯১০-১১ খ্রিস্টাব্দে বল্লালের যুদ্ধে রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণকে হারিয়ে দিয়ে তিনি পেয়েছিলেন 'বীর-চোল' আখ্যা। চোলগণ মাত্র দু'দশকের মধ্যে একটি বিস্তৃত অঞ্চলে তাঁদের শাসন জারী করেন।

১গ.৪.১ রাজরাজ চোল (৯৮৫-১০১৪ খ্রিঃ)

রাজরাজ চোল-এর শাসন চোল রাজতন্ত্রের গঠনকাল বলা হয়। এই তামিলরাজা পাণ্ড্যদের নিঃশেষ করে, কেরলের উদ্ধত রাজাদের পরাজিত করে নৌবহরের সাহায্যে সিংহল আক্রমণ করেন। সিংহলরাজ পঞ্চম মহেন্দ্র দক্ষিণ-পূর্বদিকে পালিয়ে গেলে রাজরাজের বাহিনী রাজধানী অনুরাধপুর ধ্বংস করে এবং পোলন্নরুবতে সিংহলীয় চোল-প্রদেশের রাজধানী স্থাপিত হয়।

৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রকূট শক্তির অবক্ষয়ের পর দক্ষিণের গঙ্গারাজ্য মিত্রহীন হয়ে পড়ে এবং তখন রাজরাজ গঙ্গারাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। মহীশূরের অন্তর্গত গঙ্গাপাড়ি, নোলম্বপাড়ি এবং তড়িগৈপাড়ি তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। দাক্ষিণাত্যের পূর্বউপকূলে বেঙ্গির চালুক্যদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে রাজরাজ সেখানে তার আধিপত্য ছড়িয়ে দেন। পশ্চিম উপকূলে পশ্চিম-চালুক্যরাজ সত্যাশ্রয়ের রাজ্য তিনি লুঠ করেন, মান্যখেত পুড়িয়ে দেন এবং বনবাসি ও রাইচুর দোয়াবের অনেকটা এলাকা দখল করে নেন।

সামরিক দিক থেকে রাজরাজ চোলের শেষ উল্লেখযোগ্য সাফল্য ছিল মালদ্বীপ বিজয়। এই নৌবিজয়ের ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, তার পরে রাজেন্দ্র চোল নৌবহরে যে সমৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন, তার প্রস্তুতি পর্ব সম্পূর্ণ হয়েছিল রাজরাজের সময়ে।

১০১২ খ্রিস্টাব্দে রাজরাজ রাজেন্দ্র চোলকে যৌবরাজ্যে বরণ করেন। ১০১৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। নিজে শৈব উপাসক হয়েও তিতিন সবধর্মের পৃষ্ঠপোষণ করেছিলেন। তাঞ্জোর রাজরাজেশ্বর শিব মন্দিরের ভাস্কর্য আর বিষ্ণু মন্দিরগুলো তাঁর ধর্মীয় উদারতার সাক্ষ্য দেয়। শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজা শ্রী-মার বিজয়োত্তুঙ্গ তারই উৎসাহে নেগাপত্তমে চূড়ামণি বিহার নির্মাণ করেন। বুদ্ধের উদ্দেশে নির্মিত এই বিহারের জন্য রাজরাজ একটি গ্রাম দান করেছিলেন।

১গ.৪.২ রাজেন্দ্র চোল

১০১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে দু'বছর যুবরাজ হিসেবে যুগ্মভাবে রাজরাজ চোলের সঙ্গে রাজ্যশাসন করবার পর ১০১৪ খ্রিস্টাব্দে রাজেন্দ্র চোল সিংহাসনে বসেছিলেন। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি পেয়েছিলেন সমগ্র তামিলনাড়ু, অন্ধ্র এবং মহীশূর ও সিংহলের একাংশ, একটি সংহত রাষ্ট্রকাঠামো, দক্ষ আমলাগোষ্ঠী, শক্তিশালী সেনা ও নৌবাহিনী। রাজেন্দ্র চোল তার সম্পদ ও সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর সময়ে চোল সাম্রাজ্য আয়তনে, মর্যাদায় গৌরবে সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেছিল।

রাজত্বের পঞ্চম বছরে রাজেন্দ্র চোল সিংহল অভিযান করেন। সিংহলী ইতিবৃত্ত *মহাবংশ* থেকে জানা যায় যে, গোটা সিংহলই রাজেন্দ্র চোল অধিকার করতে পেরেছিলেন। তিরুবালঙ্গারু পট্ট অনুসারে ষষ্ঠ বছরে রাজেন্দ্র চোল দিগ্বিজয়ে বার হন এবং পাণ্ড্য ও কেরল রাজ্য জয় করেন। পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্য আরব বণিকদের দাপট কমানোর জন্য রাজত্বের শেষ দিকে নৌবহর পাঠিয়ে তিনি মালদ্বীপ জয় সম্পূর্ণ করেন।

পশ্চিম-চালুক্যদের বিরুদ্ধে চোল সাম্রাজ্যের সঙ্গে অভিযান করেছিলেন বলে কয়েকটি লেখতে ইঙ্গিত দেওয়া আছে। সম্ভবত বেঙ্গিরাজ চোল সাম্রাজ্যের সঙ্গে অধীনতামূলক মিত্রতার সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। রাজেন্দ্র চোলের গাঙ্গেয় উপত্যকা অভিযানও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তা বঙ্গাভিযানের সময় যে ক'জন কর্ণাট

সামন্তনায়ক বাংলাদেশে এসেছিলেন, তাঁদেরই একজনের বংশধর সামন্তসেন সেনবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাছাড়া গঙ্গাতীর থেকে শৈবদের নিয়ে এসে রাজেন্দ্র চোল কাঞ্চিপুরমে তাদের বসিয়ে দেন। অভিযান শেষ করে তিনি ফিরে এসে তিরুচিরাপল্লি জেলায় নতুন রাজধানী গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরম গড়ে তুলেছিলেন।

রাজেন্দ্র চোলের শেষ গুরুত্বপূর্ণ অভিযান ছিল শ্রীবজয় অভিযান। মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও সংলগ্ন দ্বীপগুলো এই সামুদ্রিক রাষ্ট্রের অধীনে ছিল। চোলদের পূর্বাঞ্চলীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এর অবস্থান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভবত আরব বণিকদের চাপে শ্রীবিজয়ের রাজা চোল-বাণিজ্যে বাধার সৃষ্টি করেছিলেন। তাই শ্রীবজিয় অভিযান করা ছাড়া রাজেন্দ্র চোলের আর কোন উপায় ছিল না। অভিযান ছিল সফল। শ্রীবিজয়ের রাজধানী চোল নৌবাহিনীর হাতে অগ্নিদগ্ধ হয় এবং শ্রীবিজয়ের রাজা তাদের হাতে বন্দী হন। অবশ্য আনুগত্য স্বীকারের শর্তে রাজেন্দ্র চোল তাকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

১গ.৪.৩ পরবর্তী চোলশাসক

১০৪৪ খ্রিস্টাব্দে রাজেন্দ্র চোলের মৃত্যু হয়। তার উত্তরাধিকারীরা রাজত্ব করেন ১০৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। রাজেন্দ্র চোলের পরবর্তী তিন শাসক ছিলেন, তারই তিন পুত্র। তুঙ্গাভদ্রা-পরবর্তী চালুক্য ও দক্ষিণের পান্ড্য-কেরল রাজ্যের ধারাবাহিক বিরোধিতায় তাদের বিপর্যস্ত হতে হয়। প্রথম রাজাধিরাজের যুদ্ধক্ষেত্রেই মৃত্যু হয়। অবশেষে পূর্ব-চালুক্যদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে চোলদের শক্তিবৃদ্ধি করে চোলরাজ্যকে টিকিয়ে রাখা হয়। তবে রাজেন্দ্র চোলের পর চোলরাষ্ট্রের রাজনৈতিক গুরুত্ব আর ছিল না।

১গ.৫ চোল শিল্প-স্থাপত্য

চোলশিল্প স্থাপত্যের মূল পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজরাজ চোল ও রাজেন্দ্র চোল। এই শিল্প স্থাপত্যের প্রধান নিদর্শন হল প্রাসাদোপম মন্দির। এ.এল. ব্যাসাম মনে করেন, রাজপ্রাসাদের অনুকরণে তৈরি করা হত বলে মন্দির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা থাকত।

রাজরাজ চোলের সময়ে নির্মিত হয়েছিল তাঞ্জোরের বিখ্যাত রাজরাজেশ্বর শিব মন্দির। এই মন্দিরের বিমান, অর্ধমণ্ডপ, মহামণ্ডপ এবং সামনের বড় নন্দিচত্বর, সবই প্রশস্ত (৫০০ ফুট × ৯৫ ফুট) দেওয়াল-ঘেরা প্রাঙ্গণের কেন্দ্রে অবস্থিত। প্রাঙ্গণের অন্যান্য ছোট ছোট মন্দিরও আছে। পূর্বদিকে আছে গোপুরম। মন্দিরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর বিমান যাকে ভারতের স্থাপত্য শিল্পের 'কষ্টিপাথর' বলা হয়। তাঞ্জোরের মন্দিরে একটি মাত্র প্রস্তরখণ্ড থেকে নির্মিত চোদ্দোতল বিশিষ্ট গম্বুজসমন্বিত বিমানটির উচ্চতা ২০০ ফুট।

তাঞ্জোরের মন্দিরের প্রায় কুড়ি বছর পর রাজেন্দ্র চোল গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরমে আর একটি মন্দির তৈরি করান। এই মন্দিরের কারুকাজ আগেরটির চাইতেও অনেক বেশি ও বিচিত্র। মন্দিরটি নিঃসন্দেহে চোলসাম্রাজ্যের বিত্তবৃদ্ধির পরিচয় বহন করে।

দেওয়াল-ঘেরা বড় প্রাঙ্গণের (৩৪০ ফুট × ১০০ ফুট) মধ্যে অবস্থিত এই মন্দিরের মণ্ডপটির আয়তন ১৭৫ ফুট x ৭৫ ফুট। একটি গলিপথ বিরাট বিমান ও মণ্ডপের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করছে। অপেক্ষাকৃত নিচু মণ্ডপের সমতল ছাদ ১৫০টিরও বেশি সারিবদ্ধ স্তম্ভের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে। সরসীকুমার সরস্বতীর মতে, এই মণ্ডপের মধ্যে পরবর্তীকালের সহস্রস্তম্ভ দ্রাবিড় মণ্ডপের পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

রাজেন্দ্র চোলের পর সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি কমে আসার ফলে চোল শিল্প-স্থাপত্য ও তার পূর্বকার জৌলুস হারিয়ে ফেলে। পরবর্তী মন্দিরগুলো ছিল নিতান্তই সাধারণ। সংখ্যায় ও জাঁকজমকে গোপুরমগুলোই মূল মন্দিরকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। উদাহরণ হিসেবে কুম্ভকোনমের গোপুরমটির উল্লেখ এখানে করা যায়।

১গ.৬ চোলদের শাসনব্যবস্থা

চোলদের শাসনব্যবস্থার জন্য প্রধানত লেখর উপর নির্ভর করতে হয়। অবশ্য এই লেখগুলির ব্যাখ্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা সর্বদা একমত নন। দাক্ষিণাত্যের চালুক্য রাষ্ট্রকূট রাষ্ট্রবিন্যাসের সঙ্গে চোলদের রাষ্ট্রবিন্যাসের মৌলিক পার্থক্য ছিল। সামন্ত নরপতিরা চালুক্য-রাষ্ট্রকূট রাজাদের উচ্চাশাকে খর্ব করতেন। একমাত্র চোলরাই দীর্ঘকাল সামন্ত নরপতিদের প্রভাব কমিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। চোলদের রাষ্ট্রবিন্যাসে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে ব্যাপকভাবে কৃষকদের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয়েছিল।

সঙ্গম যুগের মতো চোল আমলেও রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। রাজার অভিধা ছিল 'চক্রবর্তীগল'। অসংখ্য প্রাসাদ এবং কর্মচারী ও বিভিন্ন জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব অনুষ্ঠান সমৃদ্ধ এই রাজতন্ত্রকে অনেকে বাইজানটাইন রাজতন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। চোল রাজতন্ত্র ছিল খুবই কার্যকর। বিভিন্ন বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা রাজার কাছে যে প্রতিবেদন পেশ করতেন, তিনি সে সম্পর্কে মৌখিক আদেশ দিতেন। রাজকীয় আদেশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় অথবা স্থানীয় শাসনকর্তাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হত। প্রতিবেদন পেশের স্থান ও কাল, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নাম, ইত্যাদি সম্বলিত রাজাদেশ, সাধারণ মন্দির প্রাচীরে টাঙানো হত। আইন-প্রণয়ন নয়, সামাজিক বিধান রক্ষা ও বলবৎ করাই ছিল রাজার কাজ।

রাজকীয় কর্মচারীদের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদ এবং তাঁদের বিভিন্ন অভিধা ছিল। এই অভিধাগুলি সমাজের সাধারণ মানুষ থেকে তাঁদের এবং তাঁদের নিজেদের মধ্যে, পার্থক্য সূচিত করত। সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। উভয় বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের "আদিগারিগল" বলা হত। উচ্চপদস্থ কর্মচাতীদের সাধারণত "পেরুন্দরম" এবং নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের "সিরুদনম" বলা হত। উভয় শ্রেণীর মধ্যবর্তী কর্মচারীদের বলা হত "সিরুদনত্তুপ-পেরুন্দরম"। সেনাপতিগণও এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন পদ বংশানুক্রমিক হওয়ার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল।

শাসনব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তরে ছিল স্ব-শাসিত গ্রাম। কতকগুলি গ্রামের সমষ্টিকে বলা হত কুররম অথবা নাড়ু অথবা কোট্টম। বড় গ্রাম, যা একাই হয়তো একটি কুররম বিবেচিত হত, তাকে বলা হত তনিয়ুর। মধ্যযুগের ইংল্যান্ডের 'বরো'র সঙ্গে এগুলি তুলনীয়। কয়েকটি কুররম নিয়ে একটি বলনাড়ু গঠিত হত। বলনাড়ুর উপরে ছিল 'মণ্ডলুম' বা প্রদেশ। এগুলিই ছিল রাষ্ট্রবিন্যাসের বৃহত্তম বিভাগ। রাজরাজ চোলের রাজত্বকালের শেষে সিংহলসহ এই মণ্ডলমের সংখ্যা ছিল আট কি নয়। চোল রাজত্বে এই সংখ্যা আর বাড়ে নি।

চোল আমলে ভূমিকরই ছিল রাষ্ট্রীয় রাজস্বের প্রধান উৎস। এই কর নগদ অর্থে অথবা দ্রব্যের মাধ্যমে আদায় করা হত। আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, নগরের প্রবেশদ্বারে দেয় শুল্ক এবং খনি অরণ্য থেকে রাজস্ব আসত।

গ্রাম থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য ভূমিকরের জন্য গ্রামসভাগুলি দায়ী থাকত। যুদ্ধ এবং মন্দিরের প্রয়োজন

ছাড়াও বন্যা প্রতিরোধের জন্য বাঁধের সংস্কারকার্যের জন্য অতিরিক্ত করা ধার্য করা হত। সবসময়েই অতিরিক্ত কর ধার্য করার আগে করদাতাদের সম্মতি নেওয়া হত।

বিচারের কাজ সাধারণত স্থানীয়ভাবে করা হত। গ্রামসভাগুলির বিচার সম্পর্কিত ব্যাপক ক্ষমতা ছিল। রাজকীয় আদালতগুলিকে সম্ভবত 'ধর্মাসন' বলা হত। ধর্মাসনগুলিতে যেসব মামলা বিচারের জন্য আানা হত; সেগুলি নিষ্পত্তির জন্য আইনজ্ঞ ব্রাহ্মণদের (ধর্মাসনভট্ট) সাহায্যে নেওয়া হত। দেওয়ানী ও ফৌজদারী অপরাধের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হত না।

গ্রামসমিতি ছিল দুটি, উর এবং সভা। তাছাড়া শুধু ব্যবসায়ীদের জন্য সমিতি ছিল। তাকে বলা হত নগরম। এই সবগুলিই ছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রাথমিক সমিতি। এরা মোটামুটিভাবে সাধারণ বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করত। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা মাঝে মাঝে তাদের হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা করতেন। এছাড়া তারা নিজেদের কাজ নিজেরাই করত। এই সমিতিগুলি যখন তাদের সংবিধান পরিবর্তন অথবা ভূমিস্বত্ব পুনর্নির্ধারণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত, তখন কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা তাদের অধিবেশনে উপস্থিত থাকতেন।

স্থানীয় সমিতিগুলির মধ্যে উর ছিল সবচেয়ে সহজ ও সরল। অনেক সময়ে উর সভার পাশাপাশি থেকে কাজ করত। প্রয়োজন অনুসারে উর এককভাবে, অথবা সভার সঙ্গে যৌথভাবে কার্যনির্বাহ করত। কখনো কখনো উরই ছিল একমাত্র প্রতিষ্ঠান। গ্রামের করদাতাদের নিয়ে উর গঠিত হত।

চোলদের লেখতে সভা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। সর্বত্র এই সভা ব্রাহ্মণ-গ্রাম, অর্থাৎ চতুর্বেদিমঙ্গালমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। রাজারা তাঁদের দানের দ্বারা অনেক মঙ্গালম সৃষ্টি করেছিলেন। ব্রাহ্মণকে ভূমিদান তখন পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হত। এইভাবে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ব্রাহ্মণ-উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল; এবং এই উপনিবেশগুলিতে ব্রাহ্মণরা সভার মাধ্যমে স্থানীয় কৃর্তত্ব লাভ করেছিলেন।

মহাসভার স্থানীয় শাসনযন্ত্র তুলনায় অনেক বেশি জটিল। সাধারণভাবে এই মহাসভা বিভিন্ন কার্যনির্বাহী সমিতির মাধ্যমে কাজ চালাত। এই কার্যনির্বাহী সমিতিগুলির পূর্ব ইতিহাস জানা নেই। তবে বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এই সমিতিগুলি গঠিত হয়েছিল।

আগেই আঞ্চলিক বিভাগ হিসেবে যে নাড়ুর কথা বলা হয়েছে, তারও নিজস্ব সভা ছিল, এবং এই সভাগুলি ভূমিরাজস্ব প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। নাড়ুর সভাকে 'নাত্তার' বলা হত। নাড়ুর অন্তর্গত বিভিন্নগ্রামের প্রতিনিধি নিয়ে নাত্তার গঠিত হত এবং এখানে অন্যান্যদের মধ্যে হিসাবরক্ষকও উপস্থিত থাকতেন। এই নত্তারগুলি বিচারের ক্ষেত্রে অন্যান্য জনপ্রতিষ্ঠান এবং কর্মচারীদের সঙ্গে সহযোগিতা করত। তামিল লেখগুলির 'নগরম' ও নাড়ুর সঙ্গে, সংস্কৃত সাহিত্যের 'পৌর' ও 'জনপদের' অন্তত নামের দিক থেকে বিশেষ মিল দেখা যায়।

চোল আমলের এইসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতার অভাব ছিল না। 'মধ্যস্থ' ও 'করণত্তার' (হিসেবরক্ষক) —গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানের এই দুই গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতেন। এইসব কিছুর লক্ষ্য একটাই—তা হল সাধারণ মানুষের কল্যাণসাধন।

সুতরাং জনমুখী চোল শাসনব্যবস্থায় একদিকে ছিল যোগ্য আমলাতন্ত্র আর অন্যদিকে ছিল সক্রিয় স্থানীয়

প্রতিষ্ঠানগুলো। এই দুই-এর সাহায্যে চোল আমলের শাসনব্যবস্থা যে উচ্চমান লাভ করেছিল, তা হয়তো অন্য কোন হিন্দুরাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

১গ.৭ অনুশীলনী

১। প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী বর্ণনা করুন।

২। প্রথম নরসিংহবর্মনের রাজত্বের সময়কাল কী ছিল ? তাঁর সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক সাফল্যের বর্ণনা দিন।

৩। চোল রাজাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রাজাদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে রচনা লিখুন।

৪। চোল রাজাদের শাসনব্যবস্থা আলোচনা করুন।

১গ.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। আর. সি. মজুমদার (সম্পা.)ঃ *এজ অফ্ ইম্পিরিয়াল কনৌজ (১৯৬১)*

২। আর. সি. মজুমদার (সম্পা.)ঃ *স্ট্রাগল ফর এম্পায়ার (১৯৬৩)*

৩। কে. এ. নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী ঃ *হিস্ট্রী অফ্ সাউথ ইন্ডিয়া*

৪। সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস,* ২য় খণ্ড।

একক ২ ❐ প্রাচীন ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা

২.১ কৃষি ও জলসেচ ব্যবস্থা

২.১.১ অর্থকরী ফসলের চাষ

২.১.২ কর্ষণযোগ্য ভূমি

২.১.৩ চাষের পদ্ধতি

২.১.৪ জলসেচ ব্যবস্থা

২.২ ভূমির মালিকানা

২.৩ মধ্যস্বত্বভোগী ভূম্যধিকারী শ্রেণী ও কৃষককুল

২.৪ সামন্ত প্রথার ধারণা ও সংশ্লিষ্ট বিতর্ক

২.৫ অনুশীলনী

২.৬ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা

চতুর্থ পর্যায়ের এই এককটিতে প্রাচীন ভারতের অর্থনীতির বিশদ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে কৃষি ও কৃষিবহির্ভূত উভয়বিধ জীবনযাত্রা ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যাবে। এছাড়া ঐ সময়ের সমাজচিত্রটিও জানা যাবে; বিশেষ করে পারিবারিক সংগঠন ও নারীর স্থান বিষয়ে একটি আলোচনা রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে জাতি ও বর্ণ ব্যবস্থার তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ। এছাড়া, ঐ যুগের অর্থনীতির সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে সংযোগ ঘটেছিল তারও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে বিশদভাবে। পরিশেষে, সমাজ ও অর্থনীতির আলোয় তৎকালীন ধর্মবিশ্বাসের একটি আনুপূর্বিক চিন্তন এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

২.১ কৃষি ও জলসেচ ব্যবস্থা

কৃষি ও প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব : ভারতবর্ষে কৃষিকার্য প্রবর্তনের সঠিক সময়কে সূচিত করা সহজ নয়। উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ জেলার কোল্‌দিহাওয়া থেকে প্রাপ্ত শিলীভূত ধান্যের তুষের কার্বন[১৪] পরীক্ষার ফলে ওই অঞ্চলে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম থেকে পঞ্চম সহস্রাব্দের মধ্যে কৃষির অস্তিত্বের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া

যায়। অবিভক্ত ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের মুণ্ডিগক এবং বোলান গিরিবর্ত্মের নিকটবর্তী কোয়েটা থেকে ১৫০ কি.মি. দূরে অবস্থিত মেহেরগড়ে আবিষ্কৃত শস্যাগার ও বসতির অবশেষসমূহ এই অঞ্চলে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম-চতুর্থ সহস্রাব্দে কৃষিভিত্তিক নবাশ্মীয় সংস্কৃতির পরিচয় দেয়। গম ও যব ছাড়াও মেহেরগড়ে তুলা চাষের প্রাচীনতম নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। মেহেরগড়ের ধারাবাহিকতা পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দের বেলুচিস্তান ও সিন্ধুপ্রদেশের প্রাক্-হরপ্পীয়, নবাশ্মীয়, তাম্রাশ্মীয় গ্রাম্য বসতিসমূহে এবং হরপ্পা সভ্যতায়। এই প্রাক্-হরপ্পীয় কৃষিভিত্তিক কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বসতি হল বেলুচিস্তানের উত্তরের কোয়েটা অঞ্চলের কিলি-গুল-মুহম্মদ ও ডাম্ব সাদৎ, লোরালাই উপত্যকায় রাণাখুণ্ডাই, ঝোব উপত্যকায় পেরিয়ানো ঘুণ্ডাই, মধ্য অঞ্চলের আঞ্জীরা, দক্ষিণের কুল্লী-মেহী ও নাল-নান্দারা, গোমাল উপত্যকায় গুমলা ও হাথালা এবং সিন্ধুপ্রদেশের অম্রী ও কোটডিজি।

হরপ্পা সভ্যতার সময়কাল ২৫০০ থেকে ১৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ এবং এই সভ্যতার নানা কেন্দ্র সিন্ধু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, পশ্চিম-উত্তরপ্রদেশ, উত্তর-রাজস্থান ও গুজরাতে আবিষ্কৃত হয়েছে। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরোর নগর পরিকল্পনা থেকে প্রতিভাত হয় যে, এই রকম নাগরিক সভ্যতা উন্নততর খাদ্য উৎপাদন, ব্যাপক বাণিজ্য এবং বিস্তৃত যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যতিরেকে সম্ভবপর নয়। হরপ্পার কেন্দ্রস্থলে ১৬৯ × ১৩৫ ফুট একটি বৃহৎ শস্যাগারের অবশেষে পাওয়া গেছে—এটি দুটি বিভাগে বিভক্ত, মধ্যে ২৩ ফুট ব্যবধান। দুটি বিভাগই কয়েক ভাগে বিভক্ত হলঘর ও বারান্দা বর্তমান। উৎপাদিত শস্যের মধ্যে গম, যব, নানা ধরনের কলাই ও তৈলবীজ, তৎসহ খেজুর প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া শন, তিনিস ও তুলার চাষের নিদর্শনও বর্তমান। রংপুর ও লোথালে ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ ধান-চালের ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেছে। রাজস্থানের কালিবঙ্গান থেকে লাঙল ব্যবহারের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া গেছে। কালিবঙ্গানের উৎখনন থেকে হরপ্পা আমলের একটি কৃষিক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে যাতে লাঙলের ফলার দাগ আছে। গরু, মহিষ, ভেড়া, শূকর ও উটের কঙ্কাল হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত সিলসমূহে অঙ্কিত বৃষমূর্তি গো-জাতীয় জীবের ব্যাপক অস্তিত্বের পরিচায়ক। এই সকল নিদর্শন থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে হরপ্পীয় নগরসমূহের সঙ্গে অসংখ্য গ্রামের যোগাযোগ ছিল যেগুলিতে কৃষিকাজ ও পশুপালন করা হত। গ্রামগুলির পিছনে কিছু বনাঞ্চলও ছিল। বস্তুত, অত্যন্ত সুবিস্তৃত কৃষিকাজ ও পশুপালন করা হত গ্রামগুলির পিছনে কিছু বনাঞ্চলও ছিল। বস্তত, অত্যন্ত সুবিস্তৃত কৃষিকাজের পটভূমিকা ব্যতিরেকে ভারতের প্রথম নগরায়ণের পরিচায়ক হরপ্পা সভ্যতার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। খাদ্য উৎপাদনের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থেকে বহুসংখ্যক মানুষ মুক্তি না পেলে নগর জীবন ও নাগরিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তোলা সম্ভবপর নয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্দের মতে, প্রস্তর যুগের দ্বিতীয় বিকাশের অধ্যায়টি নিওলিথিক বা নবাশ্মীয় হিসেবে পরিচিত। নবাশ্মীয় আয়ুধসমুহের অধিকাংশই ভূমিতে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নির্মিত। ব্যাপকতর অর্থে নবাশ্মীয় শব্দটি একটি সংস্কৃতিগত বা অর্থনৈতিক পর্যায়কে সূচিত করে যার বৈশিষ্ট্য খাদ্য সংগ্রহ থেকে খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থায় উত্তরণ, যখন মানুষ শুধু তার অস্ত্রকেই ধার দিতে শেখেনি, কৃষিকাজে হাত লাগিয়েছে; এছাড়াও পশুপালন, মৃৎশিল্প, বয়নশিল্প ও স্থায়ী আবাসে অভ্যস্ত হয়েছে। এই কারণেই গর্ডন চাইলড্ 'নবাশ্মীয় বিপ্লব' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে নবাশ্মীয় অধ্যায়টির অবস্থা বড়ই এলোমেলো এবং

তা কালসীমার নিরিখে বড়ই অর্বাচীন। অবিমিশ্র-নবাশ্মীয় সংস্কৃতির সংখ্যা এখানে বেশি নয়; যেগুলি কাশ্মীর, বেলুচিস্তান, বিহার, আসাম, মেঘালয় প্রভৃতি অঞ্চলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং এই সকল সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রস্তর ও অস্থি নির্মিত ভূমিতে ব্যবহারের উপযোগী হাতিয়ারের উপস্থিতি। অপরাপর অঞ্চলে নবাশ্মীয় ও তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতিসমূহের এত ব্যাপক সংমিশ্রণ ঘটেছে যে উভয়েরই আদ্যন্ত খুঁজে পাওয়া কঠিন। দক্ষিণের নবাশ্মীয় কৃষিভিত্তিক বসতিসমূহের মধ্যে কৃষ্ণা ও কাবেরী উপত্যকার প্রত্নক্ষেত্রগুলির ভূমিতে ব্যবহারের উপযোগী পালিশ করা পাথরের কুঠারের প্রাচুর্য চোখে পড়ে। এইগুলির কালনির্ণয় করা হয়েছে ২০০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে। বস্তুত নবাশ্মীয় এবং তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতগুলির কালসীমার কোন একক ধারাবাহিকতা ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু ১৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পর থেকেই এই সকল নবাশ্মীয় সংস্কৃতি তাম্রাশ্মীয় পর্যায়ে উপনীত হয়। গুজরাট হরপ্পা-উত্তর তাম্রাশ্মীয় বসতিসমূহের (১৮০০-১১০০ খ্রিঃপূঃ) উৎখনিত বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত কৃষির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার ও উপকরণসমূহ ওই অঞ্চলে কৃষির বিস্তৃতির পরিচয় দেয়। একথা দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থানের বানাস উপত্যকায় আহাড় সংস্কৃতির (২০০০-১০০০ খ্রিঃ পূঃ) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। চম্বল, নর্মদা ও মধ্যপ্রদেশের অপরাপর নদী বিধৌত এলাকাসমূহে বিকশিত তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতিসমূহে কৃষিকর ব্যাপক বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। নভডাটোলি এবং কায়থা থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যশস্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে। সেগুলির মধ্যে ধান, গম, যব, ডাল, তৈলবীজ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উত্তর গোদাবরী-প্রবরা অববাহিকায় এবং তাপ্তী উপত্যকায় গড়ে ওঠা তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতিসমূহ নানা ধরনের কৃষির নিদর্শনে পরিপূর্ণ, তবে কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয় লোহার লাঙল ব্যবহৃত হওয়ার পর থেকে। ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময় থেকে ভারতে লোহার প্রচলন শুরু হয়, যদিও এই বিরাট দেশে সর্বত্রই তা একই সময়ে হয়নি। উত্তর ভারতের লৌহব্যবহারকারীদের সংস্কৃতির সঙ্গে একটি বিশেষ মৃৎশিল্পের ধারা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যার নামকরণ করা হয়েছে চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতি (১১০০-৪৫০ খ্রিঃপূঃ) যা পাঞ্জাব থেকে একদিকে রাজস্থান ও অপরদিকে গঙ্গা-যমুনা-দোয়াব অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গাঙ্গেয় পূর্বোত্তরাংশে লৌহযুগের বসতিগুলির সঙ্গে আর একটি নতুন ধরনের মৃৎশিল্পের সংযোগ ঘটেছিল যার নামকরণ করা হয়েছে কৃষ্ণমসৃণ মৃৎপাত্র সংস্কৃতি, যার বিকাশকাল ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পর থেকে। যে কৃষিনির্ভরতা আধুনিক ভারতবর্ষেরও প্রধান অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য, তার সূত্রপাত ভারতের উর্বরতম সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমিতে যেখানে উপযুক্ত সংস্কৃতিদ্বয় গড়ে উঠেছিল।

বৈদিক সাহিত্যে প্রতিফলিত কৃষিব্যবস্থা : ভারতের ইতিহাসে বৈদিক যুগের কালসীমা আনুমানিক ১৫০০ থেকে ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। *ঋগ্বেদ*-এ পশুপালনমূলক অর্থনীতিকে কৃষিকার্যের তুলনীয় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দেখানো হলেও কৃষি মোটেই গুরুত্বহীন ছিল না। গাভী সম্পর্কে *ঋগ্বেদ*-এর কবিদের অতি উৎসাহের একমাত্র কারণ হল মুদ্রাব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার পূর্বে পশু বিশেষ করে গাভী ছিল বিনিময়ের প্রধান মাধ্যম এবং রক্ষাযোগ্য সম্পদ, স্বাভাবিক নিয়মেই যার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। তদুপরি যুদ্ধ ও লুণ্ঠনের দ্বারা গো-সম্পদের বৃদ্ধি ঘটানো যায়। কৃষি ও পশুপালন কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী বিষয় নয়; একে অপরের পরিপূরক। বস্তুত, ভূমিকুঠার বা খুরপির দ্বারা কর্ষিত ভূমিতে বৃহৎ পরিসরে কৃষিজ উৎপাদন ঘটানো যায় না, যা কেবল পশুবাহিত লাঙলের দ্বারাই

সম্ভব। *ঋগ্বেদ*-এর প্রথম ও দশম মণ্ডলে কৃষিকাজের পর্যাপ্ত উল্লেখ আছে; তবে মণ্ডলদুটি অপরগুলির তুলনায় কিছুটা অর্বাচীন। চতুর্থ মণ্ডলের একটি সমগ্র সূক্ত (৪/৫৭) কৃষি বিষয়ক। পরবর্তী সংহিতাসমূহে ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যে যে কৃষিমূলক সীতাযজ্ঞের কথা উল্লিখিত হয়েছে এখানে তার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। *অথর্ববেদ*-এ পৃথি বৈণ্যকে কৃষিবিদ্যার উদ্‌গাতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অথর্ববেদ-এ ও কাঠক *সংহিতা*-র সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, চাষযোগ্য জমিকে বলা হত 'উর্বরা' বা 'ক্ষেত্র', 'সকন' এবং 'খরিষ' ছিল 'সার'। ছয় আট এমনকী বারো জোড়া বদল দিয়েও 'সীর' বা লাঙল টানা হত। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ লাঙ্গল দেওয়া (কৃষন্ত), বীজ বপন করা (বপন্ত), ফসল তোলা (লুনন্ত) এবং ঝাড়াই-বাছাই করার (বির্ণন্ত) বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। *ঋগ্বেদ*-এ কুল্যা (৩/৪৫/৩) শব্দটির দ্বারা কৃত্রিম জলপ্রণালীকে বুঝিয়েছে। 'খনিত্রি মা আপুঃ' (৭/৪৯/২) বা 'খনন করে যে জল পাওয়া যায়' বাক্যাংশটি সেচব্যবস্থাকে ইঙ্গিত করে। *বাজসনেয়ী সংহিতা*-এ উৎপাদিত কৃষিপণ্যের একটি তালিকা দেওয়া আছে। পোকামাকড় ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে ফসল রক্ষার মন্ত্র *অথর্ববেদ*-এ দেওয়া আছে। ফসল কাটার জন্য ব্যবহৃত কাস্তেকে বলা হত 'দাত্র' বা 'সৃণি', আটি বাঁধাকে বলা হত 'পর্ষ', ঝাড়াই-মাড়াই-এর কাজ হত 'খল', 'তিতৌ এবং 'শূর্পের' সাহায্যে। যারা এই কাজ করত তাদের বলা হত 'ধান্যকৃত' এবং যে পাত্রের সাহায্যে ফসল মাপা হত তার নাম ছিল 'উর্দয়'। *তৈত্তিরীয় সংহিতা*-এ বলা হয়েছে যে বছরে দুবার ফসল তোলা হত।

বৈদিক যুগে পশুপালনের সঙ্গে কৃষির সংযুক্তি, কৃষিক্ষেত্রে পশুবাহিত লাঙলের ব্যবহার উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রচুর উদ্বৃত্তের সৃষ্টি করে। এই উদ্বৃত্তের অধিকারের দ্বন্দ্ব থেকেই সামাজিক শ্রেণীভেদ তীব্র হয়, রাষ্ট্রব্যবস্থার আবির্ভাব পুরাতন উপজাতীয় জীবনচর্যার অবসান ঘোষণা করে, সম্পদ হিসেবে যুদ্ধে জিতে পশু ছাড়াও নানা ধরনের কৃষিজ উৎপাদনের গুরুত্ব বেড়ে যায়, রাজকীয় রাজস্বের ক্ষেত্রেও ফসলের ভাগ প্রধান হয়ে ওঠে। রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, কৃষির উন্নতি ঘটানো রাজকার্যের অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কৃষির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বেড়ে গেলেও উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা কিন্তু কৃষিকে কিছুটা অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। সে ঐতিহ্য আজও বজায় আছে। *পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ*-এ (১৭/১) কৃষিকে নিম্নশ্রেণীর মানুষের বৃত্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে। যদিও *ঋগ্বেদ*-এর অশ্বদ্বয়কে কৃষিকর্মে নিযুক্ত হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং জুয়াড়িকে দ্যূতক্রীড়া ত্যাগ করে কৃষিকাজে নিযুক্ত হতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তথাপি বৈদিক সাহিত্যে কৃষিকর প্রতি খুব সম্ভ্রমসূচক মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায় না।

উৎপাদিত ফসলসমূহ : *ঋগ্বেদ*-এর যে কোনও খাদ্যশস্যকেই 'ধান্য' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এছাড়া যব, জই (তোক্‌মন), ধান (ব্রীহি) প্রভৃতির উল্লেখ আছে। *বাজসনেয়ী সংহিতা*-র (২৮/১২) উৎপাদিত কৃষিপণ্যের একটি প্রদত্ত তালিকায় ধান (ব্রীহি), যব (উপবাক), কলাই (মদন্ত, মাষ), তিল, অনু, খল্ব, গোধূম (গম), নীবার, প্রিয়ঙ্গু, মসুর, শ্যামাক, উর্বারু প্রভৃতির উল্লেখ আছে। পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ী* ও প্রাচীনতর বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থে ধান্য, ব্রীহি, শালি প্রভৃতি নানা ধরনের ধানের চাষ বপন ও রোপণ উভয় প্রক্রিয়া এবং তৎসহ গোধূম (গম), যব ও ইক্ষুর ব্যাপক চাষের কথা বলা হয়েছে। মৌর্য ও মৌর্যোত্তর যুগের কৃষিব্যবস্থার পরিচয় মেগাস্থিনিসের রচনায়, কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*-এ ও বরাহমিহিরের *বৃহৎ সংহিতা*-এ পাওয়া যায়। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*-এ শালি, ব্রীহি, কোদ্রব, তিল, প্রিয়ঙ্গু, দরক, মুদ্‌গ, মাষ, শৈম্ন্য, কুসুম্ভ, মসুর, কুলখ,

যব, গোধূম, কলায়, অতসী, সর্ষপ ও তৎসহ ভল্লিফল (লাউ, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি), মৃদ্বিকা (দ্রাক্ষাফল) প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এছাড়া ওষধি, গন্ধদ্রব্য প্রস্তুতোপযোগী কয়েকটি বিশেষ ধরনের গাছ ও লতা এবং তৎসহ খাদ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য নানা ধরনের মূলের ব্যাপক উৎপাদনের কথা আছে। বরাহমিহিরের *বৃহৎ সংহিতা*-এ ও *অমরকোষ* নামক বিখ্যাত অভিধানে নানাপ্রকার ধান, গম, যব, কলাই ও মসুর, তিল, তিসি ও সর্ষপ প্রভৃতি তৈলবীজ, আদা এবং অপরাপর নানা ধরনের সবজি, ইক্ষু, মরিচ ও অপরাপর মশলার উল্লেখ আছে। *বৃহৎসংহিতা*-এ ৫৫তম অধ্যায়টি *বৃক্ষায়ুর্বেদ* নামে পরিচিত যেখানে রোগগ্রস্ত ও অপুষ্ট অথবা পোকামাকড়ের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া চারাগাছসমূহের চিকিৎসার বিধান দেওয়া আছে।

২.১.১ অর্থকরী ফসলের চাষ

অর্থকরী ফসলের চাষও— যেমন মরিচ, নারিকেল, তৈলবীজ, সুপারী (গুবাক) প্রভৃতি ব্যাপক পরিমাণে চাষ করা হত। সিন্ধু ও কাশ্মীর অঞ্চলে জাফরানের উৎপাদনের কথা *রঘুবংশ* ও *অমরকোষ*-এ বলা হয়েছে। রঘুবংশ থেকে আরও জানা যায় যে, মরিচ, এলাচ ও চন্দন মলয় পর্বতাঞ্চলে অর্থাৎ পূর্বঘাট অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ বলেন যে, উদ্যান, দারেল ও কাশ্মীরের জাফরান বিখ্যাত; কাশ্মীর ও কুলুতে বিশেষভাবে ভেষজ উৎপাদিত হয়; ওড্রদেশের ফল বিখ্যাত; মলয় পর্বতে চন্দন, কর্পূর ও অপরাপর সুগন্ধী বৃক্ষ জন্মায়; এগুলি পাণ্ড্যদেশ বা মালাবার অঞ্চলেও পাওয়া যায়। ফলের মধ্যে হিউয়েন সাঙ আম, তরমুজ, নারিকেল, কাঁঠাল, কলা, তেঁতুল, বেল, ডালিম ও কমলালেবুর কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্য ই-ৎ-সিং কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে। শূরপালের *বৃক্ষায়ুর্বেদ* গ্রন্থে যব, গম, চাল, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরি (বাজরা), তিসি, সর্ষপ, তিল, তুলা ও বিভিন্ন ধরনের ডাল উৎপাদনের কথা বলা আছে। গুপ্তোত্তর যুগে রচিত *কৃষিপরাশর* গ্রন্থে কৃষিজ উৎপাদন-বিষয়ক বহু তথ্য দেওয়া আছে।

গ্রীক বিবরণীতে, বিশেষ করে স্ত্রাবো ও ডায়োডোরাসের রচনায় এদেশে দুবার বর্ষার কথা এবং ধান, গম ও যবের প্রভূত ফলনের উল্লেখ আছে। প্লিনি আখের উৎপাদনও ভারতীয় ফসলের তালিকায় রেখেছেন এবং এদেশে কার্পাস ফলনে বিস্ময় প্রকাশ করেন। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের শেষভাগে উৎকীর্ণ নহপানের নাসিক লেখে ব্যাপকভাবে নারিকেল বৃক্ষ রোপণের কথা আছে। প্লিনি এদেশে মশলার চাষের কথাও বলেছেন, বিশেষ করে গোলমরিচ, এলাচ ও দারুচিনির। দাক্ষিণাত্য ও সুদূর দক্ষিণে এই সকল মশলার ব্যাপক উৎপাদনের কথা *পেরিপ্লাস* গ্রন্থে লেখক বলেছেন। তামিল সঙ্গাম সাহিত্যেও মশলার প্রভূত উল্লেখ আছে।

২.১.২ কর্ষণযোগ্য ভূমি

বৈদিক সাহিত্যে কর্ষণযোগ্য ভূমিকে 'উর্বরা' ও 'ক্ষেত্র' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। হলকর্ষণে সৃষ্ট খাতের নাম 'সীতা'। পাণিনি তাঁর বিখ্যাত *অষ্টাধ্যায়ী*-তে তিন প্রকার ভূমির কথা বলেছেন : যে ভূমিতে চাষ হয় (কর্ষ), পশুচারণের জন্য নির্দিষ্ট ভূমি (গোচর) এবং পতিত ভূমি (উষর)। উৎপন্ন শস্যের গুণমান ও পরিমাণের ভিত্তিতে তিনি আবার কর্ষণযোগ্য ভূমির শ্রেণীবিভাগ করেছেন। কৌটিল্য পাঁচ প্রকারের ভূমির কথা বলেছেন : কৃষ্ট অর্থাৎ চাষযোগ্য, অকৃষ্ট অর্থাৎ যে জমিতে চাষ হয় না, স্থল অর্থাৎ উচ্চ ও শুষ্ক ভূমি, কেদার অর্থাৎ যে জমিতে খাদ্যযোগ্য মূল অর্থাৎ মানকচু, ওল, মূলা, রাঙালু, আদা ও নানাবিধ কন্দজাতীয় সামগ্রী উৎপন্ন হয়। পতঞ্জলী তাঁর *মহাভাষ্য* নামক গ্রন্থে কৃষিযোগ্য (ক্ষেত্র) ও চারণ (গোচর) এই দুপ্রকার ভূমির উল্লেখ করেছেন। লাঙলের

সাহায্যে যে ভূমি চাষ করা হয় তার নাম হল্য বা সীত্য। চরক ও সুশ্রুত তিন ধরনের ভূমির কথা বলেছেন : জাঙ্গাল অর্থাৎ যে জমি বন্ধ্যা, যেখানে দু-একটি ঝোপঝাড় ছাড়া আর কিছু জন্মায় না; অনুপ অর্থাৎ জলাভূমি, যেখানে ওই ভূমির উপযোগী বৃক্ষাদি জন্মালেও চাষ সম্ভব নয়; এবং সাধারণ, যেখানে হলকর্ষণ করা যায়। সুশ্রুতের ভেষজ প্রস্তুতের উপযোগী গাছপালা চাষের জন্য বালুকা, পটাশ ও লবণবিহীন উজ্জ্বল, ঈষৎ কঠিন কৃষ্ণবর্ণ, হরিদ্রাবর্ণ বা রক্তবর্ণ ভূমি বাঞ্ছনীয়।

২.১.৩ চাষের পদ্ধতি

বৈদিক সাহিত্যে পশুবাহিত লাঙল, সার ও সেচের উপযোগিতা স্পষ্ট করেই বারবার ঘোষণা করা হয়েছে। *অথর্ববেদ*-এ কীটপতঙ্গ, পশুপাখী, অতিবৃষ্টি থেকে ফসল রক্ষার সমস্যা আলোচিত হয়েছে। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ (১/৬/১/৩) কৃষিকার্যের চারটি পর্যায় বর্ণিত হয়েছে, যথা লাঙল দ্বারা ভূমি কর্ষণ, বীজ বপন, ফসল, সংগ্রহ এবং তা ঝাড়াই-মাড়াই করা। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*-এ (২/২৪) বর্ষার পর তিনবার ভূমিকর্ষণের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া *অর্থশাস্ত্র*-এ বীজ শোধনের কথা বলা হয়েছে। *বৌদ্ধ মিলিন্দ পঞ্হো* নামক গ্রন্থে জমি থেকে আগাছা, কাঁটা, পাথর, ইত্যাদি উৎপাটন, লাঙল চালনা, বীজবপন, সেচন, কৃষিক্ষেত্রের চারপাশ বেড়া দেওয়া, নজরদারী বজায় রাখা, ফসল কাটা ও ঝাড়াই বাছাই করার কথা বলা হয়েছে। বীজকে নানা পদ্ধতিতে পরিষ্কৃত ও আবহাওয়ার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য নানাবিধ উপায় *বৃহৎসংহিতা, অগ্নিপুরাণ* ও *কৃষিপরাশর*-এ বর্ণিত হয়েছে। *অমরকোষ*-এ কৃষিতে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতির পরিচয় দেওয়া আছে, যথা লাঙল বা হল, যোত (লাঙলের সংযোজক), প্রাজন বা তোড়ন (অঙ্কুশ), কোতিষ (জমিতে দেওয়ার মই), খনিত্র (কোদাল বা খুরপি), দত্র বা লবিত্র (কাস্তে) প্রভৃতি। *কৃষিপরাশর*-এ যেসকল যন্ত্রপাতির কথা বলা হয়েছে সেগুলির মধ্যে সৃণি (কাস্তে), খনিত্র, মুষল, উর্প (শস্য ঝাড়া ও পরিষ্কার করার প্রয়োজনে ব্যবহৃত ঝুড়ি বা কুলা), ধান্যকৃত (শস্য ঝাড়ার কাজে ব্যবহৃত পাখা), চালনী এবং মেথি (শস্য আছড়াবার বা মোড়াই-এর দণ্ড) উল্লেখযোগ্য।

কৃষিক্ষেত্রে সার প্রয়োগের বিষয়টি এমনকী ঋগ্বেদের যুগেও অজানা ছিল না। সকল ও করীষ এই দুটি শব্দ ছিল সারের বৈদিক নাম। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*-এ গেময় ও অস্থিচূর্ণকে সার হিসেবে ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। *বৃহৎসংহিতা*-এ মাছ ও মাংস থেকে প্রস্তুত জৈব সারের কথা আছে। *অগ্নিপুরাণ* ও *কৃষিপরাশর*-এ সার তৈরি ও তা ব্যবহারের নিয়মাবলী প্রদত্ত হয়েছে। শস্যক্ষেত্রের চারাগাছগুলি যাতে রোগগ্রস্ত না হয় সেদিকে নজর রাখা হত। অপুষ্ট বা রোগ্রসস্ত চারাগাছের চিকিৎসার নানা ব্যবস্থাপত্র শূরপাল রচিত *বৃক্ষায়ুর্বেদ* এবং চক্রপাণি মিশ্রের *বিশ্ববল্লভ* নামক গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। কৃষিকাজের ক্ষেত্রে পশুসম্পদ ও পশুশক্তির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কৌটিল্য রাষ্ট্রীয় পশুদপ্তর ও সেই দপ্তরের অধ্যক্ষ নিয়োগের কথা বলেছেন। পতঞ্জলির *মহাভাষ্য*-এ পশুপালন সম্পর্কিত নির্দেশাবলী বর্তমান। *অগ্নিপুরাণ* ও *বিষ্ণুধর্মোত্তর*-এ পশুদের রোগ ও চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনা আছে। *কৃষিপরাশর* গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, গবাদি পশুর জন্য পরিচ্ছন্ন গোশালা ও নির্মল পানীয় জলের প্রয়োজন। সেখানে একথাও বলা হয়েছে যে, প্রতিটি গ্রামেই কৃষিক্ষেত্রের পাশাপাশি পশুদের চারণভূমি থাকা দরকার।

২.১.৪ জলসেচ ব্যবস্থা

ভারতবর্ষে কৃষিব্যবস্থা মূলত বর্ষা নির্ভর। কিন্তু এক্ষেত্রে অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির সমস্যা আছে। কাজেই

প্রকৃতি নির্ভরতা ছাড়াও কৃত্রিম উপায়ে জলসেচ প্রথা সুপ্রাচীন কাল থেকেই বর্তমান ছিল। বৃষ্টির জল বা বন্যার জলকে ধরে রাখার জন্য জলাধার নির্মাণের রীতি বহু প্রচলিত ছিল। *ঋগ্বেদ*-এ (১০/১০১/৬-৭) কূপ থেকে জল তুলে চোঙার সাহায্যে ও নালার ভিতর দিয়ে তা কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করানো, এবং এই কাজের জন্য কপিকলের মতো যন্ত্রের (১০/৯২/১৩) উল্লেখও আছে। পতঞ্জলির *মহাভাষ্য*-এ (১/১/২৩) নদী থেকে খাল খনন করে জল নিয়ে এসে চাষ করার কথা বলা আছে। *নারদস্মৃতিতে* দুই ধরনের খালের কথা বলা হয়েছে—খেয়, অর্থাৎ যা প্রবহমান এবং বন্ধ্য, অর্থাৎ যা একটি বিশেষ এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। *কাশ্যপীয় কৃষিশুক্তির* মতো পরবর্তীকালে রচিত কৃষিবিষয়ক গ্রন্থে খাল খনন, জলাধার নির্মাণ ও বাঁধ দেওয়ার বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

কূপ ও পুষ্করিণী খননের বহু উদাহরণ প্রাচীন লেখসমূহে পাওয়া যায়। উত্তর-পশ্চিমে গ্রীক, শক এবং কুষাণ আমলে অনেক জলাশয় খনন করা হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে এই প্রসঙ্গে অনেক তথ্য জানা গেছে। তক্ষশিলার সিরকাপ উৎখননের ফলে একটি মন্দির সংলগ্ন জলাশয় পাওয়া গেছে। কুষাণ আমলে আফগানিস্তান ও পেশোয়ার অঞ্চলে অনেকগুলি খাল বা প্রণালী খনন করা হয়। এলাহাবাদের নিকটবর্তী শৃঙ্গাবেরাপুরে উৎখননের ফলে একটি বৃহৎ জল সংরক্ষণ প্রকল্প আবিষ্কৃত হয়েছে। নাসিক থেকে প্রাপ্ত একটি লেখে উদকযান্ত্রিক বা সেচবিষয়ক প্রযুক্তিবিদের কথা জানা যায়।

জলসেচ ব্যবস্থার উপর যে রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব আরোপ করা হত তার কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণ বর্তমান। এই প্রসঙ্গে সৌরাষ্ট্রের সুদর্শন হ্রদের উপর দেওয়া বাঁধের কথা উল্লেখযোগ্য যা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলে তৈরি হয়েছিল এবং যা থেকে অশোকের আমলে তুষাস্ফ নামক জনৈক প্রযুক্তিবিদ আধিকারিক সেচখাল খনন করেন। ১৫০-১৫১ খ্রিস্টাব্দে একটি ভয়াবহ ঝড়ে ওই বাঁধ বিনষ্ট হলে সেচখালগুলি অকেজো হয়ে পড়ে। তখন শক ক্ষত্রপ রুদ্রদামনের নির্দেশে সৌরাষ্ট্র ও আনর্তের শাসক সুবিশাল ওই বাঁধের সংস্কার করে সেচখালগুলিকে সক্রিয় করে তোলেন। গুপ্তসম্রাট স্কন্দগুপ্তের (৪৫৫-৬৭ খ্রিঃ) আমলে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের ফলে ওই বাঁধ আবার ভেঙে পড়ে এবং সম্রাটের নির্দেশে স্থানীয় পর্ণদত্ত এবং তাঁর পুত্র চক্রপালিত তার সংস্কার করেন। একটি বিশেষ বাঁধের সাড়ে-সাতশো বছরের ইতিহাস সত্যই চমকপ্রদ। কলিঙ্গসম্রাট খারবেলের হাতিগুম্ফা লিপি থেকে জানা যা যে, নন্দরাজাদের আমলে নির্মিত একটি খাল তিনি তাঁর রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে দীর্ঘায়িত করেন, যা করতে তাঁর এক লক্ষ মুদ্রা খরচ হয়েছিল।

সেচের উদ্দেশ্যে বন্যাপ্রবণ নদীসমূহের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কোনও কোনও নরপতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, যেমন করিকাল চোল কাবেরী নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণ করেন অথবা কাশ্মীররাজ অবন্তীবর্মা (৮৩৬-৫৫ খ্রিঃ) যিনি বিতস্তা নদীকে শাসন করে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়ে দেন। এছাড়া, ব্যক্তিগত ও সামাজিক উদ্যোগে কূপ, পুষ্করিণী ও জলাশয় খননের বহু নিদর্শন বর্তমান। মৌর্যোত্তর যুগের অনেক লেখে পুষ্করিণী খননের উল্লেখ আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও লেখ থেকে জ্ঞাত অধিকাংশ জলাশয়ই খ্রিস্টীয় প্রথম দুই শতকের মধ্যে নির্মিত হয়। স্মৃতিশাস্ত্রসমূহে যজ্ঞের ফল লাভ করার জন্য শূদ্রদের পূর্তকর্ম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পূর্তকর্মসমূহের মধ্যে জলাশয় খনন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্মৃতি বা ধর্মশাস্ত্রে সেচের জন্য একটি বিশেষ পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে যা সেতু নামে পরিচিত। মনু বলেন যে, সেতুভঙ্গকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া প্রয়োজন; তবে সে যদি সেচপ্রকল্প মেরামত করে দেয় তবে এক হাজার পণ জরিমানা দিয়ে সে রেহাই পেতে পারে।

এই শাস্তির বিধান তৎকালীন সমাজে সেচব্যবস্থার প্রতি সচেতনতার পরিচায়ক। সরকারি জলসেচ ব্যবস্থার সুযোগ যারা গ্রহণ করে কৌটিল্য তাদের উপর 'উদকভাগ' বা জলকর চাপানোর সুপারিশ করেছেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় লেখসমূহে এই কর আদায়ের কোনও উল্লেখ নেই। তবে প্রাক্-মধ্যযুগীয় গাহড়বাল রাজারা জলকর নামে একপ্রকার সেচকর আদায় করতেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে জলসেচ প্রকল্পের সূচনা ও প্রাথমিক রক্ষণাবেক্ষণ শাসকেরা করলেও কালক্রমে সরকারির চেয়ে বেসরকারি উদ্যোগই প্রবলতর হয়ে ওঠে। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল আদি-মধ্যযুগে তামিল এলাকার কয়েকটি আঞ্চলিক সংগঠন, যাদের সক্রিয় প্রচেষ্টায় পুষ্করিণী ও জলাশয় সযত্নে খনিত হত। এছাড়া সেচের কাজে নদীর প্লাবনের উপর ভরসা করা হত। একথা বিশেষ করে মধ্য-গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলের ক্ষেত্রে সত্য।

২.২ ভূমির মালিকানা

ভূমির মালিকানার প্রশ্ন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম বিতর্কিত বিষয়। এক্ষেত্রে তিনটি প্রসঙ্গ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে তীব্র মতভেদ বর্তমান, যেগুলি হল (১) গোষ্ঠীগত মালিকানা (২) ব্যক্তিগত মালিকানা এবং (৩) রাজকীয় মালিকানা। ভারতবর্ষের মতো বিরাট উপমহাদেশে যেখানে বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য এবং জনজীবনের অসম বিকাশ একটা বরাবরের ব্যাপার, সেখানে কোনও সুনির্দিষ্ট ধরনের জমির মালিকানাবিধি অন্বেষণ করতে যাওয়া বৃথা। তবুও বলা যায় যে, যে সকল সমাজ জাতিভিত্তিক, অর্থাৎ কৌমসমাজ এবং যেখানে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে সাধারণতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা (গণ ও সংঘ) প্রচলিত, সেখানে ভূমির গোষ্ঠীগত মালিকানা আশা করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পরবর্তীকালে রচিত স্মৃতিগ্রন্থসমূহে এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রাচীনতর যুগে জমি সাধারণের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হত এবং তা ভাগ করা নিষিদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে যখন ভূমিবিভাগ বিধিসম্মত হয়ে গিয়েছিল তখনও দেবভট্ট বলেছেন যে, এই বিভাগ সকল জ্ঞাতিদের সম্মতি নিয়ে করা উচিত ('অখিল দায়াদানুমাত্যা, স্ব-গ্রাম-জ্ঞাতি-সামন্ত-দায়াদ-অনুমোদনে চ') প্রাচীন ভারতীয় রচনাসমূহ থেকে এমন একটা ধারণা পাওয়া যায় যে, 'সীতা' বা রাজকীয় ভূমির (ক্রাউনল্যাণ্ড) মালিক রাজা স্বয়ং ছিলেন এবং তৎসহ পদাধিকার বলে তিনি (ক) অনাবাদী ভূখণ্ড, (খ) নূতন পত্তন করা জনপদ, (গ) সেচ প্রকল্প (ঘ) খনি ও খনিজ সম্পদ, (ঙ) অরণ্য (চ) 'ব্রজ' বা গোচারণভূমি এবং (ছ) মাটির নীচে আবিষ্কৃত গুপ্ত সম্পদের উপর সার্বভৌম অধিকার ভোগ করতেন। এ থেকেই একটি সিদ্ধান্ত অনেকেই করেন যে, রাজাই ছিলেন সকল ভূমির অধিকারী এবং ব্যক্তিগত ভূম্যাধিকারী বলতে কিছু ছিল না। কিন্তু এরকম সিদ্ধান্ত অনেকটা অবাস্তব, কেননা প্রাচীন বিধিগ্রন্থসমূহে ভূমির উপর ব্যক্তির 'স্বত্ত্ব' ও 'স্বামিত্ব' খুব গুরুত্ব সহকারে স্বীকার করা হয়েছে। এছাড়া শিলালেখ ও তাম্রশাসনসমূহে ভূমির হস্তান্তর, বিক্রয়, দান, বন্ধক প্রভৃতি যে সকল বিষয় বর্ণিত হয়েছে তা থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ভূমির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল।

ঋগ্বেদের যুগে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত ছিল কি না তা বলা যায় না যদিও *ঋগ্বেদ*-এ (৮/৯১/৫) অপলার পিতার ব্যক্তিগত জমি থাকার ইঙ্গিত আছে। পরবর্তীকালের অর্থে সেটা ঠিক মালিকানা ছিল কি না, তা একটি বড় প্রশ্ন, কেননা *ঋগ্বেদ*-এর অন্যত্র জমি বিক্রয়, হস্তান্তর, বন্ধক, উপহার বা অন্য কোনও উপায়ে ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তির হাত বদল করার কোন সাক্ষ্য নেই। পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহের চিত্রও খুব

স্পষ্ট নয়। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ (৭/১/১/৮) বলা হয়েছে যে, ক্ষত্রিয় (রাজা বা কৌমপ্রধান) জনগণের সম্মতিতে কোনও ব্যক্তিকে বসতি প্রদান করেন। এর থেকে প্রমাণিত হয় না যে, দাতা অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বা রাজা ওই ভূখণ্ডের মালিক ছিলেন, কিংবা যেহেতু তিনি জনগণের সম্মতি নিয়ে দান করেছিলেন অতএব ভূখণ্ডটি ছিল গোষ্ঠী মালিকাধীন, অথবা যে গ্রহীতা হস্তান্তর-বিক্রয়-বন্ধক-দান প্রভৃতির নির্ব্যূঢ় স্বত্ত্বে ওই ভূখণ্ডের স্বামিত্ব পেয়েছিলেন। *শতপথ* (১৩/৭/১-১৫) এবং *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ* (৮/২১)-এ একটি কাহিনী আছে যে, রাজা বিশ্বামিত্র তাঁর পুরোহিত কশ্যপকে ভূমিদান করতে চাইলে ভূমি নিজেকে প্রদত্ত হতে দিতে অস্বীকার করে। পরবর্তীকালে এই বক্তব্যই জৈমিনি ও শবর কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে ভূমি সকলের, কোনও সার্বভৌম ব্যক্তির নয়। যখন বলা হয় 'রাজা সকল জমির প্রভু' তা একান্তই আলঙ্কারিক অর্থে। তিনি ভূমির করগ্রাহী, এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কোনও ভূমিখণ্ডের প্রয়োজন হ'লে তিনি করপ্রদানকারী ভূমির বাস্তব মালিকের কাছ থেকেই তা কিনতে পারেন। অষ্টম শতকের কাশ্মীররাজ চন্দ্রাপীড় একটি ভূমিখণ্ড একজন চর্মকারের নিকট থেকে নগদ মূল্যে ক্রয় করেন। মনুর মতে, ভূমির মালিক সে-ই হয় যে পতিত জমিকে কর্ষণযোগ্য করে।

প্রাক্-মৌর্যযুগে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদ জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার বিষয়টি বৈধতা লাভ করে, যদিও এই মালিকানার প্রকৃতি অঞ্চলভেদে বিভিন্ন ছিল। এই জাতীয় সিদ্ধান্ত পরোক্ষ সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল। অসুবিধাটা এইখানে যে, মৌর্যযুগে পূর্ববর্তী কোন লেখ এপর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ অশোকের রাজত্বকালের আগে লিপিবদ্ধ হয়নি। *বৌধায়ন, গৌতম, আপস্তম্ব* ও *বশিষ্ঠ* এই চারটি প্রাচীন ধর্মসূত্রের সাক্ষ্য থেকে যে উত্তরাধিকারি সংক্রান্ত আইনকানুনের পরিচয় পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার স্বপক্ষে অনুমান করা চলে। বৌদ্ধ গ্রন্থ *সংযুক্ত নিকায়*-এ বলা হয়েছে যে, ভরদ্বাজ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ এত বিশাল একটি কৃষিক্ষেত্রের অধিকারী ছিলেন যে তা কর্ষণ করতে পাঁচশত লাঙল অথবা লাঙলধারী কৃষিশ্রমিকের প্রয়োজন হত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে জৈন *নায়াধম্মকহাও* নামক গ্রন্থে কৃষিশ্রমিক নিয়োগের উল্লেখ আছে। শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক অন্য ব্যক্তির নিকট থেকে জেতবন নামক বিখ্যাত উদ্যান ক্রয় ও তা বুদ্ধকে উপহার প্রদানের বিখ্যাত কাহিনী থেকে ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানা এবং তা বিক্রয়, হস্তান্তর ও দানের অধিকারের প্রমাণ পাওয়া যায়।

মেগাস্থিনিস ও অপরাপর গ্রীক লেখকদের মতে, মৌর্য আমলে দেশের সমস্ত জমিই রাজার মালিকানাধীন। রাজা ব্যতীত আর কোনও ব্যক্তির জমির উপর অধিকার নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মেগাস্থিনিসের পর্যবেক্ষণ বহুক্ষেত্রেই নির্ভরযোগ্য নয় এবং পরবর্তী গ্রীক লেখকগণ তাঁর রচনাকেই অবলম্বন করেছিলেন। ডায়োডোরাসের মতে প্রজারা রাজাকে জমির মালিক হিসেবে ফসলের এক-চতুর্থাংশ খাজনা হিসেবে প্রদান করে। করের পরিমাণ ও হার নিয়ে অবশ্য গ্রীক লেখকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণে ভূমি মোটামুটি তিন শ্রেণীর—রাষ্ট্রের খাস জমি, প্রজাদের নিকট রাজস্বের বিনিময়ে বিলি করা জমি এবং অকর্ষিত এলাকা যেখানে রাষ্ট্রীয় অধিকারের ধরন নানা পর্যায়ের। রাষ্ট্রীয় খাস জমিরও (সীতা) আবার নানা প্রকারভেদ ছিল; যথা যে জমি রাজা ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করতেন; জমি শাসকশ্রেণীর অধীন কর্মচারী এবং রাজার পরিজনরা ভোগ করতেন, যে জমিতে আবাদ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে হত, যে জমি ভাগে চাষ করানো হত প্রভৃতি। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* থেকে যে আভাস পাওয়া যায় তা

হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্র অকর্ষিত ক্ষেত্রে কৃষিকর্ম চালু করতে এবং কর্ষিত ক্ষেত্রে তা বজায় রাখতে আগ্রহী ছিল। রাষ্ট্র তার নিজের স্বার্থেই ভূমির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং দৃষ্টিভঙ্গি প্রাক্ কৌটিল্য ও কৌটিল্যোত্তর উভয় যুগেই বর্তমান ছিল। সাধারণভাবে বক্তিগত মালিকানা স্বত্ব প্রধানত সেইসব জমিতেই পুরুষানুক্রমে চালু ছিল যে জমিগুলি রাষ্ট্র শক্তিশালী হয়ে ওঠার আগে থেকেই বহুকাল ধরে কর্ষিত হচ্ছে। বরং রাষ্ট্র যে জমিতে তার শাসন প্রসারিত করছিল ও উপনিবেশ সৃষ্টি করছিল সেখানেই নতুন করে কৃষকদের সীতা জমির রীতি অনুযায়ী চাষের জন্য নিয়োগ করেছিল।

কৌটিল্যকে মৌর্যযুগে স্থান দেওয়া না দেওয়া অন্য কথা, তবে একথা ঠিক যে পরবর্তী রাজবংশগুলির তুলনায় প্রথম তিনজন মৌর্য নৃপতির আমলে রাজশক্তি ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের প্রাবল্য ছিল। মৌর্যোত্তর যুগে এমন কোনও রাষ্ট্রীয় খামারের কথা পাওয়া যায় না সেখানে কৌটিল্যকথিত কৃষি অধীক্ষকের তত্ত্বাবধানে 'ভূমিশ্রমিক' দিয়ে চাষ করানো হত। কিন্তু নগর, বন্দর, খনি ইত্যাদির উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা ছিল। তবে, কৌটিল্যের এই কথা যে কৃষির জন্য প্রস্তুত ভূমি করপ্রদানকারী জীবনস্বত্ত্বে ও উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগ করবে, মনুও মেনে নিয়েছেন। তিনি বলেন যে, চাষের কাজে পূর্বে ব্যবহৃত হয়নি বা চাষের উপযোগী নয় এমন জমিকে যারা চাষের উপযোগী করে তোলে, তাদের সেই জমির মালিকানা দিতে হবে। তাঁর মতে, জঙ্গল কেটে জমি যে প্রথম পরিষ্কার করে এবং হরিণকে প্রথম যে আঘাত করে, ঋষিগণ উভয়ের উপর তাদের অধিকার স্বীকার করে নেন। *মিলিন্দ পঞ্হো* গ্রন্থে ঠিক এই রকম এক ব্যক্তির কথা আছে যে বনাঞ্চল পবিষ্কার করে জমিকে চাষযোগ্য করে তুলে তার মালিক হয়। মনু বলেন যে, কোনও ব্রাহ্মণের পক্ষে কর্ষিত ভূমির চেয়ে অকর্ষিত ভূমির দানগ্রহণ কম নিন্দনীয়, সম্ভবত ব্যক্তিগত মালিকানাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য মনু ভাইদের পৃথক সংসার করার উপদেশ দিয়েছেন যাতে ধার্মিকতা বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি আশা করেন।

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে ভূমির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার স্থান সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত পুর্ববর্তী যুগের ধারণাসমূহ মনুস্মৃতিতে একটি সুনির্দিষ্ট বক্তব্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং এই বক্তব্য পরবর্তী যুগের ভৌম অধিকার সংক্রান্ত বিধিবিধানসমূহকে পরিচালিত করেছে। অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রগুলি কার্যত মনুস্মৃতিতে ব্যাখ্যা ও যুগোপযোগী রূপান্তর; মনুর টীকা ভাষ্যসমূহের ক্ষেত্রে একথা খাটে। আরও কিছু তথ্য এই প্রসঙ্গে পাওয়া যায় দাক্ষিণাত্যের সাতবাহনবংশীয় নৃপতিবর্গের লেখসমূহ থেকে। সাতবাহন রাজাদের কোনও কোনও প্রজা বিভিন্ন আয়তনের ভূমিখণ্ড যে বৌদ্ধভিক্ষুদের দান করেছিলেন তার প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ বর্তমান। ভারতে ভূমিদানের প্রাচীনতম লৈখিক সাক্ষ্য খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে পুরোহিতদের গ্রামদান করা হয়। এই দানগুলি ছিল করমুক্ত। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের প্রদত্ত একটি দানে সাতবাহন নৃপতি গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি সর্বপ্রথম তাঁর প্রশাসনিক অধিকার ত্যাগ করেন। তাঁদের মধ্যে বণ্টিত ভূখণ্ডে এমনকী রাজকীয় সেনার প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল। সাতবাহন সাম্রাজ্যের রাজকীয় জমি নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু বৌদ্ধ সংঘকে জমিদান করার সময় অপরের জমি ক্রয় করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। এখানেও জেতবনের ন্যায় একই জমির দু'বার হস্তান্তর, বিক্রয় ও দান মারফত, লক্ষ্য করা যায়।

গুপ্তোত্তর যুগের স্মৃতিশাস্ত্রে জমির দান, বিভাগ, বিক্রয়, বন্ধক, ইজারা প্রভৃতি ব্যক্তিগত পর্যায়ের

হস্তান্তরের কথা বলা হয়েছে। চারণভূমিকে ভাগ করা যাবে না এই বিবরণ মনু (৯/২১৯) ও বিষ্ণু (১৮/৪৪) দিলেও বৃহস্পতি তা ভাগ করার অনুমতি দিয়েছেন। কৌটিল্য বাস্তু বিক্রয়ের উল্লেখ করলেও বিক্রয়যোগ্য সামগ্রী হিসেবে আবাদী জমির কথা বলেন নি। নারদ (১২/৫-৬) এবং যাজ্ঞবল্ক্য (১/১৭৭) বিক্রয়যোগ্য সামগ্রী হিসেবে লৌহ, বস্ত্র, গাভী, ভারবাহী পশু, দাসদাসী প্রভৃতির উল্লেখ করেননি। বৃহস্পতি এবং কাত্যায়নই ভূমি বিক্রয়ের ও বন্ধক দেওয়ার নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন। জমির উপর মালিকানা হারিয়ে ফেলার যেসব নিয়ম আছে তা থেকেও জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রমাণিত হয়। মনু বলেন যে, কোন ব্যক্তি যদি অন্য কারও সম্পত্তি দশ বছর ভোগ করে, তাহলে যার সম্পত্তি সে ভোগ করছে সে তার মালিকানা হারায়। জমির ইজারা ও বিলিব্যবস্থা সম্পর্কিত স্মৃতিশাস্ত্রসমূহে প্রদত্ত আইনকানুন থেকেও ব্যক্তিগত মালিকানার প্রমাণ হয়। প্রাপ্তিসাধ্য তথ্যসমূহের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে যে কোন একটি যুগে কোন একটি নির্দিষ্ট ধরনের জমি-মালিকানা ব্যবস্থা বা নিয়ম সমগ্র ভারতবর্ষের সর্বত্র একরূপ ছিল না। বরং বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থার সহাবস্থান কখনো একই জায়গায় একই সময় লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে বলা যায় যে মেগাস্থিনিস ও অপর গ্রীক বিবরণীতে ধারণা পাওয়া যায় তা সর্বক্ষেত্রে সঠিক নয়। ব্যক্তিগত মালিকানা বহুল অংশে প্রচলিত ছিল। রাজার সার্বভৌম অধিকার সর্বক্ষেত্রেই বজায় ছিল।

২.৩ মধ্যস্বত্বভোগী ভূম্যধিকারী শ্রেণী ও কৃষককুল

পূর্বোক্ত সাতবাহনদের দানলেখসমূহের সূত্র ধরে বলা চলে যে, কোনও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে বা দেবতার নামে অথবা ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করার যে রীতি গড়ে উঠেছিল, তার মূলে ছিল ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়ের যুক্তি। এর অর্থ, লোক জমিকে যেমন আবাদিযোগ্য করে তুলে প্রথম পর্যায়ে তা নিষ্কর ভোগ করে, সেই ন্যায় বা যুক্তি অনুসারে দেবতা ও ব্রাহ্মণকে ভূমি প্রদান। যদি কোন শাসক বা অধীনস্থ রাজা কিছু জমি নিষ্কর করে দেবতা বা ব্রাহ্মণকে দিতে চাইতেন, তাহলে তাঁকে রাজার অনুমতি নিতে হবে। প্রথা অনুযায়ী এই দানের যে ধর্মীয় পুণ্য তার দায়ভাগের পাঁচ ভাগ দাতার এবং এক ভাগ রাজার। এইজন্যই রাজকীয় তাম্রশাসনে লেখা হত যে রাজা তার অধীনস্থ অমুক স্থানের অমুক কর্মচারীর অনুরোধে অমুককে দেওয়া জমি নিষ্কর করছেন। যদি অধীনস্থ শাসক বা জমিদার অধিকতর শক্তিশালী হতেন তাহলে তিনি রাজার অনুমতি নিয়ে নিজেই দানপত্রের তাম্রশাসন জারি করতেন। আরও শক্তিমানেরা ঊর্ধ্বতনদের সমীহ করতেন না।

অগ্রহার, ব্রহ্মদেয়, দেবদান প্রভৃতি নামে পরিচিতি ভূমিদান অনুমানিক ৫০০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং ভূম্যধিকারের ক্ষেত্রে এই ধরনের নানা জটিলতার সৃষ্টি করে। এই সকল ভূমিদানের গ্রহীতারা স্বাভাবিকভাবেই বড় বড় জোতের মালিক হয়েছিল। তারা উৎপাদনের সুফল ভোগ করত (ভুজ্যমানক) কিন্তু স্বহস্তে চাষ করত না, ভূমিশ্রমিক বা ভাগচাষী নিযুক্ত করত। শাসিত এবং কৃষকদের মধ্যবর্তী এই শক্তিশালী মধ্যস্বস্তভোগী ভূম্যধিকারীরা আনুমানিক ৩০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এক ধরনের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পত্তন করেছিল বলে ঐতিহাসিকবর্গের একাংশ মনে করেন। এই প্রসঙ্গ পরে আলোচিত হবে।

গুপ্তযুগের কিছু কিছু লেখ থেকে জানা যায় যে সম্রাটের অধীনস্থ কোন রাজা বা শাসক যখন কোন ব্যক্তিকে বৃহৎ ভূমিখণ্ড ব্রহ্মদেয় হিসাবে দান করছেন তিনি সেই সঙ্গে তাঁর শাসনতান্ত্রিক অধিকারও গ্রহীতাকে

হস্তান্তরিত করতেন। আবার বঙ্গাদেশ ও মধ্যভারতের গুপ্ত আমলের ভূমিদানলেখসমূহ থেকে জানা যায় যে গ্রহীতা তার প্রাপ্ত ভূখণ্ড থেকে বরাবরের জন্য রাজস্ব ইত্যাদি পাওয়ার অধিকার হলেও সেই অধিকার হস্তান্তর করার ক্ষমতা বা অধস্তন প্রজা সৃষ্টি করার ক্ষমতা তার ছিল না। ব্রাহ্মণ বা ধর্মের সঙ্গে পেশাগতভাবে সম্পর্কিত নয় এবং ব্যক্তিকেও ধর্মকার্য নির্বাহের জন্য ভূমিদান করা হত, দৃষ্টান্ত ৮৯৬-৯৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভারতের উচ্চকল্পবংশীয় জয়নাথের একটি লেখ যেখানে জনৈক দিবির বা কারণিককে একটি গ্রাম দান করা হয়েছে ধর্মীয় প্রয়োজন নির্বাহের জন্য। মধ্যভারতের, পশ্চিমভারতে ও দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে যে জমি দেওয়া হত তা সরাসরি রাজকীয় দান। জমি ও গ্রাম দু-ই দান করা হত। এই ভূমিদানের সময় উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের পাশাপাশি গ্রামের সম্ভ্রান্ত মানুষ ও কুটুম্বীরা, অর্থাৎ জমির মালিকানা আছে এমন কৃষক উপস্থিত থাকতেন। বকাটক আমলে পশ্চিমভারতে ৩৫টি গ্রাম অগ্রহারে পরিণত করার দৃষ্টান্ত আছে। শুধু ব্রাহ্মণরাই নয়, বৌদ্ধবিহারগুলিও যে ভূসম্পদ লাভ করত, তার নজীর কুমিল্লা জেলায় আবিষ্কৃত বৈণ্যগুপ্তের তাম্রশাসন থেকে বোঝা যায়।

বঙ্গাবিহারের পালবংশীয় রাজারা বৈষ্ণব, শৈব এবং বিশেষ করে বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রচুর জমির মধ্যস্বত্ব দান করেছিলেন। উত্তরবঙ্গ থেকে প্রাপ্ত ধর্মপালের একটি লেখে বলা হয়েছে যে তার অধীনস্থ রাজা নারায়ণবর্মা কর্তক শুভস্থলীতে নির্মিত একটি মন্দিরের জন্য প্রদত্ত গ্রামের গ্রহীতা ওই মন্দিরেরই লাট ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের গ্রামস্থ কৃষিজীবি ও পেশাদারগণ ছাড়াও নিম্নভূমি (তলপাটক), হাটবাজার (হট্টিক) এবং দশ ধরনের অপরাধের জন্য জরিমানা ধার্য করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। ধর্মপাল, দেবপাল ও মহীপাল এইরকম শর্তে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে বহু গ্রাম দান করেছিলেন। প্রতিহারবংশীয়সম্রাটদের লেখ থেকে জানা যায় যে তাঁদের অধীনস্থ কোন রাজা বা ভূম্যধিকারী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ভূমিদান করতে চাইলে তাঁকে তন্দ্রপাল নামক রাজকর্মচারীর নিকট আবেদন করতে হত। সম্ভবত এই তন্দ্রপালেরা ছিলেন বিভিন্ন অধীনস্থ রাজ্যে কেন্দ্রীয় রাজশক্তির প্রতিনিধি। রাষ্ট্রকূটদের ভূমিদানলেখের সংখ্যা পাল ও প্রতিহারদের চেয়ে অনেক বেশি, এক্ষেত্রেও গ্রহীতাদের কাছে শাসনকার্য ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হয়েছে। এই ঐতিহ্য পরবর্তী যুগেও (১০০০-১৩০০ খ্রিঃ) বজায় ছিল।

নিয়মিতভাবে ভূসম্পদের উপর মালিকানা বা ভোগাধিকার পাওয়ায় কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের হাতে বিস্তর অর্থনৈতিক সুবিধা জমা হয়েছিল। এইভাবে একটি মধ্যস্বত্বভোগী ভূম্যধিকার শ্রেণী গড়ে ওঠে। ব্রাহ্মণদের অগ্রহার হিসাবে গ্রামের রাজস্বভোগের অধিকার দেওয়ার পিছনে ধর্ম ও শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্য বহুলাংশে কার্যকর ছিল, এবং সেই একই প্রয়োজনে বিভিন্ন মন্দির ও মঠ ভূম্যধিকার লাভ করত। হিউয়েন সাঙ জানিয়েছেন যে নালন্দা-বিহারের ব্যয় নির্বাহের জন্য একশো গ্রামের রাজস্ব বরাদ্দ ছিল, ই-ৎসিং এর সময় তা বেড়ে দুশোটি গ্রাম হয়। অগ্রহার প্রথা প্রবর্তনের দরুন রাজা বহু পরিমাণে কৃষিজ রাজস্ব হারাতেন একথা খুবই সত্য, কিন্তু একথাও অস্বীকার করা যায় না যে অগ্রহার করার বহু ঘটনাতেই পতিত, অনুর্বর, অনুপাদক এবং সেহেতু রাজস্ববিহীন জমি হস্তান্তরিত হত। যেহেতু দানগ্রহীতাদের এই জাতীয় জমিদানে অন্ন সংস্থান হত, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তাঁরা কোন-না-কোন ভাবে ওই অনুর্বর জমিকে চাষের আওতায় আনতেন। তবে মঠ বা বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ছিল ভিন্ন। গুপ্ত আমলের দানলেখসমূহে বলা হয়েছে যে গ্রহীতা তাঁর প্রাপ্ত

ভূখণ্ডের অধিবাসী, কৃষক, কারিগর ও অপরাপর পেশাদারদের কাছ থেকে বিধিসম্মতভাবে কর আদায়েরও অধিকারী ছিলেন। এ বক্তব্য বুদ্ধ ঘোষের রচনাতেও সমর্থিত হয়েছে যেখানে ব্রহ্মদেয় ভূখণ্ডের অধিকারীর শাসন ও বিচার বিষয়ক ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। ব্রহ্মদেয় ভূমিখণ্ডের গ্রহীতাদের উপর কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করার খবর পাওয়া যায় না, তবে বকাটকরাজ দ্বিতীয় প্রবরসেনের চম্মক তাম্রশাসনে কিছু শর্ত আছে যেমন গ্রহীতারা রাজদ্রোহ, চৌর্য, ব্যাভিচার বা অন্য গ্রামের প্রতি অন্যায় কার্য থেকে বিরত থাকবে।

লেখসমূহে গ্রামদানের বা ভূমিদানের প্রসঙ্গে প্রদত্ত এলাকাটিকে অচাটভাট-প্রবেশ্য বা চাটভাট-অপ্রবেশ্য ঘোষণা করা বহুক্ষেত্রে হয়েছে, যার অর্থ সেখানে রাজকীয় নিয়মিত বা অনিয়মিত রক্ষীবাহিনীর প্রবেশাধিকার নেই। এর অর্থ দানগ্রহীতা কেবলমাত্র ভূসম্পদ ও গ্রাম থেকে প্রাপ্য রাজস্বই ভোগ করতেন না, রাজকীয় রক্ষীদের পরিবর্তে তিনি নিজেই গ্রামীণ আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ও রাজস্ব সংগ্রহের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র ব্যবস্থাদি প্রবর্তন করতেন। গ্রহীতারা বরাবরের জন্য তাঁদের প্রাপ্ত গ্রামগুলি থেকে শুধুমাত্র কর আদায়েরই অধিকার পাননি, শাসন ও দণ্ডদানেরও (দশ প্রধান দণ্ড বা দশাপচার) অধিকার পেয়েছিলেন। এ থেকে যা অনুমান করা যায় তা হচ্ছে এই যে প্রদত্ত এলাকাসমূহে রাজকীয় ক্ষমতার ব্যাপক হস্তান্তর চলত, সাম্রাজ্য বা রাজ্যের মধ্যেই মধ্যস্বত্বভোগীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকায় পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।

পাশাপাশি কৃষকদেরও প্রসঙ্গ আসে। ধনী চাষী বা জোতদার শ্রেণীর কৃষিজীবীরা গহপতি (গৃহপতি), কুটুম্বিক, মহত্তর প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়েছেন। কিন্তু বিশাল কৃষকশ্রেণী, যাঁরা সচরাচর হালিক, কর্ষক প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিলেন, বহু উপশ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন, এবং অধিকাংশই দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করতেন। ব্রাহ্মণ বা বৌদ্ধবিহারের ভিক্ষুরা যাঁরা শাসকদের নিকট থেকে ভূমি বা গ্রাম অগ্রহারস্বরূপ লাভ করতেন, তাঁরা স্বহস্তে চাষ করতেন না। তাঁরা কৃষক নিয়োগ করে তাঁদের দিয়ে চাষ করাতেন। এই কৃষকদের অস্তিত্ব অবশ্যই ভূম্যধিকারীর উপর নির্ভরশীল ছিল। ই-ৎসিং লিখেছেন যে নালন্দা বিহারের কৃষিভূমি অস্থায়ী কৃষকদের দিয়ে চাষ করানো হত। বৌদ্ধ সঙ্ঘ তাদের বলদের যোগান দিত, তবে লাঙ্গল, বীজ, সার এই সকল সামগ্রী দিত কি না তিনি তার উল্লেখ করেননি। বিনিময়ে সঙ্ঘ উৎপন্ন ফসলের ষষ্ঠাংশের অধিকারী হত। যাদের দিয়ে এইভাবে জমির চাষ করানো হত তাদের সঙ্গে এযুগের বর্গাদার বা ভাগচাষীর সাদৃশ্য আছে।

ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষেত্রে ভূমিসংক্রান্ত অধিকারের নিয়মাবলী সব ক্ষেত্রে একই রকম ছিল না। কৌটিল্য বলেছেন যে নতুন বসতির ক্ষেত্রে কর্ষণযোগ্য ভূমি রাজা প্রত্যক্ষভাবে কৃষককেই অর্পণ করবেন, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে কৃষককে জমি বরাদ্দ করবেন ক্ষেত্রস্বামী; রাজা বা মহীপতির এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে কিছু করার নেই। যাজ্ঞবল্ক্য ২/৫৭-র *মিতাক্ষরা* ও *বীরমিত্রোদয়*-এর ব্যাখ্যা অনুসারে ভূমির অধিকার ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে চারটি স্তর নির্ণয় করেছেন—মহীপতি, ক্ষেত্রস্বামী, কর্ষক ও মজুর। বৃহস্পতি বলেন যে ক্ষেত্রস্বামী বা স্বামী রাজা এবং কৃষকের মধ্যবর্তী, যিনি কৃষকদের কর্ষণযোগ্য জমি দেবেন, এবং সেই জমি অকর্ষিত পড়ে থাকলে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবেন। মহারাষ্ট্র ও গুজরাত থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ থেকে সপ্তম শতকের মধ্যে রচিত দানলেখসমূহে এই জাতীয় ব্যবস্থার একটা প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় যেখানে ইজারায় কর্ষণযোগ্য ভূমি গ্রহণের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণরা অগ্রহার হিসাবে যে সকল গ্রাম পেতেন সেই সকল গ্রামের কর্ষণযোগ্য ভূমি স্বভাবতই কৃষকদের ইজারায় বা ভাগে দেওয়া হত।

মধ্যভারতের গুপ্তযুগীয় শাসনসমূহ থেকে কৃষকদের পক্ষে রাজার জন্য বিষ্টি বা বাধ্যতামূলক শ্রমদানের নিয়ম পাওয়া যায়। বকাটক ও গুপ্তদের অধীনস্থ কোন কোন রাজার লেখসমূহ থেকে জানা যায় যে ধর্মার্থে প্রদত্ত কোন গ্রামের ক্ষেত্রে এই বিষ্টি বা বাধ্যতামূলক শ্রম আদায় চলবে না। মহারাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের একটি তাম্রশাসনে বিষ্টি ও দিত্য থেকে মুক্ত অগ্রহারের উল্লেখ আছে। পশ্চিম ভারত থেকে অনুরূপ আরও বহু তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে, যেগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ৪৫৭ খ্রিস্টাব্দের একটি লেখ। ধর্মীয় ও কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতিরেকে বাধ্যতামূলক শ্রম আদায়, শুধু রাজাই নয় যে-কোন ভূম্যধিকারীই এই অধিকার প্রয়োগ করতে পারতেন। ষষ্ঠ শতকের বলভীর রাজা প্রথম ধরসেনের একটি শাসনে অগ্রহারিককে প্রয়োজনে এই অধিকার প্রয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে প্রথম শিলাদিত্যের লেখসমূহে ভূম্যধিকারীর এই অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। বাদামির চালুক্যদের শাসনসমূহেও এই প্রথার কথা বলা আছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে রাজা, অগ্রহারিক ও ক্ষেত্রস্বামীদের হাতে কৃষক ও ভূমিশ্রমজীবীদের উৎপীড়িত হতে হত। নানা প্রকারে রাজকর ও শ্রমদান ছাড়াও রাজকীয় সৈন্যবাহিনী যে গ্রামের মধ্য দিয়ে যেত তাদের খোরপোষের জন্য অর্থ এবং রসদের যোগান দিতে হত ও তাদের জিনিসপত্র পরিবহণের জন্য গবাদি পশুও দিতে হত। সম্ভবত এই জাতীয় কর-কে কৌটিল্য সেনাভক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। ভাগচাষীরা মোটামুটি একই জমিতে চাষ করতেন জমির মালিকানা বদল সত্ত্বেও। পূর্ববঙ্গের আশরাফপুর তাম্রশাসনসমূহ থেকে জানা যায় যে বৌদ্ধ সঙ্ঘকে প্রদত্ত একটি ভূমিখণ্ডে যাঁরা আগে চাষ করতেন তাঁদেরই রেখে দেওয়া হয়েছিল। একটি পল্লব দানলেখে দেখা যায় যে, চারজন ভাগচাষী সমেত একটি ভূমিখণ্ডকে ব্রহ্মদেয় করা হয়েছে। গোদাবরী জেলার এলোরে প্রাপ্ত সালংকায়ন বিজয় দেববর্মার একটি দানলেখ একজন ব্রাহ্মণকে কুড়িটি ভূমির নিবর্তন ক্ষেতমজুর ও তাদের বাসগৃহসহ প্রদত্ত হয়েছে। স্মৃতিশাস্ত্রসমূহে বলা হয়েছে যে ক্ষেত্রিক বা কর্ষকরা কর্তব্যে অমনযোগী হলে স্বামী বা ভূমির মালিক তাদের পরিবর্তন করতে পারে। মালিকের প্রাপ্ত ভাগ ক্ষেত্রফল নামে পরিচিত ছিল যার পরিমাণ অবশ্য ভূমির প্রকৃতির উপর নির্ভর করত। উত্তম এবং নিয়মিত কর্ষিত জমির ক্ষেত্রে মালিকের ভাগ এক-ষষ্ঠাংশ, অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট জমির ক্ষেত্রে তা এক-অষ্টমাংশ বা এক-দশমাংশ ছিল।

২.৪ সামন্ত প্রথার ধারণা ও সংশ্লিষ্ট বিতর্ক

পূর্বে যে মধ্যস্বত্বভোগী ভূম্যধিকারী শ্রেণীর কথা বলা হয়েছে এই শ্রেণীর দ্বারাই একজাতীয় সামন্ততন্ত্র এদেশে ৬৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গড়ে উঠেছিল বলে রামশরণ শর্মা প্রমুখ ঐতিহাসিকবর্গ মনে করেন। ভূমিদানলেখসমূহ থেকে শর্মা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে গুপ্তযুগ থেকেই এদেশে এক ধরনের সামন্ততন্ত্রের সূচনা হয়েছিল। ব্রাহ্মণ ও দর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে বহু-ক্ষেত্রেই কর আদায়ের অধিকারসহ গ্রামদান করা হত। এই অধিকার হস্তান্তরের ফলে একটি জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল। এর ফলে গ্রামবাসীদের সমষ্টিগত অধিকারসমূহ গ্রহীতা জমিদারদের হাতে চলে গিয়েছিল এবং বর্ধিত করভার ও বাধ্যতমূলক শ্রম আদায় কৃষকদের পক্ষে এই নূতন সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে খুবই নিপীড়নমূলক করে তুলছিল। এই জমিদার প্রভাবিত

সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য ছিল কৃষকদের পরাধীনতা, স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক এককসমূহ, ওজন ও মাপের স্থানীয়তা, মুদ্রার সংখ্যাল্পতা, বাণিজ্যের অবক্ষয় এবং ছোট ধরনের ভোগ্যপণ্য উৎপাদন। শর্মার মতে এগুলিই হচ্ছে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের প্রধান লক্ষণ। মধ্যস্বত্বভোগী এই জমিদারশ্রেণীর শাসনতান্ত্রিক ও রাজস্বভোগের অধিকারসহ গ্রাম ও গ্রামনিচয়ের মালিকানা লাভ যেমন প্রদত্ত এলাকায় আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার সহায়ক হয়েছিল, অপরদিকে তেমনই ব্রাহ্মণ্যবাদের বিকাশ ও কেমিসমাজের রূপান্তরের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। শর্মার মতে এই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্মেষ খ্রিস্টীয় ৩০০ থেকে ৬০০-র সময়সীমা, খ্রিস্টীয় ৬০০-৯০০-র মধ্যে এবং চূড়ান্ত রূপটি খ্রিস্টীয় ৯০০-১২০০-র মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

শর্মা বলেন যে সামন্তপ্রথার উদ্ভব এক বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার জন্ম দিয়েছিল। এর ফলে ভূমিব্যবসায় ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যাপক প্রসার ও ভূম্যধিকারীদের ব্যাপক ক্ষমতাবৃদ্ধি ঘটেছিল এবং পাশাপাশি জমির উপর রাষ্ট্রীয় ও যৌথ অধিকারের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়েছিল। যারা বরাবরের কৃষক তাদেরও অবস্থার হানি হয়েছিল। পূর্বে গৃহপতি, কুটুম্বী প্রভৃতি যে সকল পরিভাষার দ্বারা সমৃদ্ধ কৃষকদের বোঝাত, সেই সকল পরিভাষা পরবর্তীকালে অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছিল, পরিবর্তে হালকর, বদ্ধহল, আশ্রিত হালিক প্রভৃতি বিশেষ পরিভাষা কৃষকদের হীনাবস্থার পরিচায়ক হয়েছিল। অগ্রহার ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশের ফলে যে স্বনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতির জন্ম হয়, যেখানে লেনদেন হওয়ার মতো যথেষ্ট পণ্য উৎপাদিত হত না। এই অবস্থা বাণিজ্যের পক্ষে প্রতিকূল হয়ে পড়ে। বাণিজ্যের অবক্ষয়ের সবচেয়ে প্রধান প্রমাণ হিসাবে শর্মা মুদ্রা ব্যবহারে ব্যাপক হ্রাসের ঘটনাকে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর মতে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি কার্যত ৬০০-১০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। উৎপাদন ব্যবস্থা সচলতা হারানোর ফলে কারিগরী শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে নগরের অস্তিত্ব অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে এবং নগরসমূহের দ্রুত অবক্ষয় ঘটে।

শর্মার এই গবেষণার গুরুত্ব অসাধারণ এবং তাঁকে অনুসরণ করে বি. এন. এস. যাদব বলেন যে মৌর্যোত্তর যুগ থেকেই এক জাতীয় ভ্যাসালেজ প্রথা, অর্থাৎ বড় রাজার সঙ্গে তাঁর অধীনস্থ রাজাদের কিছু বাধ্যবাধকতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, গুপ্তযুগে যে সম্পর্কের ব্যাপ্তি ঘটে। গুপ্তোত্তর যুগের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার আবর্তে যে অর্থনৈতিক অধোগতি শুরু হয়েছিল তার ফলে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার কিছু পূর্ব-শর্তের সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর মতে ৬০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মুদ্রাব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে সংখ্যাল্পতা ও নিকৃষ্ট মানের পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকে মনে করা যেতে পারে যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও নাগরিক জীবনে একটা বড় অবক্ষয় ঘটে গিয়েছিল এবং সমাজ বর্ধিতভাবেই গ্রামীণ হয়ে পড়েছিল। এই অবস্থায় আঞ্চলিকতা ও স্থানীয়তার বিকাশ বেশিমাত্রায় ঘটেছিল এবং অর্থনৈতিক বন্ধদশা স্বয়ংসম্পূর্ণ স্থানীয় অর্থনীতির সূত্রপাত করেছিল। তাঁর মতে মধ্যযুগের ইউরোপেও ব্যবসা-বাণিজ্যের অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রামানের এইরকম অধোগতি হয়েছিল। মুদ্রাব্যবস্থার বিপর্যয়ের ফলে রাজাদের পক্ষে অধীনস্থ শাসকদের হাতে অধিকতর দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হয়েছিল, এবং মুদ্রায় বেতন দেওয়া সম্ভব ছিল না বলেই কর্মচারীবর্গ, সশস্ত্র অনুগামী প্রভৃতি ব্যক্তিদের ভূমিদান করতে হয়েছিল।

ভূমিদান সংক্রান্ত যে তথ্যাবলী রামশরণ শর্মা উপস্থাপিত করেছেন তার প্রায় সবটাই হচ্ছে রাজা বা শাসকগণ কর্তৃক ধর্মার্থে ব্রাহ্মণদের বা কোন মঠ-মন্দিরকে ভূমিদান, যার সঙ্গে ইউরোপীয় ভূমি বিভাজন

বা হস্তান্তরের কোন তুলনা হয় না। ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের মূল কথা হচ্ছে একটা পবিত্র দায়বদ্ধতা, যেখানে প্রজা মনিবের জন্য শ্রমদান করতে বাধ্য, বিভিন্ন মাপের জমিদার ও সামন্তরা তাদের ঊর্ধ্বতন প্রভুকে অর্থ, লোকবল প্রভৃতির যোগান দিতে বাধ্য, বিনিময়ে রাজা তাদের অধিকারসমূহ রক্ষার জন্য শপথের দ্বারা অঙ্গীকারবদ্ধ। কিন্তু এখানে রাজা বা শাসক, ভূমি বা গ্রামদান করেছেন শর্তহীনভাবে এবং এই প্রাপ্তির বিনিময়ে গ্রহীতার কোন বাধ্যবাধকতা ঊর্ধ্বতন প্রভুর কাছে নেই। যে জমি ব্রাহ্মণ বা মঠ-মন্দিরসমূহকে দান করা হত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা ছিল অপ্রহত বা খিল-ক্ষেত্র, অর্থাৎ অকর্ষিত ভূমি। ইউরোপীয় ফিউডাল ব্যবস্থায় যে সামন্তরা ভূম্যধিকার পেতেন তা তাঁরা অধীনস্থ উপসামন্তদের মধ্যে শর্তাধীনে বিলিবন্দোবস্ত করার অধিকারী ছিলেন। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে যে ভূমি বা গ্রামদান করা হ'ত তা করা হত নীতিধর্মের আদর্শে, যা অনুযায়ী গ্রহীতা কোন অবস্থাতেই ভূমির বিলিব্যবস্থা, হস্তান্তর, বিক্রয় ও বন্ধক প্রদানের অধিকারী হতে পারেন না।

শর্মার মতে ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে অনুসৃত ভূমিদানরীতি অন্যান্য পদাদিকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হত কেননা হিউয়েন সাঙ ও মনু বলেছেন যে রাজকীয় পদাধিকারীদের বেতন হিসাবে ভূমি ও জায়গীরদানের রীতি ছিল। কিন্তু এই বক্তব্যকে সমর্থন করার মতো পর্যাপ্ত দানলেখ খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি বলেন সামন্তগণ রাণক, ভূপাল, ভোক্তা, মহাসামন্ত, মণ্ডলিক, ভৌগিক, মহামণ্ডলেশ্বর প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিলেন। এই উপাধিগুলি কোন এলাকার উপর আধিপত্যবাচক, কিন্তু উপাধিধারীরা রাজার কাছ থেকে ভৌম অধিকার পেয়েছিলেন একথা কোন ভূমিলেখের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয় না। এও দেখা গেছে যে, ক্ষুদ্র আঞ্চলিক নৃপতি দম্ভপূর্ণ রাজকীয় উপাধি নিয়েছেন, এবং তাঁর চেয়ে অনেক বড় রাজা ছোটখাটো উপাধিতেই সন্তুষ্ট থেকেছেন। ভারতীয় কৃষকেরা ছিলেন স্বাধীন কৃষিজীবী জাতি, ইউরোপীয় সার্ফদের মতো তাঁরা নিছকই ভূমিশ্রমিক ছিলেন না বা তাঁদের প্রভুর জমিতে বদ্ধ ছিলেন না। ইউরোপীয় ম্যানরের অধিপতির সঙ্গে ভূমিবদ্ধ সার্ফদের যে সম্পর্ক ইউরোপের ইতিহাসে দেখা যায়, ভারতে তা অনুপস্থিত। বাধ্যতামূলক শ্রম বা বিষ্টি এখানে কৃষক ছাড়াও শ্রমিক ও কারিগরদের কাছ থেকে আদায় করা হত। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রসমূহে এই বাধ্যতামূলক শ্রমদান করপ্রদান বলে গণ্য হয়েছে যা প্রজারক্ষার বিনিময়ে রাজার বেতন। ইউরোপের মতো ভারতবর্ষে ভূমিস্বামীদের ব্যাপক বেগার খাটানোর আইনানুগ অধিকার ছিল না।

শর্মার সিদ্ধান্তসমূহ হরবন্‌স মুখিয়া অনুমোদন করেন নি। তাঁর মতে আদি মধ্যযুগে কৃষকশ্রেণী উৎপাদনের উপকরণসমূহের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিলেন যেগুলির উপর সামন্ত বা ভূম্যধিকারীর নিয়ন্ত্রণ বা মালিকানা না থাকায় ভূস্বামী ও কৃষকদের মধ্যে আধিপত্য-অধীনতার সম্পর্ক দানা বাঁধতে পারেনি। খ্রিস্টীয় ৬৫০-১২০০ পর্বের উৎপাদন ব্যবস্থায় যেহেতু ভারতবর্ষে 'ভূমিদাস' শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না, এবং যেহেতু রাজা এবং ভূস্বামীর মধ্যে, তথা ভূস্বামী ও কৃষকের মধ্যে কোন চুক্তি থাকার প্রমাণ নেই, সেই কারণে এই যুগের উৎপাদন ব্যবস্থাকে সামন্তপ্রথা অভিধায় চিহ্নিত করতে তিনি নারাজ। শর্মা ও যাদবের তত্ত্বর সমালোচনা করতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র সরকার বলেন যে অগ্রহার ব্যবস্থা রাষ্ট্রের প্রতাপ হ্রাস বা অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের ইঙ্গিত দেয় না। এই ব্যবস্থায় দানগ্রহীতা কর ভোগের অধিকার পেতেন, কিন্তু বিভিন্ন লেখের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করে এটাও দেখানো যায় যে, কয়েকটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র ব্যতীত, কর সংগ্রহ করার ক্ষমতা

ও অধিকার দানগ্রহীতার ছিল না। বহু ক্ষেত্রে রাজকীয় আদেশনামা দ্বারা অগ্রহার এলাকা থেকেও কর সংগ্রহ করা হত। তাঁর মতে অগ্রহার ব্যবস্থার ভূম্যধিকারীরা প্রকৃতপক্ষে জমিদারের সমতুল্য ছিলেন, মধ্যস্বত্বভোগী বা উপস্বত্বভোগী ভূস্বামী ছিলেন না।

অর্থনৈতিক অধোগতির তত্ত্ব সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সরকার বলেন যে সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকের স্থাপত্যমূলক কীর্তিসমূহ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে একটা বৃহৎ পরিমাণের অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত রাজা এবং উচ্চবর্গের ব্যক্তিদের হাতে জমা হয়েছিল। রাষ্ট্রকূট, প্রতিহার ও পালদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যে চিত্র আরব লেখকদের রচনায় পাওয়া যায় তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তৎকালীন রাজাদের এমন দুর্দশা হয়নি যে নগদ মুদ্রায় তাঁরা কর্মচারীদের বেতন দিতে অক্ষম ছিলেন। সুলতান মাহমুদ কর্তৃক লুণ্ঠিত সামগ্রীসমূহের মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার সংখ্যা কম ছিল না। অনেক শক্তিমান রাজা বা রাজবংশ রাজার চালু মুদ্রাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন, নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে নূতন মুদ্রা প্রচলন করেননি। কাশ্মীরে একাঙ্গ, তন্ত্রী ও ডামররা রাজা কেনাবেচা করত নগদ মুদ্রার মাধ্যমে। পাণ্ড্যরাজারা আরবদের কাছ থেকে নগদ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে অশ্ব ক্রয় করতেন বিপুল সংখ্যায়। তিনি আরও বলেন যে প্রত্নলেখসমূহ থেকে স্বাধীন ও অর্ধস্বাধীন নরপতি এবং তাঁদেরও অধীনস্থদের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু এইসব তথাকথিত সামন্তরাজা বা সর্দাররা রাজস্ব-মুক্ত গ্রাম বা ভৌম এলাকা সৃষ্টির জন্য দায়ী, এ বিষয়ে নিশ্চিত কোন প্রমাণ নেই। সম্ভবত উপরোক্ত তথ্যপ্রমাণাদি এ কথাই বলে যে প্রাচীন ভারতে ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের ধাঁচ লক্ষ্য করা যায় না। তবে মানব-জমি সম্পর্ক, জমি মালিকানার স্বরূপ ও সংজ্ঞা, রাষ্ট্র সংগঠনের রূপ ও চরিত্র, রাজার সার্বভৌমিক শক্তির রূপ ইত্যাদির ক্ষেত্রে এবং সামগ্রিকভাবে সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে গুপ্তোত্তর যুগ থেকে ক্রমশ বর্ধিত পরিবর্তনসমূহ সমাজকে একটি বিশেষ আকার দিয়েছিল—যা থেকে আমাদের বলতেই হবে যে আদি মধ্যযুগের সূচনা এই সময় থেকে লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তনগুলির একটি ইউরোপীয় সামন্ততান্ত্রিক সংজ্ঞা না খাড়া করেও পরিবর্তনগুলির বাস্তবতা ও তার চরিত্র খোঁজা যায়। তবে শর্মা প্রমুখ ঐতিহাসিকদের তত্ত্বমূলক সংজ্ঞা খোঁজার প্রচেষ্টা অপরিসীম মূল্যবান এবং তাঁদের নির্দেশিত তথ্যাবলী নূতন গবেষণার ও পুনর্মূল্যায়নের দাবী রাখে। সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব সংক্রান্ত তত্ত্ব নিয়ে বিতর্কের অবসান এখনো ঘটেনি।

২.৫ অনুশীলনী

১। প্রাচীন ভারতে কৃষি ও জলসেচ ব্যবস্থা কীরূপ ছিল?

২। প্রাচীন ভারতে চাষের পদ্ধতি সম্বন্ধে টীকা লিখুন।

৩। প্রাচীন ভারতে ভূমির মালিকানা সম্বন্ধে মেগাস্থিনিস, কৌটিল্য ও গুপ্তযুগের ব্যবস্থা কীরূপ ছিল?

৪। মধ্যস্বত্বভোগী ভূম্যধিকারী শ্রেণী ও কৃষকদের অবস্থা ও সম্পর্ক সম্বন্ধে রচনা লিখুন।

৫। সামন্ত প্রথার ধারণাকে ঘিরে কী বিতর্ক উঠেছিল?

২.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১। রণবীর চক্রবর্তী ঃ *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে (১৯৯১)*

২। রাধাগোবিন্দ বসাক ঃ *কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্র,* দুই-খণ্ড (১৯৬৪,১৯৬৭)

৩। ভাস্কর চট্টোপাধ্যায় ঃ *ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রব্যবস্থা (১৯৯৩)*

৪। ইউ. এন. ঘোষ ঃ *দি এগরেরয়ান সিস্টেম ইন এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়া (১৯৭১)*

৫। ডি. এন. ঝাঁ (সম্পা.) ঃ *ফিউডাল সোশাল ফরমেশানস ইন আর্লি ইন্ডিয়া (১৯৮৭)*

৬। ডি. সি. সরকার ঃ *ল্যান্ডলর্ডইসম্ এ্যান্ড টেনান্সি ইন এনশিয়েণ্ট এন্ড মেডিয়াভাল ইন্ডিয়া, (১৯৬৯)*

একক ৩ ❐ প্রাচীন ভারতীয় অর্থনীতির কৃষি-অতিরিক্ত অন্যান্য ক্ষেত্রসমূহ

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.১.১ হরপ্পা সভ্যতা

৩.১.২ হরপ্পা-উত্তর সংস্কৃতিসমূহ

৩.১.৩ বৈদিক যুগের কারিগরি

৩.১.৪ পরবর্তী পর্যায়সমূহ

৩.২ কারিগর ও পেশাদারি সংগঠনসমূহ ঃ শ্রেণী, সঙ্ঘ ইত্যাদি

৩.৩ বাণিজ্য ও নগরকেন্দ্রিকতা

৩.৩.১ হরপ্পা সভ্যতা

৩.৩.২ বৈদিক যুগ

৩.৩.৩ দ্বিতীয় নগরায়ণের যুগ

৩.৪ সামুদ্রিক বাণিজ্য ও বন্দরসমূহ

৩.৪.১ রোমক বাণিজ্য

৩.৪.২ গুপ্তযুগের বাণিজ্য

৩.৪.৩ আদি-মধ্যযুগের বাণিজ্য ও নগরসমূহ

৩.৫ অনুশীলনী

৩.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

- প্রাচীন ভারতের কারিগরি ব্যবস্থা
- কারিগর ও পেশাদারি সংগঠনসমূহ
- বাণিজ্য ও নগরায়ণ

৩.১ কারিগরির উৎস সন্ধানে

প্রাক্-হরপ্পীয় পর্যায় : ভারতবর্ষে ধাতব ও অপরাপর কারিগরির উৎস অনুসন্ধানে কোয়েটা থেকে ১৫০ কিমি দূরত্বে অবস্থিত মেহেরগড় নামক প্রত্নস্থলটিতে দৃষ্টি দেওয়া দরকার যেখানে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দ থেকে তাম্রের ব্যবহার শুরু হয়। মেহেরগড়ের দ্বিতীয় পর্বে হাতে তৈরি ও কুমোরের চাকার পাত্র দেখা যায়, সেই সঙ্গে শঙ্খ এবং দামী-আধাদামী পাথরের উপর সূক্ষ্ম কাজ। পরবর্তী পর্বগুলিতে মৃৎশিল্পের আরও উৎকর্ষ লক্ষ্যণীয়, যেখানে নানাপ্রকার রঙের প্রয়োগ দেখা যায়। বেলুচিস্তানের প্রাক্-হরপ্পীয় নবাশ্মীয়-তাম্রশ্মীয় সংস্কৃতিগুলির (খ্রিস্টপূর্ব-চতুর্থ-প্রথম সহস্রাব্দ) ক্ষেত্রে বিবর্তনধর্মী কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয় যেমন গ্রাম্যদশা থেকে ইষ্টকনির্মিত আবাস ব্যবস্থায়, অর্থাৎ নাগরিকতায়, রূপান্তর; হস্তনির্মিত মৃৎপাত্র থেকে চক্রনির্মিত; ক্ষেত্রবিশেষে রঙের দ্বারা চিত্রিত, মৃৎপাত্রশিল্পে রূপান্তর; এবং হাতিয়ারগত কলাকৌশলের ক্ষেত্রে প্রস্তর থেকে তাম্র ব্রোঞ্জ এবং হরপ্পা-উত্তর যুগে তাম্র ব্রোঞ্জ থেকে লৌহে রূপান্তর। এইসকল সংস্কৃতিতে মৃতদেহ সমাধিস্থ করার সময় নানাপ্রকার সামগ্রী দেওয়ার রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—তামার হাতিয়ার ও উপকরণ, আধা-দামী পাথরের গহনাপত্র, তামা এবং ব্রোঞ্জ নির্মিত দর্পণ প্রভৃতি। এছাড়া পোড়ামাটির বৃষ ও মাতৃকামূর্তির কথাও উল্লেখ্য। মুণ্ডিগক, কিলিগুল-মুহম্মদ, ডাম সাদত, কুল্লী, নাল প্রভৃতি প্রত্নক্ষেত্রে নানা সংস্তর থেকে তাম্রনির্মিত কুঠার, হাতল পরাবার গর্তযুক্ত বাইস, করাত, বাটালি, বর্শাফলক, ছোরা, পিন, আয়না, কাস্তে ধরনের ফলা প্রভৃতি পাওয়া গেছে। দ্বিবর্ণ ও বহুবর্ণরঞ্জিত মৃৎপাত্রের ব্যাপক পরিচয় বিভিন্ন কেন্দ্রে পাওয়া গেছে। সিন্ধুর অম্রী নামক কেন্দ্রের প্রাক্-হরপ্পীয় পর্যায়ে প্রথম দিকে হস্ত ও পরে চক্রনির্মিত, ক্রীমরঙের এবং জ্যামিতিক নকশা-শোভিত মৃৎপাত্র ছাড়াও হালকা লোহিত অথবা পাটল বর্ণের অলঙ্করণ যুক্ত মৃৎশিল্পের নিদর্শন পাওয়া গেছে। সিন্ধুর কোট-ডিজিতেও উন্নতমানের চক্রনির্মিত মৃৎপাত্র, প্রস্তর ও তাম্র ব্রোঞ্জের হাতিয়ার ও উপকরণ, পোড়ামাটির খেলনা, মূর্তি বল পাওয়া গেছে। রাজস্থানের কালিবঙ্গানে পাথরের ফলা শিল্প, চুনাপাথর ও আধা-দামী পাথরের নানা উপকরণ এবং তামার তৈরি কিছু সামগ্রীর নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখনকার প্রাক্-হরপ্পীয় মৃৎপাত্র চক্রনির্মিত, হালকা, লোহিতাভ থেকে পাটল বর্ণের কালো রঙের দ্বারা চিত্রিত, জ্যামিতিক বা প্রাকৃতিক অলঙ্করণসহ। অনুরূপ মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে চৌতাঙ্গা নদীর তীরে সোথি নামক স্থানে।

৩.১.১ হরপ্পা সভ্যতা

হরপ্পা সভ্যতায় তাম্রের ব্যবহারের চার রকম প্রকারভেদ দেখা যায়—গন্ধকের উপাদানসহ অপরিশোধিত তাম্র, আর্সেনিক ও অ্যান্টিমনি উপাদানের সাধারণ লক্ষণসহ পরিশুদ্ধ তাম্র, দুই থেকে পাঁচ শতাংশ আর্সেনিকের উপাদানসহ সাধারণ ব্যবহৃত তাম্র, এবং ব্রোঞ্জ যেখানে টিনের খাদের পরিমাণ এগারো থেকে তেরো শতাংশ। হরপ্পায় কলস জাতীয় পাত্রাদি মূলত ধাতু পিটিয়ে তৈরি করা হত, তবে ব্রোঞ্জের খেলনা, মূর্তি প্রভৃতির ক্ষেত্রে ছাঁচে ঢালাই করার প্রথাই চালু ছিল। হরপ্পা সভ্যতায় নানা ধরনের স্বর্ণালঙ্কার ও রৌপ্যের সামগ্রী পাওয়া গেছে। এই সোনা হালকা রঙের কিছুটা রৌপ্য মিশ্রিত। সোনা বা রূপার কাজের ক্ষেত্রে বর্তমান স্বর্ণকারদের অনুসৃত পদ্ধতিই কার্যকর ছিল। ঝকমকে পাথরের অলঙ্কারের কিছু নিদর্শন হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো উভয় নগর থেকেই পাওয়া গেছে। অলঙ্কারে ব্যবহৃত আধা-দামী পাথরের মধ্যে পান্না, নীলকান্ত, ল্যাপিস-লাজুলি, জেড, অকীক, জ্যাসপার, প্লাসমা প্রভৃতি

উল্লেখযোগ্য যেগুলি হার বা মালার দানা হিসাবে ব্যবহৃত হত। তামা বা ব্রোঞ্জ নির্মিত দর্পণ ও ক্ষুর, হাতির দাঁতের নির্মিত চিরুনি প্রভৃতিরও নিদর্শন পাওয়া গেছে। কাপড় বোনার যে প্রচলন ছিল তা প্রাপ্ত কয়েকটি মাকু থেকেই বোঝা যায়। নানা আকারের মৃৎপাত্রের পরিচয় পাওয়া গেছে, চক্রনির্মিত, সচরাচর লালরঙের কাদায় তৈরি, বর্ডার দেওয়া খুবই সাধারণ ধরনের। চিত্রিত মৃৎপাত্রের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল কালো রঙের ব্যবহার ছিল এবং সেগুলি জ্যামিতিক নকশা বা পশুপাখির চিত্র বহন করত। শিল্পগত নিদর্শন হিসাবে মূর্তি, সিল, তাবিজ ও নানাপ্রকার ক্ষুদ্র সামগ্রীর উল্লেখ করা যায়। মৃন্ময় মূর্তিগুলি পোড়ামাটির। বাতিদান, প্রদীপ, চেয়ার, চৌকি, টুল, মাদুর, খেলনা, গরুর গাড়ি, মার্বেল, পাথরের বল, পাশা, ধাতব ছুঁচ, করাত, ছুরি, বড়শি প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া গেছে। তামা অথবা ব্রোঞ্জের তৈরি কুড়াল, বর্শা, ছোরা, তীর, গাদা, তরবারি, দাঁতালো করাত প্রভৃতি হাতিয়ারের নিদর্শন পাওয়া গেছে। পাথর একেবারে পরিত্যক্ত হয়নি, বরং চার্ট পাথরের কলাশিল্পে বিশেষ বিকাশ ঘটে।

৩.১.২ হরপ্পা-উত্তর সংস্কৃতিসমূহ

অন্ধ্র ও কর্ণাটকের কৃষ্ণা ও কাবেরী উপত্যকার নবাশ্মীয়-তাম্রাশ্মীয় (২০০০-১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) সংস্কৃতিসমূহের প্রথম পর্যায়ে প্রধানত ভূমিতে ব্যবহারের উপযোগী মসৃণ কুঠার ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক আয়ুধ, চার্ট ও কোয়ার্টজ নির্মিত ক্ষুদ্রাশ্ম, অস্থিনির্মিত হাতিয়ার, ফলা-শিল্প (ব্যাপক বিকাশ অন্ধ্র ও কর্ণাটকের সঙ্গনকল্লু, ব্রহ্মগিরি ও পিকলিহালে), বিভিন্ন ধরনের হস্তনির্মিত এবং প্রধানত ধূসর বর্ণের মৃৎশিল্প (পিকলিহালে পাঁচ ধরনের, সঙ্গনকল্লু, ব্রহ্মগিরি ও মাস্কিতে তিন ধরনের), কাঠের খুটিওয়ালা চালাঘর, কিছু পোড়ামাটির বৃষমূর্তি, প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে, আনুমানিক ১৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পর থেকে, উপযুক্ত এবং দক্ষিণী কেন্দ্রসমূহে তাম্রনির্মিত আয়ুধ ও সামগ্রী পাওয়া গেছে। গুজরাতের তাম্রাশ্মীয় বসতিসমূহে তাম্র ও ব্রোঞ্জের সামগ্রী, আধা-দামী পাথরের পুঁতি, পোড়ামাটির খেলনা এবং উজ্জ্বল লাল এবং কালো-ও-লাল বর্ণের পাত্রাদি পাওয়া গেছে। হরপ্পা-উত্তর বানাস উপত্যকার আহাড় সংস্কৃতিতে তাম্রনির্মিত হাতিয়ার ও উপকরণের প্রাচুর্য দেখা যায়। এখানে সাত ধরনের মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে, প্রধান ধরনটি হচ্ছে কালো-ও-লাল, সাদা চিত্রণসহ। উভয় অঞ্চলেই বিশিষ্ট গৃহনির্মাণশিল্প ও বয়নশিল্পের বিকাশ দেখা যায়। মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতিসমূহে পূর্বোক্ত ধরনের ধাতব, গৃহনির্মাণগত এবং বয়নসংক্রান্ত কারিগরির নিদর্শন পাওয়া যায়। মধ্যপ্রদেশের কায়থ প্রত্নক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্তরে যে মৃৎশিল্পের নমুনা পাওয়া গেছে তা মালব ও জোরওয়ে ধরন নামে পরিচিত। জোরওয়ে আহমদনগর জেলায় অবস্থিত। নাবডাটোলি তৃতীয় সংস্তরে জোরওয়ে ধরনের মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে, যেগুলি চক্রনির্মিত, কালো রঙের সামান্য অলঙ্করণসহ সাল রঙ বিশিষ্ট। জোরওয়ে নেভাসা, দাইমাবাদ, চন্দোলি, সোনেগাঁও, ইনামগাঁও, বহুরূপ প্রভৃতি তাম্রাশ্মীয় প্রত্নক্ষেত্রগুলি মহারাষ্ট্রের পশ্চম জেলাগুলিতে অবস্থিত এবং প্রকাশ ও বহল পশ্চিমে বহমান তাপা নদীর উপত্যকায় অবস্থিত। এগুলি সামীপ্যের কারণে মধ্যপ্রদেশের তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতিসমূহের সদৃশ। নেভাসা, ইনামগাঁও ও চন্দোলিতে তাঁতশিল্পের অস্তিত্ব দেখা যায়। কার্পাস ছাড়াও রেশমের বস্ত্র উৎপাদিত যে হত তারও প্রমাণ আছে। ১১০০ থেকে ৪৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পাঞ্জাব, রাজস্থান ও গঙ্গা-যমুনা-দেয়াব অঞ্চলে গড়ে ওঠা চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতির সাথে লৌহনির্মিত উপকরণ পাওয়া গেছে। অত্রাঞ্জিখেরা, নোহ, অহিচ্ছত্র, হস্তিনাপুর প্রভৃতি প্রত্নক্ষেত্র থেকে লোহার কুঠার, দোরা, খুরপি, বাণফলক, বঁড়শি প্রভৃতি পাওয়া গেছে। গাঙ্গেয় পূর্বোত্তরাংশে গড়ে ওঠা উত্তরের কৃষ্ণমসৃণ মৃৎপাত্র সংস্কৃতির সাথে লৌহনির্মিত

সামগ্রীর সঙ্গে বিশেষ ধরনের মৃৎশিল্পের সংযোগ ঘটেছে। একথা উপদ্বীপীয় ভারতের ক্ষেত্রেও সত্য। এখানকার মহাশ্মীয় সমাধিগুলিতে লৌহনির্মিত হাতিয়ার ও উপকরণ পাওয়া গেছে। দূরবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের সমাধিতেও সমজাতীয় উপকরণ দেখা যায়। সম্ভবত লৌহনির্মিত এই সকল উপকরণ একটি বিশেষ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে তৈরি হত এবং সেখান থেকে সমাধিতে অর্পণ করার উদ্দেশ্যে সামগ্রীগুলিকে রপ্তানি করা হত।

৩.১.৩ বৈদিক যুগের কারিগরি

বৈদিক সাহিত্যে অসংখ্য বৃত্তিজীবী মানুষের উল্লেখ আছে, এবং এ-সকল পেশাদার গোষ্ঠীই পরবর্তীকালে বিভিন্ন মর্যাদার জাতিতে রূপান্তরিত হয়। *ঋগ্বেদ*-এ সূত্রদর, তুষ্টা বা বিশেষ ধরনের সূত্রধর, কর্মার বা কর্মকার, চর্মন্ন বা চর্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতির উল্লেখ আছে। *অথর্ববেদ*-এ (৩/৫/৬-৭) রথকার ও কর্মারের উল্লেখ আছে। *বাজসনেয়* (১৬/২৭), *কাঠক* (১৭/১৩) এবং *তৈত্তিরীয় সংহিতা*-য় কর্মার, রথকার, তক্ষণ (যারা কাঠের উপর কারুকার্য করে), কুলাল (কুম্ভকার), ধন্বকৃৎ (ধনু প্রস্তুতকারক) প্রভৃতির উল্লেখ আছে। কর্মার ও রথকারদের মনীষিন্ন আখ্যা দেওয়া হয়েছে যে থেকে মনে হয় তাদের কুশলী কারিগর মনে করা হত। *যজুর্বেদ*-এর শতরুদ্রীয় অংশে সুনির্দিষ্ট বৃত্তিজীবী হিসাবে কুলাল, রথকার, তক্ষণ, কর্মার, মণিকার, ইষুকার-ধন্বকার-জ্যাকার (ধনু ও বাণ নির্মাতা), রজ্জুসর্গ (রজ্জু প্রস্তুতকারী), সুরাকার, অয়স্তাপ (ঢালাইকর), বিদলকার) ধাতুর উপর কারুকার্যকরী, কন্টককার প্রভৃতি উল্লিখিত হয়েছে।

অয়স্কার বা কর্মকারদের কথা *ঋগ্বেদ*-এ বলা হয়েছে যারা বিভিন্ন ধাতব উপকরণ নির্মাণে পারদর্শী ছিল। ঋগ্বেদ-এ অয়স বলতে ঠিক কোন্ ধাতু বুঝিয়েছে তা বলা শক্ত, লোহা বা ব্রোঞ্জ দুই-ই হতে পারে। *বাজসনেয় সংহিতা*-এ (১৮/১৩) অয়সকে ছয়টি ধাতুর একটি বলে উল্লেখ করা হয়েছে, বাকী পাঁচটি যথাক্রমে হিরণ্য, শ্যাম, লোহা, সীম ও ত্রপু। এগুলির মধ্যে হিরণ্য অবশ্যই সোগ, সীম, সীসা এবং ত্রপু টিন। *অথর্ববেদ*-এ (১১/৩/১ ইত্যাদি) এবং *মৈত্রায়ণী সংহিতা*-এ (৪/২৯) অয়সকে শ্যাম ও লোহিত এই দুটি ভাগে ভাগ করকা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথমটি লৌহ এবং দ্বিতীয়টি তাম্রা বা ব্রোঞ্জের দ্যোতক। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ (৫/১/৪/২) অয়স ও লোহায়সের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। কর্মার বা কর্মকারদের ধমাতৃ হিসাবে ঋগ্বেদ-এ (৫/৯/৫) উল্লেখ করা হয়েছে যে, শব্দটির অর্থ ধাতুর তরলীকরণ। ধাতব পাত্রে (ঘর্ম অয়স্ময়) অগ্নিতে ধাতু গলিয়ে তরল করে ছাঁচে ঢেলে তৈরি করা হত তার উল্লেখ *ঋগ্বেদ*-এ (৫/৩০/১৫) আছে। লোহা গলাবার জন্য চর্মনির্মিত হাপরের কথাও জানা যায়। সোমপানের পাত্র গলানো ধাতু (অয়োহত) পিটিয়ে প্রস্তুত করার কথাও *ঋগ্বেদ*-এ বলা হয়েছে। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ কৌলালচক্র বা কুমোরের চাকার উল্লেখ আছে যা থেকে বুঝতে অসুবিধা নেই যে চক্রের সাহায্যে মৃৎপাত্র গড়ার যে পদ্ধতি বর্তমান অনুসৃত হয় সেই একক পদ্ধতি সে যুগেও বহাল ছিল। ইষুকার বা ইষকৃৎ বলতে বাণ প্রস্তুতকারী এবং ধন্বকৃৎ বলতে ধনু প্রস্তুতকারী বোঝায়। চর্মনির্মিত ধনুর ছিল বা জ্যা যারা প্রস্তুত করত তাদের জ্যাকার বলে অভিহিত করা হত। বাণ প্রস্তুত বিষয়টি খুব সাধারণ ছিল না, যার জন্য পেশাদারী দক্ষতার প্রয়োজন ছিল। চর্মন্ন বলতে বোঝায় চামড়ার কারিগর। তাদের কর্মপদ্ধতি বিশেষ করে চামড়াকে ঋতু-সহ বা ট্যান করার পদ্ধতি 'ম্লা' বলে কথিত হয়েছে। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ শঙ্কুর সাহায্যে চামড়াকে কাজের উপযোগী করে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহে রথকারদের একটি সুনির্দিষ্ট জাতি বলে গণ্য করা হয়েছে। তাদের বিশেষ সামাজিক মর্যাদা ছিল, কেননা রথনির্মাণের কাজ প্রযুক্তিবিদ বা ইঞ্জিনিয়ারের কাজ। বৈদিকযুগের রথ

সচরাচর দ্বিচক্র নির্ভর হত। চাকার বেষ্টনী বা বিমকে বলা হত পবি, মধ্যস্থ গোলাকার ভরকেন্দ্রটিকে বলা হত প্রধি, ভরকেন্দ্রের মধ্যবর্তী গর্তটিকে বলা হত নভ্য এবং যে গোলাকার দণ্ড দিয়ে দুটি চক্রের নভ্যকে জোড়া হত তাকে বলা হত অক্ষ। এই অক্ষ তৈরি হত অরটু নামক কাঠ দিয়ে। অক্ষের দুই প্রান্তের উপর ভর দিয়ে কোমা বা রথের উপরের অংশ নির্মিত হত। আসলে রথের বাহ্যিক আচরণ বা কারুকার্যের চেয়ে চেসিস (শ্যাসি) বা মূল কাঠামোটা গড়ে তুলতে রীতিমত দক্ষতার প্রয়োজন হত। বিশেষ করে অক্ষদণ্ড সংস্থাপনের ক্ষেত্রে ভুল হলে চলন্ত অবস্থায় রথের ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। এই কারণে রথকারদের কাজের গুরুত্ব ছিল খুবই বেশি। *ঋগ্বেদ* (১০/২৬/৫) এবং *অথর্ববেদ*-এর (১৯/৪১/২) বক্তব্য অনুযায়ী প্রধানত সূক্ষ্ম কাজের জন্য তক্ষণদের প্রয়োজন হত। তক্ষণদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মধ্যে আমরা কুলিশ, পরশু ও ভূরিজের উল্লেখ পাই (*ঋগ্বেদ*-এ ৩/২/১, *কাঠক সংহিতা* ১২/১০) যা বাটালি, ভোমর প্রভৃতির পরিচায়ক। কাঠের কারিগরদের বোঝানোর জন্য *ঋগ্বেদ*-এ ত্বষ্টা নামক একটি বিশেষ পরিভাষা কখনও কখনও ব্যবহার করা হয়েছে।

৩.১.৪ পরবর্তী পর্যায়সমূহ

কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*-এ খনি ও খনিজদ্রব্য তথা ধাতুশিল্পের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকে এই সকল ক্ষেত্রের শ্রমিক ও কারিগরদের ব্যাপক অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হয় যারা আকরাধ্যক্ষ, লোহাধ্যক্ষ, খন্যধ্যক্ষ, রূপিক, রূপদর্শক ও লবণাধ্যক্ষের অধীনে কর্মরত থাকত। এছাড়া বস্ত্রশিল্প ও সুরাশিল্পের কথাও কৌটিল্য বলেছেন। লেখসমূহ, বৌদ্ধগ্রন্থ এবং বৈদেশিক বিবরণসমূহে সূত্রধর বা বর্ধকি (পালি ঃ বড়চকি), রসকার বা বাঁশের কারিগর, কৌলিক বা তাঁত, রঙ্গাকার (যারা বিভিন্ন রঙ দিয়ে কাপড় ছাপায়) গন্ধিক বা সুবাসক অর্থাৎ সুগন্ধ প্রস্তুতকারী, মালাকার, দন্তকার (যারা হাতির দাঁতের কাজ করত), মনিকার, সুবর্ণকার, ডুবুরি ও মুক্তাচাষী প্রভৃতি। বৈদেশিক বিবরণসমূহে পণ্য ও পণ্যকরের পেশার কথা আছে, কিন্তু বর্ধকী, কৌলিক প্রভৃতি নামের উৎসদেশীয় রচনা ও লেখমালা।

ধাতুর কারিগরদের মধ্যে গুপ্তযুগে কর্মকারের গুরুত্ব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। কর্মকার কখনও কখনও সমকালীন সাহিত্যে লোহাকার নামে অভিহিত হয়েছে। বকাটক লেখে কাংসকারক ও সুবর্ণকারক নামক দুটি গ্রামের উল্লেখ আছে যেগুলি অবশ্যই কাঁসারি ও সোনার কারিগরদের অধ্যুষিত গ্রাম ছিল। ৫৯২ খ্রিস্টাব্দের গুজরাত থেকে পাওয়া একটি তাম্রশাসনে কুম্ভকার ও কুম্ভকারদের তৈরি মাটির পাত্রের উল্লেখ আছে। বৈণ্যগুপ্তের গুণাইঘর তাম্রশাসনে বর্ধকি বা ছুতোরের উল্লেখ আছে। যন্ত্রবিদরা সম্ভবত বিলাল বলে অভিহিত হতেন। *অমরকোষ*-এ তন্তুবায়দের কথা আছে। ৫৯২ খ্রিস্টাব্দের বিষ্ণুষেণের শাসনে কল্লার বা সুরাপ্রস্তুতকারীদের কথা বলা হয়েছে।

আদি মধ্যযুগের সাহিত্যগত ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানসমূহ থেকে কার্পাস ও বস্ত্রশিল্পের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। সমকালীন চৈনিক রচনাসমূহ এবং আরব লেখকদের বর্ণনায় বস্ত্রোৎপাদনের প্রধান কেন্দ্রসমূহ, কোন কোন এলাকায় কী ধরনের কাপড় উৎপন্ন হয়, এবং বিভিন্ন বস্ত্র সম্পর্কে বিশদ তথ্য পাওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবেই তন্ত্রবায়রা তন্তুবায়রা একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শ্রেণী হয়ে উঠেছিলেন। তৈলিক বা তেলীয় উল্লেখ লেখমালায় প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। তৈলোৎপাদকদের চক্রিক এবং খানক আখ্যাও দেওয়া হয়েছে। রাজস্থানের অর্থুনা লেখে চিনি ও গুড়ের পৃথক কারিগরির কথা বলা হয়েছে। ধাতুর কারিগরি মৌর্যযুগ থেকে শুরু করে আদি মধ্যযুগ পর্যন্ত একটি বিশেষ মাত্রা লাভ করেছিল। অগণিত ধাতব দেবদেবীর মূর্তি এই প্রসঙ্গে বিশেষ সাক্ষ্য

দেয়। যাঁরা এই সকল মূর্তি গড়তেন তাঁরা ব্রোঞ্জ ঢালাই-এর মতো শক্ত কাজেও বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। লোহার কারিগরিও গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে রীতিমত বিকাশলাভ করেছিল। মেহেরৌলির লৌহস্তম্ভ (যেটি কুতবমিনারের চত্বরে অবস্থিত) এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। *যুক্তিকল্পতরু* গ্রন্থে বারাণসী, সৌরাষ্ট্র ও কলিঙ্গে তৈরি তলোয়ারের খ্যাতির কথা বলা হয়েছে।

৩.২ কারিগর ও পেশাদারি সংগঠনসমূহ ঃ শ্রেণী, সঙ্ঘ ইত্যাদি

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকেই কারিগর ও বৃত্তিজীবীদের নানা সংগঠন গড়ে ওঠে যেগুলির সাথে মধ্যযুগের ইউরোপীয় গিল্ড ব্যবস্থার সাদৃশ্য আছে। *বৌধায়ন ধর্মসূত্র*, পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ী* ও পালি সাহিত্যে এগুলি শ্রেণী, সঙ্ঘ, গণ, পূগ সমূহ প্রভৃতি নামে পরিচিত। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে যে এই সংগঠনগুলি বিশেষ গুরত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তা পালি সাহিত্য ও লেখসমূহ থেকে জানা যায়। জাতক কাহিনীসমূহে শিল্পের স্থানীয়তার (লোকালাইজেশন) পরিচয় পাওয়া যায় যেমন, কর্মকারদের গ্রাম, বর্ধকীদের গ্রাম, উৎপল-বীথি (যে রাস্তার দুধারে পদ্মফুল বিক্রয় হত) ইত্যাদি। শ্রেণী বা সঙ্ঘের প্রধান হিসাবে জেটঠক (জেষ্ঠক) বা পমুখ (প্রমুখ)-এর উল্লেখ পাওয়া যায়, ধর্মশাস্ত্রসমূহে যাদের কার্যচিন্তক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এরা সদ্বংশজাত, কর্মকুশল, বিশ্বস্ত, ন্যায়পরায়ণ ও সৎ হবেন এই রকম আশা করা হত। শ্রেণী বা সঙ্ঘের সদস্যবর্গের জন্য নিয়মাবলীর কথা ধর্মশাস্ত্রসমূহে বর্ণিত হয়েছে। সঙ্ঘভুক্ত কারিগরদের উপার্জিত সম্পদ সমভাবে বণ্টিত হত। কোন সদস্য সঙ্ঘের স্বার্থবিরোধী কাজ করলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হত। সদস্যবৃন্দের সাথে নেতাদের বিরোধ ঘটলে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজন দেখা দিত। এই সঙ্ঘ বা শ্রেণীসমূহ যে কতদূর প্রভাবশালী ছিল এবং সমাজ তথা রাষ্ট্রের কাছে কী ধরনের শ্রদ্ধা পেত তার প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে স্মৃতিশাস্ত্রে এমন বিধান দেওয়া হয়েছে। সঙ্ঘ বা শ্রেণী নিজেদের জন্য যে আইন প্রণয়ন করবে সেই আইনের বৈধতা রাজা মেনে নেবেন এবং তদনুসারে বিচার করবেন।

লেখসমূহের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে কারিগরি বৃত্তিসমূহকে সুসংহত করা ছাড়াও বহুক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের মতো কাজ করত। শক ক্ষত্রপ নহপানের নাসিক লেখে তন্তুবায়দের দুটি সঙ্ঘ বা শ্রেণীর (কৌলিক নিকায়) উল্লেখ করা হয়েছে, প্রথমটিতে নহপানের জামাতা দুই হাজার কার্ষাপণ গচ্ছিত রাখেন। এই শ্রেণীটি ওই মূল অর্থের উপর বার্ষিক ১২ শতাংশ হারে সুদ দিত। দ্বিতীয়টিতে তিনি একহাজার কার্ষাপণ জমা রাখেন। এরা সুদ দিত বার্ষিক ৯ শতাংশ হারে। এই সুদ বা বৃদ্ধি থেকে আয় হত ৩৩০ কার্ষাপণ, যা দিয়ে নিকটস্থ বৌদ্ধসঙ্ঘের ভিক্ষুদের ভোজনের ক্ষেত্রে সামান্য সাহায্য করা হত। কুষাণরাজ হুবিষ্কের আমলে মথুরাতে আটাকলের কারিগরদের শ্রেণীতে এক রাজকর্মচারী ৫৫০ পুরাণ পরিমাণ আমানত গচ্ছিত রাখেন যা থেকে প্রাপ্য সুদ একটি মন্দিরের সেবায় লাগত। নাগার্জুনিকোন্ডায় অনুরূপ ব্যবস্থায় ৩৩০ কার্ষাপণ অর্থ চারটি শ্রেণীর দায়িত্বে গচ্ছিত রাখা হয়েছিল। নগদ অর্থ ছাড়াও স্থাবর সম্পত্তি, ক্ষেত্র, বৃক্ষাদিও আমানত হিসাবে রাখা হত এবং সঙ্ঘগুলি এ-সকল ক্ষেত্রে অছির ভূমিকা গ্রহণ করত। বহুক্ষেত্রে বরাবরের জন্য অর্থ জমা রাখা হত যে ব্যবস্থা অক্ষরনীবি নামে পরিচিত। আমানতকারীর মনে এই বিশ্বাস থাকত যে তাঁর অবর্তমানেও তাঁর গচ্ছিত অর্থের সুদ, যে উদ্দেশ্যে তিনি অর্থ গচ্ছিত রেখেছিলেন, সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ব্যবহৃত হবে। এথেকে বোঝা যায় জনজীবনে এই শ্রেণী বা সঙ্ঘসমূহ কতটা বিশ্বস্ততা অর্জন করেছিল।

পরবর্তীকালের লেখসমূহে অবশ্য শ্রেণী বা সঙ্ঘ সংক্রান্ত তথ্য কিছুটা কম। প্রাচীন মালবের দশপুর বা আধুনিক মান্দাসোর থেকে কুমারগুপ্ত ও বন্ধুবর্মার সময় উৎকীর্ণ একটি লেখে গুজরাত থেকে মালবে আগত একদল দক্ষ রেশমশিল্পীর কথা বলা হয়েছে। এই লেখটি অন্য একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রাগুক্ত শিল্পীরা শুধু দেশত্যাগই করেননি, তাঁদের মধ্যে অনেকে পেশাও বদলেছিলেন। স্কন্দগুপ্তের ইন্দোর তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে ৪৬৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তৈলিকদের একটি শ্রেণীতে পূর্ববর্তী যুগের মতো চিরকালীন ভিত্তিতে অর্থলগ্নী করা হয়েছিল যার সুদ থেকে স্থানীয় সূর্যমন্দিরে দীপ প্রজ্জ্বলনের ব্যয় নির্বাহ হবে। গোয়ালিয়র থেকে ৮৭৫-৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রাপ্ত দুটি লেখে অন্তত কুড়িজন তৈলিক প্রধান (তৈলিকমহত্তর) এবং চোদ্দোজন মালাকার গোষ্ঠীপ্রধানের উল্লেখ আছে। এছাড়া সুরা প্রস্তুতকারীদের, পরাতর কাটার কারিগরদের শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল সংগঠন নিজস্ব সিলমোহর ব্যবহার করত। শুধুমাত্র বৈশালী থেকেই ২৭০টির মতো সিলমোহর ও সিলমোহরের ছাঁচ পাওয়া গেছে যেগুলিতে 'শ্রেষ্ঠী-সার্থবহ কুলিক-নিগম' এই জাতীয় বাক্যাংশ উৎকীর্ণ আছে। 'নিগম' শব্দটি সঙ্ঘ ও শ্রেণীর সমার্থক। কুলিক নিগম বলতে কারিগরদের সংগঠন বোঝায়, আর প্রথম কুলিক বলতে কারিগরদের. প্রতিনিধিকে বোঝায়। শেষোক্ত পদাধিকারী শাসনের ব্যাপারে বিষয়পতি বা জেলাশাসককে বেসরকারি ব্যক্তি হিসাবে সহায়তা করতেন।

গুপ্তযুগের স্মৃতিশাস্ত্রসমূহে বলা হয়েছে যে শ্রেণী বা সঙ্ঘ কর্তৃক সংস্থাপিত বিধিবিধানের দ্বারাই কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সদস্যের অপরাধের বিচার রাজা করবেন। শ্রেণীর নিয়ম ও প্রথাকে *নারদ* ও *বৃহস্পতি* স্মৃতিতে আইনের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। রাজা শ্রেণীর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন না এই রীতির ব্যতিক্রম তখনই হতে পারে যদি শ্রেণীর কর্তাব্যক্তিরা শ্রেণীর সদস্যদের স্বার্থবিরোধী কাজ করেন। শ্রেণীর আপত্তি সত্ত্বেও যদি কোন সদস্যের কাজের দ্বারা শ্রেণীর সম্পদ হানি হয়, সেক্ষেত্রে ওই সদস্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন। শ্রেণীর অন্তর্গত সদস্যেরা যখন কোন কাজ নেবেন তখন তাঁরা তা সমভাবেই নেবেন। শ্রেণীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস থাকা আবশ্যিক। বৃহস্পতির মতে যিনি শ্রেণীর সদস্য হতে চাইবেন তাঁকে 'কোষ' বা চারিত্রিক শুদ্ধির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে, তাঁকে 'লেখক্রিয়া' বা শ্রেণীর নিয়মাবলী মানার অঙ্গীকার পত্র দিতে হবে এবং একজন 'মধ্যস্থ' তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলে ঘোষণা করবেন। আদি-মধ্যযুগে এই সকল শ্রেণী বা সঙ্ঘের গুরুত্ব কিছু কমে যায়। মনুস্মৃতির মেধাতিথি বিরচিত ভাষ্যে সদস্যদের উপর শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ হ্রাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আদি-মধ্যযুগে ও তৎপরবর্তীকালে বিভিন্ন শাস্ত্রে শ্রেণীকে জাতির অভিধা দেওয়া হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে, জাতি ও শ্রেণী সমার্থক হয়ে গেছে। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে রচিত *বৃহদ্ধর্ম* ও *ব্রহ্মবৈবর্ত* পুরাণে শ্রেণীগুলিকে সংকর বা মিশ্রজাতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে, যে সকল শ্রেণী উত্তম ধরনের অর্থাৎ বস্ত্র, হিরণ্য প্রভৃতি পণ্য উৎপাদন করত তারা শুদ্ধ শ্রেণীরূপে পরিগণিত হত। পণ্যের প্রকৃতি, মূল্যবান ও পবিত্রতার মাত্রাভেদে শ্রেণীর সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা নির্ণীত হত।

৩.৩ বণিজ্য ও নগরকেন্দ্রিকতা

৩.৩.১ হরপ্পা সভ্যতা

হরপ্পা সভ্যতা ভারত ইতিহাসের প্রথম নগরায়ণের দৃষ্টান্ত। হরপ্পার নগরাশ্রয়ী অর্থনৈতিক জীবনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হল তার বাণিজ্য। হরপ্পীয় কারিগরদের বিভিন্ন ধরনের ধাতুর ব্যবহার থেকে প্রতিপন্ন হয়

যে সেখানে নানা স্থান থেকে ধাতু ও মূল্যবান প্রস্তর আমদানি করা হত। মেসোপটেমিয়ার উর থেকে প্রাপ্ত চব্বিশটি হরপ্পীয় সিল সিন্ধু উপত্যকা ও টাইগ্রসি-ইউফ্রেটিস উপত্যকার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়। অক্কাদের রাজা সার্গনের লেখে উল্লিখিত মেলুহা অঞ্চলকে পণ্ডিতেরা নিম্ন সিন্ধু উপত্যকার সাথে অভিন্ন মনে করেন। এখান থেকে পশ্চিম এশিয়ায় স্বর্ণ-রৌপ্য, ল্যাপিস লাজুলি, ময়ূর ওকাঠ রপ্তানি করা হত। সমুদ্র বাণিজ্যের অপর নিদর্শন পাওয়া যায় গুজরাতের লোথালে। এখানে একটি পোতাশ্রয় ছাড়াও বোতামের আকারের সিলমোহর পাওয়া গেছে, পারস্য উপসাগরীয় এলাকায় যেগুলির চল খুব বেশি ছিল। বাণিজ্যিক লেনদেন চলার মাধ্যমে সম্ভভবত সিলমোহরগুলি পারস্য উপসাগরীয় এলাকা থেকে লোথালে আসে। দূর দূর এলাকার সঙ্গে ব্যবসা বজায় রাখার জন্য হরপ্পীয় নগরগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই উন্নত ছিল। হরপ্পীয় অবশেষসমূহ থেকে ওজনের যে সকল বাটখারা ও মাপের যে সকল দণ্ড পাওয়া গেছে, উভয় ক্ষেত্রেই একটি নির্দিষ্ট মান বজায় রাখার জন্য হরপ্পীয়দের প্রয়াস লক্ষ্যণীয়।

৩.৩.২ বৈদিক যুগ

যদিও ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা আছে যে বৈদিক সভ্যতা একেবারেই গ্রামীণ, একটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে বৈদিক সভ্যতার ব্যপ্তি বহুশতকের, এবং বৈদিক সাহিত্যের প্রকৃতি মূলত ধর্মীয় হওয়ার জন্য ব্যবসা- বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্যাবলী এখানে সীমিত। তবে বৈদিক সাহিত্যে যে সকল পেশা বা বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকে বুঝতে অসুবিধা নেই যে বৈদিক সমাজে সচলতা যথেষ্টই ছিল, এবং ভাল ধরনের শিল্প-বাণিজ্যের পরিকাঠামো না থাকলে বৈদিক সাহিত্যে এত বিচিত্র পেশাদারিদের উল্লেখ থাকত না। ব্যবসায় ক্ষেত্রে দ্রব্য বিনিময় প্রথা চালু ছিল। *ঋগ্বেদ*-এর সাক্ষ্য অনুযায়ী জানা যায় যে গাভীই ছিল বিনিময়ের প্রধান মাধ্যম। সোনা, রূপা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু অবশ্যই সম্পদ হিসাবে গণ্য হত এবং তা সংগ্রহের পর্যাপ্ত চেষ্টা হত। *ঋগ্বেদ*-এ 'নিষ্ক' শব্দটির প্রয়োগ সম্ভবত 'মুদ্রা' অর্থে হয়নি। সেখানে (১/১১৬/২) শত নিষ্কের উল্লেখ বোধহয় শত সুবর্ণমুদ্রার পরিবর্তে সুবর্ণখণ্ডকে বুঝিয়েছে। *ঋগ্বেদ*-এ (৩/১২/৩) বাণিজ্যে শতধন লাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। দূরবর্তী স্থানে এমনকী সমুদ্রপথেও বাণিজ্যের ইঙ্গিত আছে (১/৫৬/২)। যদিও *ঋগ্বেদ*-এ (১০/১৩৬/৫) পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের উল্লেখ আছে এবং কোথাও কোথাও সামুদ্রিক সম্পদের কথাও বলা হয়েছে, তৎসত্ত্বেও বলা যায় যে বৈদিক মানুষেরা, পরবর্তীকালের মুঘলদের মতোই, একান্তই স্থলচর মানুষ ছিল।

পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহের যুগে অবশ্য বাণিজ্যিক বিকাশ ভালরকম দেখা যায় যেখানে বাণিজ্যের দ্বারা সমৃদ্ধ বৈশ্যদের শ্রেষ্ঠী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মুদ্রা অর্থনীতির বিকাশ এযুগে কতদূর হয়েছি বলা শক্ত। *শতপথ ব্রাহ্মণে* কুসীদজীবীদের উল্লেখ আছে যারা নগদ মুদ্রায় না হোক, পণ্য এমনকী ধান্য বা গমের মতো কৃষিজ পণ্যও ধার দিত, এবং লাভের একটা অংশ সুদ হিসাবে গ্রহণ করত। ওজন হিসাবে 'মান' শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। সর্বনিম্ন মান একটি কৃষ্মল বা গুঞ্জফলের সমান। এই হিসাবে শতমান সম্ভবত শত কৃষ্মলের সমান ওজনের সুবর্ণখণ্ড ছিল। মনে হয় এই শতমানই পরবর্তীকালে নিষ্ক বা মুদ্রা হিসাবে পরিচিত হয়েছিল। পণ্যসিদ্ধি নামক একটি যজ্ঞের পরিচয় গৃহ্যসূত্রসমূহে পাওয়া যায় যার উদ্দেশ্য বাণিজ্যে সাফল্য লাভ। বাণিজ্যের সামগ্রী হিসাবে বংশ, কূটজ, ইক্ষু, মদ্য, কট (মাদুর), পশুচর্ম ও নানা ধরনের বস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে

মধ্যযুগের ইউরোপের মতোই যাজক (ব্রাহ্মণ) ও সম্ভ্রান্ত (ক্ষত্রিয়) শ্রেণীর সামাজিক মর্যাদা খুবই উচ্চে ছিল। তুলনায় বাণিজ্যজীবী জাতি হিসাবে বৈশ্যদের সামাজিক অবস্থান খুব সম্মানের ছিল না।

৩.৩.৩ দ্বিতীয় নগরায়ণের যুগ

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে বাণিজ্যের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির বদল হয়। বুদ্ধ ও মহাবীর উভয়েই উৎপাদক ও বণিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। পালি বৌদ্ধ সাহিত্যে বাণিজ্যের প্রসঙ্গ বারবার এসেছে, পক্ষান্তরে প্রাকৃত জৈন গল্পসাহিত্যের প্রসিদ্ধ সঙ্কলনসমূহ ভ্রাম্যমাণ বণিকদের কথিত বিনোদনমূলক কাহিনীর সঙ্কলন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই সকল কথা-সাহিত্যমূলক সঙ্কলন উৎসর্গ করা হয়েছে কোন জিন বা তীর্থঙ্করের নামে নয়, ধনাধিপতি কুবেরের নামে। ধনী বণিক পালি সাহিত্যে সেট্‌ঠি বা শ্রেষ্ঠী নামে পরিচিত। ছোট দোকানদার (পাপনিক) ও ভ্রাম্যমাণ বণিকদের কথাও বলা হয়েছে, শেষোক্তরা সার্থবাহ নামে পরিচিত ছিলেন। *দীর্ঘনিকায়* গ্রন্থে হাজার গো-শকট নিয়ে সার্থবাহকদের মরু অঞ্চল পার হওয়ার বর্ণনা আছে। পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ী*-তে গন্ধার, মদ্র প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলের বাণিজ্য ও নানা ধরনের পশুবিক্রেতার উল্লেখ আছে। সমুদ্দবাণিজ্জ বা সমুদ্র বাণিজ্যের উল্লেখ পালি সাহিত্যে থাকলেও এবিষয়ে বিশদ তথ্য দেওয়া নেই। বৌদ্ধধর্ম বণিকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষক হওয়ার কারণে এই ধর্মে সুদ গ্রহণ ও দাস রাখা নিন্দনীয় নয়। ধাতব মুদ্রার প্রচলন খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে পাকাপাকি ঘটেছিল। এই যুগের 'অঙ্ক-চিহ্নিত মুদ্র' বা পাঞ্চ-মার্কড-কয়েন বিপুল পরিমাণে পাওয়া গেছে। এগুলি বেসরকারি উদ্যোগে প্রবর্তিত ধাতবখণ্ড, মোটামুটি একই রকম ওজনের ভেজালহীন ধাতুর তৈরি এবং ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন নকশা ছাপ দেওয়া।

দ্বিতীয় নগরায়ণের সূত্রপাত খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকেই। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির ফলে যে নতুন অর্থনৈতিক অবস্থার উদ্ভব হয় তারই ফলে মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকার অনেকগুলি নগরের আবির্ভাব ঘটে। দীর্ঘনিকায়ের *মহাপরিনির্ব্বাণ*-সুত্ত-এ সাক্ষ্য অনুযায়ী বুদ্ধের সমকালীন নগরের সংখ্যা ষাট। এগুলির মধ্যে ছয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল বারাণসী, কোশাম্বী, চম্পা, রাসগৃহ, শ্রাবন্তী ও কুশীনগর। পালি সাহিত্যে এই সকল নগরের বর্ণনা একান্তই প্রথাগত। এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে পরবর্তীকালের সুবিখ্যাত পাটলিপুত্র নগর এই তালিকায় নেই। মধ্য-গাঙ্গেয় উপত্যকায় নগরায়ণের কারণ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা ধরনের মত আছে। দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী ও রামশরণ শর্মার মতে যেহেতু কৃষির ব্যাপক উন্নতি ব্যতিরেকে নগরের বাসিন্দা ও তাদের উপজীবিকাগুলি টিকতে পারে না, যেহেতু নাগরিক জীবিকাগুলির অস্তিত্ব নির্ভর করে গ্রামের থেকে আসা উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের যথাযথ সরবরাহের উপর, সেইহেতু মধ্য-গাঙ্গেয় উপত্যকাতেও নগর গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত কৃষি উপাদান অপরিহার্য ছিল, যেক্ষেত্রে লোহার ক্রমবর্ধমান ব্যবহার, বিশেষ করে লাঙলের ফলায় লোহার ব্যবহার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু অমলানন্দ ঘোষ মনে করেন যে প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণ এত পর্যাপ্ত নয় যা দিয়ে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে কৃষিকাজে লৌহ ফলাযুক্ত লাঙলের ব্যাপক ব্যবহার প্রমাণ করা যাবে। তার মধ্যে তামার হাতিয়ার দিয়েও উদ্ভিদ ফলানো সম্ভব। এক্ষেত্রে কারিগরি কুশলতার চেয়েও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও সংগঠনের ভূমিকা ছিল। অবশ্য দুটি মতই অনুমানমূলক।

মৌর্য আমলে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে পাটলিপুত্র একটি বিশাল নগরে পরিণত হয়, যে নগরের বর্ণনা গ্রীক লেখকগণ দিয়েছেন। গাঙ্গেয় উপত্যকায় কৌশম্বীও ছিল একটি বড় নগর যার বাস্তব পরিচয় উৎখননের

ফলে পাওয়া গেছে। তক্ষশিলা মৌর্য আমলে উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্র রূপে যথেষ্ট গুরুত্বলাভ করে। তক্ষশিলার ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় সিরকপের ঢিবি খুঁড়ে পাওয়া গেছে। তক্ষশিলার নিকটেই ছিল পুষ্কলাবতী। চারসাদ্দা নামক স্থানে খননকার্যের দ্বারা এই শহরের পরিচয় পাওয়া গেছে। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ থেকে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে মথুরা নগরী গড়ে ওঠে। পতঞ্জলী তাঁর *মহাভাষ্য* গ্রন্থে মথুরাকে পাটলিপুত্র ও সাঙ্কাশ্যের চেয়ে উন্নত বলেছেন। মথুরা এবং মথুরার নিকবর্তী সংঘ-এ উৎখননের ফলে সমৃদ্ধি এবং অবক্ষয়, উভয়েরই চিত্র পাওয়া যায়। শক, পহ্লব ও কুষাণ আমলে মথুরার সমধিক উৎকর্ষ ঘটে। মৌর্য আমলে প্রাচীন বঙ্গাদেশে নগরায়ণের সূত্রপাত ঘটে। বগুড়া জেলার মহাস্থান থেকে মৌর্য ব্রাহ্মীতে রচিত একটি লেখের সাক্ষ্যে প্রাচীন পুণ্ড্রনগরের কথা জানা যায়, যে নগরের ধ্বংসাবশেষ রাও বাহাদুর কাশীনাথ দীক্ষিত আবিষ্কার করেন। দক্ষিণাপথে নেভাসা, টের ও সাতানিকোটাতে উৎখননের ফলে নগরজীবনের চাক্ষুষ রূপটি বোঝা যায়। কৃষ্ণা নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে অমরাবতী, ভোট্টিপ্রোলু, শালিহুণ্ডম, নাগার্জুনিকোণ্ডা প্রভৃতি অঞ্চলে উৎখননের ফলে নগরজীবনের অস্তিত্বের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। সুদূর দক্ষিণে মাদুরা ও কাবেরীপট্টিনম নগরদ্বয় খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় থেকে দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিশালভাবে গড়ে ওঠে। তামিল সাহিত্যে উভয় নগরের বিশদ বর্ণনা বর্তমান।

৩.৪ সামুদ্রিক বাণিজ্য ও বন্দরসমূহ

খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের মধ্যভাগে হিপ্পালাস কর্তৃক মৌসুমী বায়ুর গতিপ্রকৃতি আবিষ্কৃত হওয়ার পর বহির্দেশীয় নাবিক ও বণিকদের পক্ষে ভারতে আসার পথ সুগম হয়ে যায়। অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিক রচিত *পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সী* গ্রন্থে (এবং তৎসহ টলেমির ভূগোলে কিছুটা অবিন্যস্তভাবে) ভারতীয় উপকূলের প্রধান বন্দরগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। সিন্ধু নদের মোহনায় নদের সাতটি মুখের মধ্যে মাত্র মাঝেরটিই নাব্য ছিল যার উপর ছিল বারবারিকাম নামক প্রসিদ্ধ বন্দর। সেখান থেকে অনেকখানি দক্ষিণে নর্মদা মোহনায় ছিল তখনকার দিনের সবচেয়ে কর্মব্যস্ত বন্দর বারুগাজা, সংস্কৃত নাম ভৃগুকচ্ছ, প্রাকৃতে ভারুগচ্ছ, আধুনিক ব্রোচ। বারবারিকাম ও বারুগাজার মধ্যে গুজরাত উপকূলে টলেমি সুরাষ্ট্রিনি এবং মনোগ্লোসন (মানগোল) নামক দুটি বন্দরের উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি পরবর্তীকালের বিখ্যাত সুরাট। বারুগাজা বন্দরে জাহাজ সহজে ভিড়তে পারত না। তাই স্থানীয় মাঝিমাল্লারা ছোট ছোট জলযানের সাহায্যে পথ দেখিয়ে বড় জাহাজকে বন্দরে নিয়ে আসত। এই ব্যাপারে স্থানীয় শক শাসক ম্যামবানুস বা ন্যামবানুস (নহপান) খুবই উৎসাহ দিতেন এবং পণ্য তোলা-নামানো যাতে সহজে হয় তা দেখার জন্য বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত করতেন। শকদের মতো সাতবাহনবংশীয় রাজারাও এই বিষয়ে সজাগ ছিলেন। বিশাল পশ্চাৎভূমির সঙ্গে বারুগাজা বন্দরের চমৎকার বাণিজ্যিক সংযোগ ছিল।

বারুগাজার দক্ষিণে কোঙ্কণ উপকূলে পেরিপ্লাস-এ লেখক তিনটি বন্দরের উল্লেখ করেছেন—সুপ্পারা (বোম্বাই-এর নিকটবর্তী সোপারা), ক্যালিয়েনা (বর্তমান কল্যাণ) এবং সিমুল্লা (বোম্বাই থেকে ২৩ মাইল দক্ষিণে চৌল)। আরও দক্ষিণে কয়েকটি ছোট বন্দর ছিল, যথা—মণ্ডাগোরা (সম্ভবত বানকোট), পালিপাটমে (সম্ভবত দাভোল) মেলিজিগারা (জয়গড়), বাইজানটিয়াম (সম্ভব ভিজাদ্রুগ), টোগারাম (দেওগড়) এবং তুরান্নাবোয়াস (সম্ভবত মালভান)। কিন্তু এগুলি ভৃগুকচ্ছ বা কল্যাণের মতো গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কোঙ্কণ

ছাড়িয়ে মালাবার উপকূলের সবচেয়ে বিখ্যাত বন্দর ছিল মুজিরিস যার অবস্থান আধুনিক ক্রাঙ্গাগেরের কাছাকাছি। টলেমি এবং প্লিনিও মজিরিসের কথা বলেছেন। *তামিলসঙ্গম* সাহিত্যে এই বন্দর মুচিরিপত্তনম নামে পরিচিত এবং বলা হয়েছে যে বিদেশী জাহাজগুলি এখানে স্বর্ণমুদ্রা ভরে নিয়ে আসত এবং গোলমরিচে জাহাজ ভর্তি করে ফিরে যেত। এখানে রোমক বণিকদের একটি স্থায়ী বসতি ছিল এবং সম্রাট অগাষ্টাসের স্মৃতিতে গড়া একটি মন্দির ছিল। মালাবার উপকূলে আরও দুটি বন্দর ছিল নরা (কান্নানোর) ও টুণ্ডিস (পোন্নানি)—এবং দক্ষিণতম সীমা ছিল কোমারি (কন্যাকুমারী)।

করমণ্ডল উপকূলে কোলচি বা আধুনিক কোরকাই-এ মুক্তার চাষ হত। এই উপকূলে বর্তমান তামিলনাড়ু সংলগ্ন তিনটি বন্দরের নাম কামারা, পোদুকা ও সোপাট্মা। পোদুকা নিঃসন্দেহে পণ্ডিচেরীর নিকটবর্তী আরিকামেদু। টলেমির ভূগোলে উল্লিখিত খাবেরোস কাবেরী নদীর মুখে অবস্থিত সঙ্গম সাহিত্যে উল্লিখিত কাবেরীপট্টিনম নামক বিখ্যাত বন্দর, যার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে আধুনিক পুহার-এ। অন্ধ্র উপকূলে মাসালিয়া বা মুসলিপত্তন অঞ্চলে কণ্টাকসুল্লা (ঘণ্টকশাল) এবং আলোসুগনে নামক দুটি বন্দরের পরিচয় পাওয়া যায়। এই উপকূলের বন্দরসমূহ থেকে সুবর্ণভূমি বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উদ্দেশে জাহাজ ছাড়ত। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলে পেরিপ্লাস-এ গাঙ্গে বা গঙ্গা নামক বন্দরের উল্লেখ আছে। টলেমি টামেলিটিস বা মেদিনীপুরের তাম্রলিপ্তির উল্লেখ করেছেন।

৩.৪.১ রোমক বাণিজ্য

টলেমি কয়েকটি বন্দরের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে যেসব বন্দরে রোমক বণিকদের পাকাপাকি বসতি থাকত, এম্পোয়িরন নামক পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন। ভারতের সাথে রোমের বাণিজ্যিক লেনদেনের পরিচয় *পেরিপ্লাস,* প্লিনির রচনা প্রভৃতি সূত্র থেকে পাওয়া যায়। এই বাণিজ্য যে ভারতের অনুকূলে ছিল, এবং ভারতীয় বিলাসদ্রব্য যে ন্যায্য দামের চেয়ে বহুগুণ বেশি দামে রোমের বাজারে বিক্রয় হত, তা নিয়ে সম্রাট টাইবেরিয়াস এবং ঐতিহাসিক প্লিনি খেদ প্রকাশ করেছেন। এখান থেকে রোমে চাল, গম, সুগন্ধী, গোলমরিচ, দারুচিনি, চন্দন ও অপরাপর মূল্যবান কাঠ, সাধারণ ও মিহি বস্ত্র, মসলিন, দামী পাথর প্রভৃতি রপ্তানি হত। আমদানি হত খেজুর, সুরা, নানা ধরনের পাত্র, কাচের সামগ্রী, বিভিন্ন ধাতু ইত্যাদি। রোমের স্বর্ণমুদ্রাও বুলিয়ান হিসাবে আমদানি হত। কুষাণ যুগেই বিশেষ করে রোমের সাথে বাণিজ্য চলত। রোমের সাথে বাণিজ্য চলত। রোমের সঙ্গে বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান প্রমাণ ভারতের নানা স্থানে রোমক মুদ্রার আবিষ্কার।

৩.৪.২ গুপ্তযুগের বাণিজ্য

গুপ্তযুগে ভারতীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠী বা সার্থবাহের উজ্জ্বল উপস্থিতি বর্তমান। তাঁদের সামাজিক গুরুত্বের প্রমাণ হিসাবে বলা যায় যে বিষয়পতি বা জেলাধিকারিকের প্রশাসনিক কাজে যাঁরা সাহায্য করতেন তাঁদের মধ্যে নগরশ্রেষ্ঠী ও সার্থবাহ প্রধান। কারিগরদের মতো বণিকেরাও পেশাদারী সংগঠন গড়ে তোলেন। অন্তর্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শাসকবর্গ বণিকদের সুযোগসুবিধা দানে কার্পণ্য করতেন না। স্থলপথ ও জলপথে অভ্যন্তরীণ পরিবহণ ব্যবস্থা যে উৎকৃষ্ট ছিল সেকথা চৈনিক পরিব্রাজকদ্বয় বলে গেছেন। ৩০০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকেই রোমের সঙ্গে বাণিজ্যের অবক্ষয় ঘটে এবং ৪৭৩ খ্রিস্টাব্দে রোম সাম্রাজ্য পতনের পর তা রুদ্ধ হয়ে যায়। বাইজান্টাইন বা পূর্ব-রোমক সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য তেমন দানা বাঁধতে পারেনি,

কেননা কনস্টান্টিনোপল থেকে প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্য মূলত পারস্য উপসাগর দিয়ে শুরু হয় যা নিয়ন্ত্রণ করতেন ইরানের সাসানীয় বংশের শাসকরা। তৎসত্ত্বেও পূর্ব-রোমক সাম্রাজ্যের সঙ্গে একেবারেই বাণিজ্য বন্ধ হয়নি যার প্রমাণ পূর্ব-রোমের সম্রাটদের মুদ্রা কেরল ও তামিলনাড়ুর মধ্যবর্তী কোয়েম্বাটোরে পাওয়া গেছে। ভারতের পশ্চিম উপকূলের বন্দরসমূহ থেকে পারস্য উপসাগরে অবশ্যই বাণিজ্যপোত যাতায়াত করত। দক্ষিণাপথের চালুক্যবংশীয় রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী (৬১০-৪২ খ্রিঃ) বিনা কারণে পারস্যরাজ দ্বিতীয় খসরুর সঙ্গে দৌত্য সম্পর্ক বজায় রাখেননি; বাণিজ্যিক স্বার্থই ছিল বড় কথা। পূর্ব উপকূলে বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ চলত প্রধানত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে। করমণ্ডল উপকূলের বন্দরসমূহ ছাড়াও উড়িষ্যার দুটি বন্দর এবং সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের যুগে বাণিজ্যের অধোগতি লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে স্কন্দগুপ্তের সময় থেকেই গুপ্তদের স্বর্ণমুদ্রার মানের অবনতি ঘটতে শুরু করে।

৩.৪.৩ আদি-মধ্যযুগের বাণিজ্য ও নগরসমূহ

মোটামুটিভাবে ৬৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতীয় অর্থনীতির যে পরিচয় পাওয়া যায় তার সঙ্গে পূর্ববর্তী যুগের একটা গুণগত পার্থক্য চোখে পড়ে। পশ্চিম ভারতে বকাটকবংশীয় শাসকদের আমলে মুদ্রাব্যবস্থার গৌণতার যে পরিচয়ের সূচনা হয়েছিল তারই ব্যাপ্তি হিসাবে দেখা যায় যে বঙ্গ-বিহারের পাল-সেন রাজারা মুদ্রা প্রস্তুত করেননি, রাষ্ট্রকূট সম্রাটদের নামাঙ্কিত কোন মুদ্রা পাওয়া যায়নি, গুর্জর-প্রতিহারদের মুদ্রা থাকলেও সেগুলির ধাতব বিশুদ্ধি এবং ওজনের স্থিরতা অনিশ্চিত। মুদ্রা প্রস্তুত না করার অনেক কারণ থাকতে পারে। পূর্বে এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সরকারের বক্তব্য উদ্ধৃত্ত হয়েছে। তবুও এই মুদ্রার অনুপস্থিতির বিষয়টিকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, যদিও বাজারচালু মুদ্রাসমূহ অবলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কোন প্রমাণ নেই। পাশাপাশি হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায় যে গাঙ্গেয় উপত্যকার বহু সমৃদ্ধ নগরের অবক্ষয় খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেই ঘটে গিয়েছিল। এই সকল নগরের মধ্যে কৌশাম্বী, শ্রাবন্তী, কপিলাবস্তু, রামগ্রাম, কুশীনগর ও বৈশালীর মতো বিখ্যাত নগর অন্তর্ভুক্ত। এই অবক্ষয় বাস্তব, কিন্তু কোন অতসরলীকৃত কারণের দোহাই দিয়ে তা ব্যাখ্যা করা সঙ্গত নয়। বস্তুত যেভাবে প্রদর্শন করা হয়, আসলে নগরসমূহ ধারাবাহিকতাই বজায় রেখেছিল। যদি কোন কারণেই কোন নগরের বাস্তবিকই অবক্ষয় ঘটে, সেই কারণটি অর্থনৈতিক নাও হতে পারে।

এই যুগের উত্তর ভারতের বিভিন্ন লেখে হট্ট বা হট্টিকা (হাট) উল্লিখিত হয়েছে। হাট ছাড়া মেলাতেও পণ্য কেনাবেচা বলত। লেখসমূহে মণ্ডপিকা (যা থেকে উত্তর ভারতে মণ্ডী শব্দটি চালু হয়েছে) বাজার অর্থে উল্লিখিত, দক্ষিণ ভারতে যা নগরম নামে পরিচিত। লেখসমূহে, শ্রেষ্ঠী, সার্থবহ ও বণিকদের যথেষ্ট উল্লেখ বর্তমান। সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের অবক্ষয় হয়েছিল এমন বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করা যায় না, বরং লেখসমূহের সাক্ষ্য বিপরীত কথা বলে। রামশীণ শর্মা প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ তৃতীয়-চতুর্থ শতকের পর থেকে রোম-ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্ক সঙ্কোচনকে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের অন্যতম উপাদান হিসাবে গণ্য করেছিলেন। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের ফলে অষ্টম শতকের পর থেকে একটা তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আসে। আরব বণিকেরা ভারতের পশ্চিম উপকূলের বিভিন্ন বন্দরে তাদের পণ্যবাহী জাহাজ নোঙ্গর করত, এবং সেখান থেকে পণ্য চীনা জাহাজে উঠত। আবার চীন থেকে অনুরূপভাবে ভারত উপকূলে একই উদ্দেশ্যে জাহাজ ভেড়ানো হত। কোচিন এবং চীন একই ব্যাপার। আরব লেখকরা ভারতীয় বন্দরসমূহের উপযোগিতার কথা বলেছেন। দক্ষিণের রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজাদের সঙ্গে আরব বণিকেরা সুসম্পর্ক রাখতেন।

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পর প্রাচীন বাংলার বিখ্যাত বন্দর তাম্রলিপ্তি তার গুরুত্ব হারায়, কিন্তু আরব লেখকদের রচনায়, বঙ্গাদেশের চট্টগ্রাম সমন্দর নামক একটি নূতন গড়ে ওঠা বন্দরের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বন্দর দিয়েই বঙ্গাদেশে ও কামরূপের পণ্য চলাচল করত। দক্ষিণ ভারতের পূর্ব উপকূল দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বজায় রাখা হত। চোলবংশীয় রাজা রাজেন্দ্র চোলের (১০১২-৪৪ খ্রিঃ) দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও চীনের সঙ্গো বাণিজ্যিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়। দ্বাদশ শতক পর্যন্ত চোলদের সমুদ্র বাণিজ্যে প্রবল উৎসাহ ছিল । কাজেই আদি-মধ্যযুগে বাণিজ্যের অবক্ষয়ের কথা বলা হয় তা সর্বাংশে ঠিক নয়।

চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত সময়সীমায় উত্তর ভারতের বেশ কয়টি বিখ্যাত নগর অবক্ষয়ের কবলে পড়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সে-অবক্ষয় সঠিক কিনা অথবা তার সঙ্গো সামন্ত ব্যবস্থার কোন যোগাযোগ আছে কিনা একথা পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রাচীন নগরে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে কুষাণ বা তৎপরবর্তী সময় থেকে তুর্কী আমল পর্যন্ত ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। অহিচ্ছেত্র, অত্রাঞ্জিখেরা, রাজঘাট, চিরণ্ড প্রভৃতি প্রত্নক্ষেত্রের কথা এ প্রসঙ্গো উল্লেখযোগ্য। লেখসমূহ থেকেও কয়েকটি নগরের ধারাবাহিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন বুলন্দশহরের নিকটবর্তী তত্ত্বানন্দপুর, সীয়াডোনি, গোপাদ্রি বা গোয়ালিয়র, জব্বলপুরের নিকটবর্তী বিলহরি প্রভৃতি। আদি-মধ্যযুগে নতুন নগরেরও পত্তন হয়েছিল। কাজেই আদি-মধ্যযুগের ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনে কিছুটা মন্থর হলেও গতিময়তা, বৈচিত্র্য, আঞ্চলিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটা সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি, সবই ছিল।

৩.৫ অনুশীলনী

১। হরপ্পা এবং হরপ্পা-উত্তর সভ্যতায় কারিগরি ব্যবস্থা কীরূপ ছিল?

২। প্রাচীন ভারতে কারিগর ও পেশাদারি সংগঠনসমূহের বর্ণনা দিন।

৩। প্রাচীন ভারতে বাণিজ্য ও নগরায়নের চরিত্র সম্বন্ধে রচনাত্মক আলোচনা করুন।

৪। প্রাচীন ভারতে সামুদ্রিক বাণিজ্য কীভাবে বিস্তারলাভ করেছিল?

৩.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য : *প্রাগৈতিহাসিক ভারতবর্ষ (১৯৮৪)*

২। নীহাররঞ্জন রায় : *বাঙ্গালীর ইতিহাস (১৯৪৯),* পুনমুর্দ্রণ, ১৯৮০

৩। বি. এ্যান্ড আর অ্যাল্লেকিন : *দ্য রাইস অফ্ সিভিলাইজেশন্ ইন ইন্ডিয়া এ্যান্ড পাকিস্তান (১৯৮২)*

৪। বি. ডি. চট্টোপাধ্যায় : *দ্য মেকিং অফ্ আলি হিস্টরিকাল ইন্ডিয়া (১৯৭৩)*

৫। আর. এস. শর্মা : *মেডিয়াভাল কালচার এ্যান্ড সোশাল ফরেমেন্টসান ইন এনসিয়েন্ড ইন্ডিয়া (১৯৮৩)*

৬) ওয়ারমিঙ্গাসান ই. এইং : *কমার্স বিটুউইন দি রোমান এম্পায়ার এন্ড ইন্ডিয়া (১৯৭৪)*

একক ৪ ❐ সামাজিক জীবন, বিজ্ঞানচেতনা ও ধর্মীয় সংস্কৃতি

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য
৪.১ পারিবারিক জীবন
৪.১ জাতিবর্ণ প্রথা
৪.৩ দাসপ্রথা
৪.৪ নারীজাতির অবস্থা ও বিবাহপ্রথা
৪.৪.১ শিক্ষা
৪.৪.২ বিবাহ
৪.৪.৩ বিবাহ বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ
৪.৪.৪ নিয়োগপ্রথা
৪.৪.৫ সম্পত্তির অধিকার
৪.৪.৬ স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক
৪.৪.৭ বিধবা
৪.৪.৮ দেহোপজীবিনী
৪.৫ অনুশীলনী
৪.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন প্রাচীন ভারতের

- পারিবারিক জীবন
- নারীজাতির অবস্থা
- প্রযুক্তি, বিজ্ঞান
- ধর্মীয় সংস্কৃতি

৪.১ পারিবারিক জীবন

কিছু কিছু অঞ্চল বা উপজাতি বাদ দিলে ভারতবর্ষের সর্বত্র-ই পিতৃতান্ত্রিক পরিবার বর্তমান ছিল। যৌথ পরিবারসমূহে যিনি সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ, একেবারে অথর্ব না হয়ে পড়লে, তিনি হতেন পরিবারের নিয়ন্ত্রক ও

পরিচালক। তবে বৈদিক সাহিত্যে পিতা-মাতা-সন্ততি সহ ছোট পরিবারেরও উল্লেখ আছে। পুরুষদের ক্ষেত্রে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। *ঋগ্বেদ*-এ একটি সূক্তে পরিবারের বিভিন্ন বৃত্তির কথা পাওয়া যায়।

জাতিত্ববাচক, আত্মীয়বাচক এবং কুলবাচক পরিভাষাসমূহ সুনির্দিষ্ট ছিল যথা কুল (পরিবার), গোত্র (বর্গ) জ্ঞাতি (পিতৃপক্ষীয় আত্মীয়বর্গ), সবন্ধু (কুটুম্ব), সজাত এবং বন্ধু (আত্মীয়) ইত্যাদি। এছাড়া প্রতাতমহ, প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা, তাত (পিতা এবং পিতার ভ্রাতাগণ), ননা এবং মাতৃ (মাতা), তন্ব, পুত্র ও সূনু (পুত্র), পুত্রিকা (যে কন্যা পুত্রের কাজ করে), শেষ (সন্তানবর্গ), দম্পতি, শ্বশুর, জামাতৃ, স্নুসা (পুত্রবধূ), ভার্যা, সপত্নী, ভ্রাতৃ, ভগিনী ও স্বসৃ, বোন, দেব (দেবর), জিধিষুপতি (ভগ্নীপতি), ননন্দৃ (ননদ), মতুল ও মাতুর্ভ্রাতৃ (মামা), শাল্য (শ্যালক), স্বস্রীয় (ভাগ্নে), ভ্রাতৃব্য, ভর্তৃ (স্বামী), নপাত, নঃ ও পৌত্র (নাতি) প্রভৃতি পারিবারিক সম্পর্কবাচক পরিভাষা সুনির্দিষ্ট ছিল। আরও কিছু বিশেষ পারিবারিক পরিভাষা ছিল যথা সমানগোত্র, সমানজন, বিধবা, পুনর্ভু, (পুনর্বিবাহিতা স্ত্রী) প্রভৃতি।

মনু কর্তৃক তাঁর সন্তানদের মধ্যে অযৌক্তিকভাবে সম্পত্তিবণ্টনের যে কাহিনী ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় তা থেকে সন্তানদের উপর পিতার কর্তৃত্বের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। ধর্মশাস্ত্রসমূহের যুগের পূর্বে মেয়েদের পারিবারিক সম্পত্তির উপর কোন অধিকার ছিল না। স্ত্রীধনের ধারণা প্রথম *মনুস্মৃতি*-তে পাওয়া যায়, তবে স্ত্রীধন উত্তরাধিকার নয়, যদিও এর দ্বারা পরিবারের নারী সদস্যদের আর্থিক অবিচারের সম্পূর্ণ শিকার হওয়া থেকে কিছুটা রেহাই দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। *অথর্ববেদ*-এ সম্পূর্ণ একটি বিখ্যাত সূক্তে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শান্তি বজায় রাখার প্রার্থনা করা হয়েছে, যদিও পারিবারিক অশান্তি ও কলহের বহু নিদর্শন প্রাচীন সাহিত্যে বর্তমান। স্বামীস্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বস্ততার চিত্র সাহিত্যে পাওয়া যায়, বিপরীত চিত্রেরও অভাব নেই।

পিতার জীবিতকালেই পুত্রগণ কর্তৃক তাঁর সম্পত্তির বিভাজনের উল্লেখ আছে, পিতা যে সন্তানদের পৃথক করে দিয়েছেন তারও নজির আছে, আবার ছেলেরা নিজ উদ্যোগে পৃথক হয়ে গেছে তারও নজির আছে। পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলে পুত্রগণ তাঁর ঋণ শোধ করতে বাধ্য, যদিও এই বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রকারদের মধ্যে মতভেদ আছে। মনুস্মৃতি অনুযায়ী পিতা যখন সম্পত্তির মালিক, তিনি নিজ ইচ্ছামতই তার বিলিব্যবস্থা করতে পারেন, এমনকী তাঁর উত্তরাধিকারীদের যে তাঁর রক্তের সম্পর্কিত হতে হবে এর কোন মানে নেই। তিনি ইচ্ছামত উইল করতে পারেন, না করলে সম্পত্তি স্ত্রী ও পুত্রগণের মধ্যে বণ্টিত হবে, এবং জ্যেষ্ঠপুত্রই সর্বাধিক অংশ পাবে। পুত্রগণ তাঁদের ভাগের এক-চতুর্থাংশ তাঁদের ভগিনীদের বিবাহের জন্য প্রদান করবেন, তবে তা বাধ্যতামূলক কিনা সে কথা মনু বলেন নি। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে বংশে সন্তান জন্মালেই সে পারিবারিক সম্পত্তির ভাগীদার ও উত্তরাধিকারী হবে। বিষয়টি নারীজাতির অবস্থার আলোচনার প্রসঙ্গে বিশদভাবে আলোচিত হবে।

৪.২ জাতিবর্ণ প্রথা

যে জাতিবর্ণ প্রথা ভারতীয় সমাজব্যবস্থার অন্যন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং আজও পর্যন্ত যার প্রভাব রাষ্ট্রিক ও সমাজজীবনে অসীম, সেই প্রথার প্রথম সুনির্দিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বৈদিক সাহিত্যে। জাতিপ্রথা ও বর্ণভেদ পৃথক বিষয়। বর্ণভেদ বলতে বোঝায় একটি বিশেষ আদর্শগত দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র সাধারণকে কয়েকটি বিশেষ মর্যাদার শ্রেণীতে বিভাজন। পৃথিবীর সর্বত্রই শাস্ত্রজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, শাসক ও যোদ্ধা শ্রেণী, উৎপাদক

ও বণিক শ্রেণী এবং কারিগর ও শ্রমজীবী শ্রেণী বর্তমান। এই বিভাজন সর্বত্র এবং সর্বযুগে দেখা যায়, প্রাচীন ভারত এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। সমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চাতুর্বর্ণ্যে বিভক্ত করার যে পরিকল্পনা শাস্ত্রকারেরা করেছিলেন তা কিন্তু জাতিপ্রথার মতো একটি জটিল, সর্বত্রগামী ও বহুরূপী ব্যবস্থার গঠনগত ও কার্যকারিতাগত দিকসমূহ ব্যাখ্যা করতে অপারগ।

স্মরণ রাখা দরকার যে ভারতবর্ষে চাতুর্বর্ণ্যের মতো সহজ সরল সামাজিক বিভাজন কোন যুগেই ছিল না, আজও নেই। বাস্তবে যা আছে তা হচ্ছে পাঁচ হাজারের মতো জাতি ও শাখাজাতি। শাখাজাতি বলতে সেইসব জাতিদের বোঝায় যারা কোন বড় জাতি ভেঙে গড়ে উঠেছে, অথবা কোন আঞ্চলিক ক্ষুদ্র জাতি যারা গৌরবার্থে নিজেদের কোন বড় জাতির শাখা হিসাবে পরিচিত করে। এস. ভি. কেটকার দেখিয়েছেন যে কেবল ব্রাহ্মণেরাই আটশোর উপর শাখাজাতিতে বিভক্ত। এই প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য : "বর্ণাশ্রম প্রথা ও অভ্যাস যুক্তি পদ্ধতিবদ্ধ করিয়াছিলেন প্রাচীন ধর্মসূত্র ও স্মৃতি গ্রন্থের লেখকরা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চাতুর্বর্ণের কাঠামোর মধ্যে তাঁরা সমগ্র সমাজ জীবনকে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই চাতুর্বর্ণ্যের প্রথা অলীক উপন্যাস এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই, কারণ ভারতবর্ষে এই চাতুর্বর্ণ্যের বাহিরে অসংখ্য বর্ণ, জন ও কৌম ছিল। প্রত্যেক বর্ণ, জন ও কৌমের ভিতর আবার ছিল অসংখ্য স্তর, উপস্তর। ধর্মসূত্র ও কৌমের স্তর উপস্তর ইত্যাদি ব্যাখ্যা করিতে এবং সব কিছুকেই আদি চাতুর্বর্ণ্যের কাঠামোর যুক্তিপদ্ধতিতে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

জাতি বলতে সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী বোঝায়, সেনার্তের মতে যা বংশপরম্পরায় একই উদ্ভব সূত্রে গ্রথিত, প্রধান ও পরিষদ সহ কয়েকটি প্রথাগত অথচ স্বাধীন সংগঠন দ্বারা পরিচালিত এবং নির্দিষ্ট পেশা ও আচরিত রীতিনীতিসমূহের ভিত্তিতে একতাবদ্ধ। বিজলী বলেন জাতি বলতে বোঝায় কয়েকটি পরিবার বা পারিবারিক গোষ্ঠীর সমবায় যারা প্রত্যেকেই একই জাতিনামের অন্তর্গত, একই পৌরাণিক পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত বলে নিজেদের পরিচয় দেয়, একটি নির্দিষ্ট কৌলিক বৃত্তির অনুসরণ করে নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যেই অন্তর্বিবাহ করে এবং অনুরূপ অন্য জনগোষ্ঠীর সাথে সামাজিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। আরও বহু লেখক জাতিপ্রথার নানা বৈশিষ্ট্যের আলোকপাত করেছেন। সকলের বক্তব্যের সারসঙ্কলন করলে যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে জাতি বলতে বোঝায় একটি বিশেষ পেশার ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠী, যারা নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যেই অন্তর্বিবাহ করে, সমাজে কাঠামোয় ছোটবড় যেমনই হোক না কেন যাদের একটি নির্দিষ্ট স্থান ও ভূমিকা আছে, যাদের অধিকার ও কর্তব্যের ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যারা তাদের নিজস্ব সামাজিক আইনের দ্বারা পরিচালিত এবং পেশাগত ও অপরাপর ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ধরনের সার্বভৌমত্ব ভোগ করে। একটি জাতির কর্ম বা অধিকারের ক্ষেত্রে অপর জাতির হস্তক্ষেপ বা অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ যদিও বিশেষ পরিস্থিতিতে কৌলিক বৃত্তির পরিবর্তন ঘটতে পারে অথবা কৃষিকাজের মতো ব্যাপক বৃত্তির ক্ষেত্রে একাধিক জাতি আসতে পারে।

সকল ঐতিহাসিক কার্যকারণ পরম্পরায় জাতিপ্রথার উদ্ভব হয়েছে। সেগুলির মধ্যে একটি হল যে এই প্রথা, বিশেষ করে জাতিকাঠামোর মধ্য ও নিম্নস্তরের সোপানাবলী, আসলে উপজাতীয় সমাজের বা কেমিসমাজের অসমাপ্ত বিলোপের পরিমাণ। বহুক্ষেত্রেই উপজাতীয়ব্যবস্থার ও জাতিব্যবস্থার মধ্যকার সীমারেখা মোটেই স্পষ্ট নয়। অসংখ্য উপজাতি তাদের উপজাতীয় পরিবেশ থেকে বিযুক্ত হয়ে কোন বিশেষ বৃত্তিকে অবলম্বন করে

বৃহত্তর হিন্দু সমাজে স্থান করে নিয়েছে এবং সেই বৃত্তির গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুযায়ী জাতিকাঠামোর নানা পর্যায়ে তাদের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। উপজাতীয় পরিবেশ থেকে বিযুক্ত হয়ে এইভাবে যারা হিন্দু সমাজের আওতায় এসেছে, এবং বিভিন্ন পেশার ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে, তাদের চাতুর্বর্ণ্যের কাঠামোর মধ্যে ঢোকাবার এবং ব্যাখ্যা করার সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে শাস্ত্রকারেরা বর্ণসংকর তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন। *ঋগ্বেদ*-এর পুরুষ সূক্তের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে মনু বলেন যে বিশ্বস্রষ্টার মুখ, বাহু, উরুদেশ এবং পদদ্বয় থেকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারবর্ণের উৎপত্তি হয়েছে। এই চার বর্ণের মধ্যে পারস্পরিক অনুলোম (উচ্চবর্ণের পুরুষ এবং নিম্নবর্ণের স্ত্রী) বিবাহের ফলে নানা সংকর জাতির উদ্ভব হয়। এভাবে উদ্ভূত সংকর জাতিসমূহ পুনরায় পারস্পরিক অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের দ্বারা দ্বিতীয় পর্যায়ের সংকর জাতিসমূহকে উৎপন্ন করে। দ্বিতীয় পর্যায়ের সংকর জাতিরা একই ভাবে তৃতীয় পর্যায়ের জাতিদের উৎপন্ন করে। এই পদ্ধতি অনুসরণে অসংখ্য জাতিকে বিভিন্ন পর্যয়ের সংকর জাতি হিসাবে চাতুর্বর্ণ্যের মূল কাঠামোর মধ্যে ধরিয়ে দেওয়া যায়।

একটি উদাহরণ দিলে পদ্ধতিটি বোঝার সুবিধা হবে। অমষ্ঠ নামক একটি বার্তাশস্ত্রোপজীবী 'জন' বা উপজাতি পাঞ্জাব অঞ্চলে বাস করত যাদের উল্লেখ প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। যে-কোন কারণেই হোক তারা তাদের মূল অঞ্চল থেকে সরে আসতে বাধ্য হয় এবং ভারতের নানা স্থানে তারা ছড়িয়ে পড়ে। এক এক অঞ্চলে তারা এক- একটি বৃত্তিকে অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ শুরু করে এবং অবলম্বিত বৃত্তির গুরুত্ব অনুযায়ী তদনুরূপ জাতিতে রূপান্তরিত হয়। বঙ্গদেশে তারা বৈদ্যের বৃত্তি গ্রহণ করে। ধর্মশাস্ত্রকাররা তাদের অনুলোম সংকরজাতি হিসাবে জাতি কাঠামোয় স্থান দেন এবং তাদের সম্বন্ধে বলা হয় যে তারা ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্য মাতার মিলনজাত। কিন্তু বর্ণ-সংকর তত্ত্ব শাস্ত্রকারদের উদ্দেশ্যের অনুকূল হলেও বাস্তব হতে পারে না। তবে জাতিকাঠামোর মধ্যে অনুলোম-সংকর জাতিদের উপরের দিকে এবং প্রতিলোম-সংকর জাতিদের নীচের দিকে স্থান দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে অবশ্য তত্ত্বের দিক থেকে বর্ণ-সংকরের ধারণা বজায় রাখলেও বাস্তবে এই তত্ত্ব থেকে শাস্ত্রকারেরা সরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন কেননা অসবর্ণ-বিবাহজাত সন্তান বাস্তবে পিতার জাতিভুক্তই হয়, কোন তৃতীয় জাতিতে পরিণত হয় না। কাজেই পরবর্তীকালে পেশার মর্যাদা ও জীবন যাপন-পদ্ধতির শুদ্ধতার নিরিখে জাতিসমূহের ক্ষেত্রে উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন বর্গের বিভাজন করা হয়।

জাতিপ্রথার অসাম্যমূলক দিকটিকে স্বীকার করে নিয়েও জে. এইচ. হাটন বলেন যে জাতিপ্রথা একজন ব্যক্তিকে তার জন্ম থেকেই একটি নির্দিষ্ট সামাজিক পরিবেশে আনয়ন করে। সম্পদ বা দারিদ্র্য, সাফল্য বা বিপর্যয়, যাই হোক না কেন, জাতির আশ্রয় থেকে সে কখনোই বঞ্চিত হয় না, যদি না সে তার জাতি প্রবর্তিত মান লঙ্ঘন করে। জাতি তার অন্তর্গত ব্যক্তিকে বরাবরের সাহচর্য দেয়, তার সমস্ত ব্যবহার ও যোগাযোগকে নিয়ন্ত্রণ করে, বিবাহক্ষেত্রে তার পছন্দকে প্রণালীবদ্ধ করে, তার ট্রেড ইউনিয়ন, বান্ধব সমাজ, সাহচর্যকেন্দ্র এবং আতুরাশ্রমের ভূমিকা পালন করে। জাতিই তার স্বাস্থ্যবীমার প্রতিষ্ঠান, প্রয়োজন হলে অন্ত্যেষ্টিরও অবলম্বন। ফর্নিভাল বলেন যে ভারতে এক জাতীয় প্লুরাল বা বহুত্ববাদী সমাজ একমাত্র জাতিপ্রথার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অসাম্যমূলক হলেও প্রতিটি জনগোষ্ঠী নিজস্ব সামাজিক, নৃতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ অক্ষুণ্ণ রেখে এই ব্যবস্থায় স্থান পেতে পারে। এই কারণে জাতিপ্রথা শুধু ভারতীয় হিন্দু সমাজেরই বৈশিষ্ট্য নয়, বেসরকারিভাবে বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও খ্রিস্টান সমাজেও এই প্রথা কার্যকরভাবে বর্তমান। এই প্রথা বিভিন্ন

জনগোষ্ঠীর নিজস্বতা ও স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ না করে একটা বিরাট দেশের জনসমাজের মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয় বিধান করেছে। দ্বিতীয়ত, জাতিপ্রথা এমন একটি পরিকল্পিত সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে যার মূল কোন বলপ্রয়োগ নেই। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচারী-শাসনের বিকল্প হিসাবে জাতিপ্রথা সামাজিক শাসনের কার্যকারিতা, উপযোগিতা ও সম্ভাবনার বিষয়গুলি তুলে ধরেছে। চতুর্থত, এই প্রথা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে একটি সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর দক্ষতা, জ্ঞান ও ব্যবহারের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে। জাতিপ্রথার উচ্চ-নীচ ভেদের অসাম্যমূলক দিকটি প্রকট থাকলেও, তার কার্যকর দিকগুলিকে স্বীকার না করলে এই প্রথার প্রবল দীর্ঘস্থায়িত্বের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

ঋগ্বেদ-এ পেশাদারী জাতিপ্রথা লক্ষ্য করা যায়। পাশাপাশি চাতুর্বর্ণ্যের ধারণাও গড়ে উঠেছিল, যদিও বৈশ্য ও শূদ্র শব্দদ্বয়ের উল্লেখ একমাত্র পুরুষসূক্ত (*ঋগ্বেদ* ১০/৯০) ভিন্ন অন্যত্র নেই, তবে বিশ্ শব্দটির বহুল প্রয়োগ আছে, কোন গ্রামের বা এলাকার অধিবাসী অর্থে। পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহের যুগে যেমন একদিকে পেশাদার জাতিসমূহের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে অপরদিকে তেমনই চাতুর্বর্ণ্যের ধারণারও বিকাশ ঘটেছে, এবং ব্রাহ্মণদেরও মর্যাদা বাড়ানো হয়েছে। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ (১১/৫/৭/১) ব্রাহ্মণদের চারটি বিশেষ গুণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যথা— ব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মণ হিসাবে জন্মের বিশুদ্ধি), প্রতিরূপর্যা (চরিত্রমাধুর্য), যশ (গৌরব) এবং লোকপক্তি (লোকশিক্ষা প্রদান)। ব্রাহ্মণের বৃত্তি ছয়টি—যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ। তবে খুব অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণই শুদ্ধবৃত্তিধারী ছিলেন। ধর্মশাস্ত্রসমূহে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের জন্য দশটি বৃত্তির বিধান আছে, যথা শিক্ষাদান, হাতের কাজ, সেবা, কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য, মহাজনী-কারবার, দিনমজুর, উঞ্ছবৃত্তি ও ভিক্ষা (*মনু* ১০/১১৬)। ক্ষত্রিয়দের স্বধর্ম পাঁচটি, যথা অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, শাস্ত্রজীব (যুদ্ধ ব্যবসায়) এবং ভূতরক্ষণ (লোকরক্ষ)। এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ঐতিহাসিক বিচারে ক্ষত্রিয় বলতে মূর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়কে বোঝায়। রাজক্ষমতার অধিকারী যে-কোন জাতিই—এমনকি গ্রীক, শক, পহ্লবদের মতো বহিরাগত হলেও—বিশেষ অভিষেকের দ্বারা মূর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ে পরিণত হ'তে পারত। বৈশ্যের বৃত্তি ছয়টি, যথা অধ্যয়ন, যজন, দান, কৃষি, পশু-পাল্য এবং বাণিজ্য। শূদ্রের বৃত্তি চারটি, যথা দ্বিজাতিশুশ্রূষা, বার্তা (ধন-উৎপাদন), কারুকর্ম এবং কুশীলবকর্ম, (হাতির কাজ)।

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ-এ বলা হয়েছে যে, শুনঃশেপকে বিশ্বামিত্র মুনি পুত্র হিসাবে গ্রহণ করতে চাইলে তাঁর পুত্রগণ তাতে আপত্তি করে। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্র তাদের যে অভিশাপ দেন তার ফলে তাদের থেকে অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, মুতিব ও পুলিন্দ জাতির উদ্ভব হয়। এই পাঁচটি জাতি-ই কিন্তু প্রাচীন ভারতের পাঁচটি বিখ্যাত উপজাতি। তাদের উপজাতীয়তা বিলোপ ও জাতিকাঠামোয় অনুপ্রবেশের বিষয়টি যুক্তিসিদ্ধ করার জন্যই এই কাহিনীটির সৃষ্টি করা হয়েছে। একই যুক্তির সূত্র ধরে *মনুস্মৃতি*-তে (১০/৪৩-৪৫) পুণ্ড্র, ওড্র, দ্রাবিড়, কম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দর্দ ও খসদের ক্ষত্রিয়ত্ব থেকে নামিয়ে শূদ্র করা হয়েছে। *ধর্মসূত্র* এবং ধর্মশাস্ত্রসমূহে বর্ণসংকর তত্ত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন কৌম সমাজ বা উপজাতিকে জাতিপ্রথার আওতায় আনা হয়েছে এবং সংকর জাতি বলে গণ্য করা হয়েছে, যেমন ভিল্ল, বৈদেহিক, মগধ, আভরীয়, অন্দ্র, অম্বষ্ঠ, আবন্ত্য, ওড্র, কিরাত, মেকল, দ্রাবিড়, লাট, লিচ্ছবি, চুঞ্চু মেদ, মদ্‌গু, নিষাদ, পুলিন্দ, ভোজ, মাতঙ্গ, মাহিষ্য প্রভৃতি।

ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রসমূহে শূদ্র পর্যায়ের সকলকেই সংকর জাতি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। নিম্নবর্ণের পিতা ও উচ্চবর্ণের মাতা থেকে সৃষ্ট জাতিসমূহ অধম-সংকর হিসালে পরিগণিত। উচ্চবর্ণের পিতা এবং নিম্নবর্ণের

মাতা সম্ভূত জাতিসমূহ উত্তম-সংকর হিসাবে পরিচিত, এবং মধ্যম-সংকর, অধম ও উত্তমের মাঝামাঝি। উত্তমরা উচ্চবর্গের পেশা, মধ্যমরা মধ্যবর্গের পেশা এবং অধমরা নিম্নবর্গের পেশার অধিকারী। আচার ও শুদ্ধতার বিচারেও অনুরূপ ভেদ বর্তমান। জাতিকাঠামোয় নিম্নতর পর্যায়ে চণ্ডাল, স্বপচ, ক্ষত্রি, সূত, বৈদেহিক, মগধ, মেদ, পুল্কস, রজক, চৈলনির্ণেজক, চর্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত, ভিল্ল প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। অন্দ্র, কিরাত, চণ্ডাল, চুঞ্চু, মেদ, মদ্‌গু, পুলিন্দ, মাতঙ্গ, শবর, স্বপচ ও লুব্ধকগণ শিকারজীবী। সোপাক, শূলিক (সুনিক, সৌনিক, উদ্বন্ধক, ঘাটিক), দিগবন (মোচিকার), কারাবর (আহিণ্ডিক), ডোম্ব, স্বপচ, চর্মকার প্রভৃতি জাতি পশুহননের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত। কৈবর্ত (জালিক), কল্ল, মার্গব, দাস, ধীবর, মল্ল, মৎস্যবন্দক প্রভৃতি মৎস্যজীবী জাতি। অপরাপর পেশাদার জাতিসমূহের মধ্যে গোপ, গোপালক, গোলক এবং উরভ্র বা ধঙ্গার (পশুপালক), অম্বষ্ঠ ও ভিষক (চিকিৎসাব্যবসায়ী), অয়স্কার, কর্মার ও লোহকার (কর্মকার), কুলাল ও কুম্ভকার, তক্ষণ, উপক্রুষ্ট ও বর্ধকী (কাঠের কারিগর), কাংসকার (কাঁসারি), তাম্রোপজীবী (তাম্রের কারিগর বা ব্যবসায়ী)। বেণুক ও পাণ্ডুসোপাক (বাঁশের কারিগর), সুবর্ণকার, সৌবর্ণিক ও হেমকার (সোনার ও স্যাকরা), রঞ্জক, রঙ্গারী, সিন্দোলক বা সন্দলিক (রঙের কারিগর), রোমিক (লোনার বা লবণ উৎপাদনকারী), মন্যু (গোয়েন্দা), বন্ধুল (স্বর্ণবিন্দু সংগ্রাহক), পৌষ্টিক (পাল্কীবাহক), অঘাসিক, আন্ধাসিক ও বান্দবন্ধু (খাদ্য বিক্রেতা) সৈরিন্ধ্র (গৃহভৃত্য), সূচিকা (সূচীশিল্প), বন্দী (বন্দনাগায়ক), কাকবক (যারা ঘোড়ার ঘাস কাটে), বঙ্গাবতারী (যারা সাজঘর ও বেশবাসের সংস্কার করে), ঐশ্বিক (অশ্বব্যবসায়ী), মৈত্রেয়ক (রাজভৃত্য), কুক্কুট (অস্ত্রনির্মাতা), মালাকার বা মালিক, কুন্তলক ও নাপিত, কোলিক (ভারবাহক), নর্তক, খনক, চক্রী, চাক্রিক ও তৈলিক (তৈলপ্রস্তুতকারী ও ব্যবসায়ী), চুচুক ও তাম্বুলিক (পান উৎপাদক ও বিক্রেতা), তন্তুবায়, তুন্নবায় (দর্জি) প্রভৃতি।

শূদ্র পর্যায়ের জাতিসমূহ কোন সুনির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণী নয় এবং তারা অসংখ্য শাখাজাতির সমাহার। তথাকথিত চাতুর্বর্ণ্যের ধারণায় ধর্মশাস্ত্রকাররা শূদ্রদের দাস পর্যায়ভুক্ত করেছেন, কিন্তু সকল ধর্মশাস্ত্রেই শূদ্রকে স্বাধীন মানুষ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। আসলে শূদ্র তত্ত্বের দিক থেকে চতুর্বর্ণের অন্যতা অঙ্গ, যার উদ্ভব সেই পরমপুরুষ বা স্রষ্টার দেহ থেকে। শূদ্র ধন উপার্জন, সঞ্চয় ও সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকারী, যোগ্যতা থাকলে প্রশাসনিক উচ্চপদ পেতে শূদ্রের কোন বাধা নেই, এমনকী রাজা হতেও। জৈমিনীর মীমাংসাসূত্রে এবং তার উপর রচিত শবর ভাষ্যে এই বিষয়টিকে বাস্তবতার বিচারে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বস্তুত প্রাচীন ভারতের অধিকাংশ রাজবংশই ছিল শূদ্র, এমনকী সুবিখ্যাত নন্দ ও মৌর্য বংশও। অনুরূপভাবে সমাজে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য ও ব্রাহ্মণদের শোষকবৃত্তি ও অত্যাচীর ভূমিকার কথা খুব উচ্চকণ্ঠে প্রচারিত হলেও তা সঠিক নয়। জাতিকাঠামোয় আজও পর্যন্ত মধ্যশ্রেণীর জাতিগুলিই, তাদের রাজনৈতিক ও আর্থিক শক্তির জোরে, ডমিনান্ট কাস্ট বা প্রভাবশালী জাতি হিসাবে পরিচিত, ব্রাহ্মণ নয়। এই মধ্য শ্রেণীর জাতিগুলি মূলত ভূম্যধিকারী, শস্ত্রজীবী ও বণিকদের নিয়ে গঠিত এবং স্থানভেদে এক একটি জাতি প্রাধান্য পায়। যেমন উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলে রাজপুত ও বানিয়া, পশ্চিমাঞ্চলে জাঠ এবং অন্যান্য আহির (যাদব) ও গুজর। রাজস্থানে দেখা যায় যে বিভিন্ন গ্রামের প্রধান যে জাতির অন্তর্গত, সেই জাতির মানুষরাই সেই গ্রামে সবচেয়ে প্রভাবশালী। হরিয়ানা ও পাঞ্জাবে জাঠরা সবচেয়ে প্রভাবশালী, এমনকী শিখদের মধ্যে জাঠ-শিখই প্রভাবশালী। কর্ণাটকে লিঙ্গায়ৎ ও ভোক্কালিকা এবং অন্ধ্রে কাপু বা রেড্ডিরা প্রধান।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম যে জাতিপ্রথা বিরোধী বলে সচরাচর কথিত হয় তা সঠিক নয়। গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং জাতিবর্ণ প্রথায় বিশ্বাসী ছিলেন, তবে তিনি ব্রাহ্মণদের উপর ক্ষত্রিয়দের স্থান দেন। বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে ব্রাহ্মণদের যে প্রশস্তি করা হয়েছে তা প্রায় ধর্মশাস্ত্রসমূহের অনুরূপ। *ধর্মপদ*-এর একটি পুরো অধ্যায় ব্রাহ্মণদের গুণ বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ সর্বদাই অক্ষত অবস্থায় গমন করেন, তাঁকে আক্রমণ করা ক্ষমার অতীত। ব্রাহ্মণদের শুদ্ধ বৃত্তিসমূহকে বৌদ্ধধর্মও স্বীকার করে নিয়েছে এবং ধর্মশাস্ত্রসমূহের মতোই শুদ্ধ বৃত্তিসমূহ অবলম্বন করার যোগত্য যাদের নেই, সেই সকল ব্রাহ্মণ যে চিকিৎসক, দূত, কর-সংগ্রহকারী, কাঠুরিয়া, ব্যবসায়ী, চাষী, পশুপালক, কসাই, সামরিক প্রহরী ও শিকারজীবীদের বৃত্তি গ্রহণ করে সে কথাও বলা হয়েছে। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপর কোন বর্ণে জন্মগ্রহণ করেন না। একথা তীর্থঙ্কর বা জৈনদের ক্ষেত্রেও সত্য। মহাবীর-বর্ধমান ব্রাহ্মণী দেবনন্দার গর্ভে সৃষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু যিনি ভাবী তীর্থঙ্কর অতএব ব্রাহ্মণীর গর্ভে তার জন্ম উচিত হবে না মনে করে দেবতারা তাঁর ভ্রূণকে ক্ষত্রিয়ানী ত্রিশলার গর্ভে সরিয়ে দেন। বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে বেস্‌ম (বৈশ্য) ও শুদ্ধ (শূদ্র) শব্দদ্বয় বাঁধা ছকের মতো ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু জাতি বা বর্ণ হিসাবে বৈশ্য ও শূদ্রদের বিষয় সেখানে আলোচিত হয়নি। বৌদ্ধ জাতকসমূহে যাদের গহপতি বা গৃহপতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তারা ভূম্যধিকারী ও বণিক শ্রেণীর মানুষ, যাদের সামাজিক অবস্থান ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের নীচে। এদের মধ্যে যারা অধিকতর ধনী তারা শ্রেষ্ঠী নামে পরিচিত হত। জাতক সাহিত্যে গহপতি ও কুটুম্বিক সমার্থক, তবে এরা ছিল প্রধানত বাণিজ্যজীবী। শ্রমজীবী দু'প্রকার মানুষের কথা বৌদ্ধগ্রন্থে বলা হয়েছে, ভতক বা কম্মকার (ভাড়া করা শ্রমিক) এবং দাস। এছাড়া বহু ধরনের পেশাদার ও কারিগর জাতির কথা আছে যাদের নিজস্ব গিল্‌ড বা সংগঠন ছিল যা শ্রেণী বা সঙ্ঘ নামে কথিত। সুত্তবিভঙ্গে ঝুড়ি প্রস্তুতকারক, কুম্ভকার, তন্তুবায়, চর্মকার, নাপিত প্রভৃতি বৃত্তিকে হীনসিপ্প (হীনশিল্প) আখ্যা দেওয়া হয়েছে, এবং বেন, বয়কার, চণ্ডাল, নিষাদ পুক্কুস প্রভৃতিকে হীনজাতি বলা হয়েছে।

৪.৩ দাস প্রথা

প্রাচীন ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ায় দাসপ্রথার এত বিস্তৃতি ছিল যে মার্কস-প্রমুখ সমাজতত্ত্ববিদগণ মানব-ইতিহাসের একটি পর্যায়কে 'দাসতার যুগ' বলে অভিহিত করেছেন। ভারতীয় মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের মধ্যে দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী এদেশে দাসপ্রথার বিষয়টিকে গুরুত্বহীন বলেছেন, যদিও রামশরণ শর্মা ও দেবরাজ চানানা বিপরীত মত পোষণ করেন। ভারতে দাসপ্রথা যে ছিল না তা নয়, কিন্তু অন্যান্য দেশের মতো এখানে এই প্রথার বিশেষ বিকাশ ঘটেনি। অতি সীমাবদ্ধ পরিসরে ও অতি সীমাবদ্ধ প্রয়োজনে (যেমন গৃহকর্ম ইত্যাদি) কিছু কিছু দাস এখানে কেনাবেচা চলত। এবং কেউ কেউ স্বেচ্ছামূলকভাবে আত্মবিক্রয় করত, কিন্তু এই পরিসর মোটেই বিস্তৃত ছিল না, তাই মেগাস্থিনিস যথার্থ বলেছিলেন যে 'ভারতবর্ষে দাসপ্রথা নেই'। এর অর্থ তিনি স্বদেশে যে দাসপ্রথার চিত্র দেখেছিলেন সেরকম কোন চিত্র এদেশে তাঁর চোখে পড়েনি।

ঋগ্বেদ-এ যে 'দাস' এবং 'দস্যু' শব্দদ্বয় আছে তাদের দ্বারা স্থানীয় অবৈদিক বা শত্রুভাবাপন্ন জনগোষ্ঠীসমূহকে বোঝানো হয়েছে। তবে *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*-এর কাহিনী অনুযায়ী অজীগর্ত তার মধ্যমপুত্র শুনঃশেপকে বোহিতের নিকট শত ধেনুর বিনিময়ে বিক্রয় করেছিল। মহাভারতে দেখা যায় যে যুধিষ্ঠির নিজেদের দাসত্বের বাজি

ধরেছিলেন। পুরাণের কাহিনী অনুযায়ী রাজা হরিশচন্দ্র নিজেকে বিশ্বামিত্রের নিকট বিক্রয় করেছিলেন, এবং তাঁর দাস হয়েছিলেন। অশোক তাঁর নবম পর্বতানুশাসনে দাসদের প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন যা দাসপ্রথা অস্তিত্ব প্রমাণ করে। মনু সাত ধরনের দাসের কথা বলেছিলেন : যারা যুদ্ধে অধিকৃত হয়েছে,যারা দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির জন্য খাদ্যের অভাবে দাসত্ব স্বীকার করেছে, যারা দাসীর গর্ভে জন্মেছে, যাদের কেনা হয়েছে, যারা পিতামাতার বা আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে, যারা উত্তরাধিকারসূত্রে দাস হয়েছে এবং যারা আইনগত কারণে দাসত্ব করেছে। কৌটিল্যও অনুরূপ কয়েক ধরনের দাসের কথা বলেছেন। নারদের মতে দাস পনেরো ধরনের। যাজ্ঞবল্ক্য এবং কাত্যায়ণও দাসের সম্পর্কে বিস্তৃত বিধান দিয়েছেন।

মনুর মতে ব্রাহ্মণ বা দ্বিজাতির অন্তর্গত কোন ব্যক্তিকে এবং নাবালক শূদ্রকে দাস করা যাবে না। কৌটিল্য আর এক ধাপ এগিয়ে বলেন যে আর্যদের অর্থাৎ চাতুর্বর্ণ্যভুক্ত মানুষদের কদাচ দাস করা যাবে না, যদিও ম্লেচ্ছদের (শক, যমন, পারদ ইত্যাদি) ক্ষেত্রে তা করা যাবে। কৌটিল্য দাসদের ব্যক্তিগত উপার্জন, সম্পত্তিরক্ষা এবং বিলিব্যবস্থার স্বাধীনতা দিয়েছেন। প্রভুকে অর্থপ্রদানের দ্বারা দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার বিধান সকল ধর্মশাস্ত্রেই দেওয়া হয়েছে। যদি দাসদের বিরুদ্ধে মনিব কোন অপরাধ করে বা যদি দাসকে দিয়ে কোন কুকর্ম করায় দাস তদ্দণ্ডে মালিকের আনুগত্য অস্বীকার করতে পারে এবং মালিককে রাজদণ্ড ভোগ করাতে পারে। নারদ (৩০) ও যাজ্ঞবল্ক্য (২/১৮২) বলেন যে প্রভুর কোন বিশেষ উপকার করলে অথবা যে শর্তবিধানে কোন ব্যক্তি দাস হয়েছে সে শর্তের পূরণ হয়ে গেলে দাস স্বাভাবিকভাবেই মুক্তি পায়। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন যে যদি কেউ দাস রাখার ইচ্ছা করে তাহলে তাকে অনুলোমজ দাস রাখতে হবে। কৌটিল্য (৩/১৩) এবং কাত্যায়ণ (৭২৩) বলেন যে প্রভু যদি কোন দাসীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেন মাতা ও সন্তান তদ্দণ্ডেই স্বাধীন হিসাবে গণ্য হবে। ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের বক্তব্য থেকে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়। প্রথমটি হচ্ছে দাসদের পারিবারিক জীবনযাপন করার অধিকার ছিল এবং সেখানে প্রভুর হস্তক্ষেপ অবৈধ বলে গণ্য হত, এবং দ্বিতীয়ত, তাদের নিজস্ব উপার্জন তারা নিজেরা ভোগ করতে পারত।

৪.৪ নারিজাতির অবস্থা ও বিবাহপ্রথা

সমাজে নারীর স্থান ঃ ভারতীয় সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক হওয়ার কারণে (কয়েকটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে মাতৃপ্রধান সমাজ বাদ দিলে) ঋগ্বেদের যুগ থেকেই সমাজে নারীর অবস্থান ও মর্যাদার ক্রমিক অবক্ষয়ের যে সূচনা হয় তা ভারত-ইতিহাসে বরাবরই অব্যাহত থাকে। পরবর্তীকালের ধর্মশাস্ত্রসমূহে বলা হয়েছে যে সুদূর অতীতে মেয়েদের বৈদিক উপনয়ন সংস্কার হত, কিন্তু কালক্রমে তা বন্ধ হয়ে যায়, বেদপাঠ তাদের জন্য নিষিদ্ধ হয় এবং বিবাহ ছাড়া তাদের কোন সংস্কার স্বীকার করা হয় না। তাদের বিবাহের বয়সও কমিয়ে আনা হয়, যদিও বৈদিক যুগে তুলনামূলকভাবে স্ত্রী-স্বাধীনতা অনেকটা বেশি ছিল। প্রাচীন যুগে নিয়োগ প্রথা, বিবাহ-বিচ্ছেদ, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি বিষয়গুলি পরবর্তীকালে পরিত্যক্ত হয়। পাশাপাশি অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে নারীর অধিকার, কর্তব্য ও অবস্থান সুনির্দিষ্ট হয়। ঋগ্বেদের যুগ থেকে ধর্মসূত্রের যুগ পর্যন্ত নারীর সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট বিধান ছিল না। যেমনই হোক, এবিষয়ে প্রথম *মনুস্মৃতি*-তে কয়েকটি অধিকার স্বীকৃত হয়। নারীর ধর্মীয় কর্তব্য এবং পূর্তধর্মাদির বিধান ধর্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়। আইন ও অপরাধীর শাস্তির ক্ষেত্রে

কিছু বিশেষ সুবিধা তাদের দেওয়া হয়। কিন্তু নারীজাতির প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, মনু যা বলেন, যে তারা বাল্যে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন ও বার্ধক্যে পুত্রের অধীন। নারী কদাচ স্বাধীন নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি আজও পর্যন্ত কার্যত বজায় আছে। তবে নিয়মের ব্যতিক্রম সর্বযুগেই ছিল। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে বেশ কয়েকজন সম্রাজ্ঞী ও শাসিকার পরিচয় পাওয়া যায়—যাঁরা দক্ষতায় ও যোগ্যতায় পুরুষদের চেয়ে কোন অংশই কম ছিলেন না।

৪.৪.১ শিক্ষা

উপনিষদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে গার্গীর মতো কোন কোন নারী ব্রহ্মবাদিনী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন এবং তাঁরা শাস্ত্রালোচনা সভায় পুরুষদের সাথে সমানভাবে বিতর্কে অংশগ্রহণ করতেন। এটা খুবই স্বাভাবিক যে বালকদের মতো বালিকাদের ব্রহ্মচর্যাশ্রম ধর্ম পালন বাধ্যতামূলক ছিল না এবং তারা গুরুগৃহে শিক্ষার্থে প্রেরিত হত না। তবে অনুমান করতে অসুবিধা নেই যে গুরুগৃহের কন্যাবৃন্দ পুরুষ শিক্ষার্থীদের সাথেই শিক্ষালাভ করত, এবং এই ধারা যে অব্যাহত ছিল তার প্রমাণ ভবভূতির *মালতীমাধব* নাটকের কামন্দকী—যে পুরুষ ছাত্রদের পাশাপাশি বসেই শিক্ষালাভ করত। পাণিনি বিভিন্ন বৈদিক শাখায় অধ্যয়নরতা নারীদের কথা বলেছেন। 'উপাধ্যায়া' নামক বিশেষ পরিভাষাটি প্রমাণ করে যে শিক্ষিতা মহিলারা শিক্ষয়িত্রীর কাজও করতেন। পতঞ্জলি দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত নারীদের কথা বলেছেন। অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষুণী রচত সঙ্গীত থেরী গাথায় আছে। এঁদের মধ্যে অনেকেই সম্ভ্রান্ত বংশীয়া ছিলেন এবং মোক্ষলাভের জন্য সংসার ত্যাগ করেন। জয়ন্তী নাম্নী এক সুশিক্ষিতা রমণী মহাবীরের সাথে উন্নতমানের দার্শনিক আলোচনা করেন। সচরাচর নৃত্য-গীত-অঙ্কন বিদ্যার ন্যায় ললিতকলা চর্চায় মেয়েরা পারদর্শিনী হতেন, তবে কেউ কেউ ধনুর্বেদেও শিক্ষালাভ করেছিলেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে বহু বিদূষী মহিলার পরিচয় পাওয়া যায়, যদিও সামগ্রিক বিচারে সুবিশাল নারীজাতির খুব সামান্য অংশেরই শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটত। তবে একথাও স্বীকার্য যে বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষের স্ত্রী-ভগিনী-কন্যারা তাঁদের কৌলিক বিদ্যায় দক্ষ হতেন।

৪.৪.২ বিবাহ

ধর্মশাস্ত্রসমূহের বিধান অনুযায়ী বিবাহই ছিল মেয়েদের একমাত্র সংস্কার। স্মৃতি ও নিবন্ধ অনুযায়ী বিবাহের উদ্দেশ্য তিনটি, যথা ধর্মসম্পত্তি (ধর্মানুষ্ঠানের জন্য), প্রজা (পুত্রোৎপাদন) এবং রতি (সুরতক্রিয়া) ও কামশাস্ত্র অনুযায়ী কন্যা যেন পাত্রের চেয়ে পাত্রের চেয়ে অন্তত তিন বছরের বয়সে ছোট হয়। বেদ এবং মহাকাব্যদ্বয়ে মেয়েদের পূর্ণ যৌবনেই বিবাহের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে ধর্মশাস্ত্রসমূহে মেয়েদের বিবাহযোগ্য বয়স নামিয়ে আনা হয়েছে। এমনকী বয়ঃসন্ধির পূর্বেই তা চুকিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। মনুর মতে যদি কন্যা উৎকৃষ্ট হয় তাহলে তার কুল খারাপ হলেও তাকে গ্রহণ করা উচিত। তিনি বলেন যে পাত্র যোগ্য না হলে কন্যা বরং সারাজীবন অবিবাহিতা থাকবে। মনু আরও বলেন যে কন্যা সাবালিকা হলে তার পিতা তার বিবাহ না দেন, সে নিজেই যেন স্বামী খুঁজে নিতে সচেষ্ট হয়। অসবর্ণ বিবাহ চলতে পারে, তবে তা অনুলোম হওয়া বাঞ্ছনীয় (উচ্চবর্ণের পাত্র, নিম্নতর বর্ণের পাত্রী), যদিও প্রতিলোম বে-আইনী নয়। সপিণ্ড অর্থাৎ রক্তের সম্পর্ককে বিবাহ নিষিদ্ধ, বিবাহের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক প্রথা ও রীতিনীতি মানার আবশ্যকতা ধর্মশাস্ত্রে স্বীকৃত।

আট ধরনের বিবাহ ধর্মশাস্ত্রে অনুমোদিত হয়েছে, যথা, ব্রাহ্ম অর্থাৎ যে বিবাহে গুণবান ও শাস্ত্রজ্ঞ পাত্রকে

আমন্ত্রণ জানিয়ে, কন্যার পিতা স্বয়ং তার হাতে সালঙ্কারা কন্যাকে সমর্পণ করেন; আর্য অর্থাৎ কন্যার পিতা যখন একজোড়া বলদ অথবা একটি বলদ ও একটি গাভী পাত্রের কাছ থেকে গ্রহণ করে তাকে কন্যাদান করেন; দৈব অর্থাৎ যে বিবাহে কন্যার পিতা সুসজ্জিতা কন্যাকে যজ্ঞকারী পুরোহিতের হস্তে অর্পণ করেন; প্রজাপত্য অর্থাৎ যে বিবাহে পিতা তাঁর কন্যাকে পাত্রের হস্তে এই বলে সম্প্রদান করেন যে 'তোমরা একত্রে যথাবিহিত ধর্ম পালন কর'। গান্ধর্ব অর্থাৎ যে বিবাহ পূর্বপরিচিত পাত্র-পাত্রীর প্রেম-ভালবাসার দ্বারা সম্পন্ন হয়; আসুর অর্থাৎ যে-বিবাহে পাত্রপক্ষ পাত্রীপক্ষকে ধনসম্পদ উপহার ইত্যাদি দিয়ে পাত্রের জন্য কন্যা নিয়ে আসেন; রাক্ষস অর্থাৎ যে বিবাহে পাত্রীকে বলপূর্বক হরণ করা হয়; এবং পৈশাচ অর্থাৎ যেখানে পাত্রীকে ঘুমন্ত অথবা মত্তাবস্থায় অথবা তার অসর্ততার সুযোগে ধর্ষণ করা হয়।

যে বিবাহকে পৈশাচ আখ্যা দেওয়া হয়েছে অনুরূপ কর্মকে মনু অন্যত্র শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করেছেন এবং অপরাধীর পুরুষাঙ্গছেদের বিধান দিয়েছেন। কাজেই মনে হয় পৈশাচ বিবাহ বলতে আদিতে অন্য কিছু বোঝাত এবং পরে একটি কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করা হয়। গন্ধর্বরা হিমালয় অঞ্চলে বাস করত (এখনও ওই নামে একটি জাতি আছে), অসুররা ইরানে। রামায়ণে একটি পুরোদস্তুর রাক্ষস সভ্যতার পরিচয় আছে। পিশাচ নিঃসন্দেহে একটি জনগোষ্ঠীর নাম, কেননা পৈশাচী প্রাকৃত নামে একটি ভাষা ছিল যে ভাষায় গুণাঢ্যের বৃহৎ কথা রচিত হয়েছিল। মনে হয় গান্ধর্ব, আসুর, রাক্ষস এবং পৈশাচ বিবাহ ওই সকল জনগোষ্ঠীর আচরিত বিবাহ রীতি। এই আট প্রকার বিবাহ ছাড়াও রাজকন্যাদের ক্ষেত্রে স্বয়ম্বর প্রথা চালু ছিল যা অনুযায়ী সমাগত পাণিপ্রার্থীদের মধ্য থেকে রাজকন্যারা তাদের মনোমত পতি পছন্দ করে নিত। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাপারটা প্রার্থীদের কোন প্রতিযোগিতায় জয়লাভের দ্বারা নিষ্পন্ন হত।

নিম্নলিখিত পদ্ধতিসমূহের মধ্য দিয়ে বিবাহকার্য সম্পন্ন হত : গুণ পরীক্ষা, বরপ্রেষণ, বাগ্‌দান, মণ্ডপকরণ, বধূগৃহাগম, মধুপর্ক, সাপন-পরিধাবন-সম্মোহন, সমাঞ্জন, প্রতিসরবন্ধল পরস্পর সমীক্ষণ, কন্যাদান, অগ্নিস্থাপন, হোম, পানিগ্রহণ, লাজহোম, অস্মারোহন, সপ্তপদী, মুর্ধাভিষেক, দক্ষিণাদান, গৃহপ্রবেশ, ধ্রুবারুন্ধতী দর্শন, ত্রৈরাত্রব্রত, চতুর্থী, কর্ম, সীমান্তপূজন, তৈলহরিদ্রারোপণ, আর্দ্রাক্ষতারোপণ এবং মঙ্গলসূত্র ধারণ।

৪.৪.৩ বিবাহ বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ

বৈদিক সাহিত্যে এমন কিছু কিছু বক্তব্য আছে যেগুলি কোন নারীর বিবাহবিচ্ছেদের ইঙ্গিতবহ। পুনর্ভূ শব্দটি সেই বিধবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছে। বৌধায়ন *ধর্মসূত্র*-এ (২/২/৩১) পৌনর্ভব শব্দটি দ্বারা সেই ধরনের নারীর সন্তানকে বুঝিয়েছে যে নারী তার প্রথম স্বামীর ক্লীবত্ব বা পতিত হয়ে যাওয়ার কারণে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছে। *নারদ* ও *পরাশরস্মৃতি*-তে এবং *অগ্নিপুরাণ*-এ বলা হয়েছে যদি কোন নারীর স্বামী নিরুদ্দেশ হয়, অথবা মারা যায়, অথবা প্রব্রজ্যা নিয়ে সংসার ত্যাগ করে, অথবা ক্লীব হয়, অথবা কোন দুষ্কর্মের জন্য পতিত বা সমাজচ্যুত হয় তাহলে সেই নারী পুনরায় বিবাহ করতে পারে। মনু (৯/৭৬) বলেন যে কোন নারীর স্বামী নিখোঁজ হয়ে গেলে সে কয়েক বছর অপেক্ষা করবে। তবে মনু (৯/১৯০-৯১) এক স্থানে বলেছেন যে কোন নারীর প্রথম স্বামীর সন্তান ও দ্বিতীয় স্বামীর সন্তান থাকলে, প্রথমোক্তগণ প্রথম স্বামীর এবং দ্বিতীয়োক্তগণ দ্বিতীয় স্বামীর সম্পত্তির অধিকারী হবে। এ থেকে বোঝা যায় যে বাস্তবে কোন নারীর দ্বিতীয় স্বামী থাকা খুবই সম্ভব ছিল। তারপর সে পুনর্বিবাহ করবে কি না একথা মনু স্পষ্ট বলেননি, যদিও *নারদস্মৃতি*-তে পুনর্বিবাহের বিধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু

এই সকল দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ বিবাহবিচ্ছেদের আধুনিক ডিভোর্সের দৃষ্টান্ত নয়। একমাত্র কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*-য়েই (৩/৩) বলা হয়েছে যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অবনিবনা ঘটলে উভয়ের আইনত বিবাহ বিচ্ছেদ হতে পারে। এই বিষয়ে স্থানীয় লোকাচারকে, বিশেষ করে নিম্নবর্ণের মহিলাদের ক্ষেত্রে পুনর্বিবাহের বিষয়টি, স্মৃতিগ্রন্থসমূহের টীকাভাষ্যে আলোচিত হয়েছে। গুপ্তবংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের স্ত্রী পুনর্বিবাহিতা ছিলেন বলে প্রকাশ। পুনর্ভু তিন প্রকারের হতে পারে— যদি প্রথম বিবাহ যথাবিহিত না হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে নারীর দ্বিতীয় বিবাহ; প্রথম স্বামীকে পরিত্যাগ করে কোন নারীর দ্বিতীয় বিবাহ; এবং স্বামী মারা যাওয়ার পর মৃতের স্বজনবর্গ যদি তার সপিণ্ড সম্পর্কের কোন পুরুষের সঙ্গে ওই নারীর পুনরায় বিবাহ দেয়।

৪.৪.৪ নিয়োগপ্রথা

অপুত্রক অবস্থায় কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী যদি অন্য কোন নিযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা নিজগর্ভের সন্তান উৎপাদন করে, এই প্রকার ব্যবস্থাকে নিয়োগপ্রথা বলে। নিয়োগের ফলে সৃষ্ট সন্তানকে ক্ষেত্রজ পুত্র বলা হয়। এই প্রথার বহু উৎপাদন মহাভারতেই আছে। ঋষি বশিষ্ঠ মদয়ন্তীর গর্ভ সঞ্চার করেছিলেন। দীর্ঘতমা ঋষি রানী সুদেষ্ণার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেন। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম নিয়োগপ্রথার ফলে, নিযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন স্বয়ং ব্যাসদেব যিনি অম্বিকা, অম্বালিকা ও জনৈকা দাসীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেন। পঞ্চপাণ্ডবও নিয়োগপ্রথার দ্বারা সৃষ্ট ক্ষেত্রজ সন্তান। এই প্রথার উপযোগিতা ও যাথার্থতা গৌতম, বশিষ্ঠ ও বৌধায়নের ধর্মসূত্রে এবং মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও নারদের ধর্মশাস্ত্রে, তথা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে, যদিও আপস্তম্ব প্রমুখ শাস্ত্রকাররা এই প্রথা সমর্থন করেন নি। মনুও বিষয়টির ক্ষেত্রে অনেকগুলি শর্ত আরোপ করেন। পরবর্তীকালে এই প্রথা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

৪.৪.৫ সম্পত্তির অধিকার

মেয়েদের সম্পত্তি স্ত্রীধন নামে পরিচিত। মনু বলেন স্ত্রীধন ছয় প্রকার ঃ বিবাহ-হোমকালে লব্ধ যে ধন তাকে অধ্যাগ্নি ও পতিগৃহে যাওয়ার সময় লব্ধ যে ধন তাকে অধ্যাবাহনিক বা ব্যবহারিক স্ত্রীধন বলে। রতিকালে অথবা অন্যকালে পতি কর্তৃক প্রীতি-সহকারে দত্ত যে ধন তা প্রীতিদত্ত। বিবাহের পর পিতা, মাতা, ভর্তা, পিতৃকুল, মাতৃকুল এবং ভর্তৃকুল হতে লব্ধ যে ধন তাকে অন্বাধেয় বলা (৯/১৯৪/৯৫) হয়। মাতারা ভ্রাতারা তাদের ভাগের এক-চতুর্থাংশ বহন করবে, এরকম কথা বলা আছে বটে তবে তা ইচ্ছামূলক না বাধ্যতামূলক তা স্পষ্ট করে বলা হয় নি। কৌটিল্য (২/২) শুল্ক (কন্যার প্রাপ্য), অন্বাধেয় (যা পিতামাতার কাছ থেকে পাওয়া যায়), অধিবাদনিক (যা স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া যায়) এবং বন্ধুদত্ত এই চারপ্রকার স্ত্রীধনের উল্লেখ করেছেন। স্ত্রীধন সম্পর্কে সুবিস্তৃত আলোচনা কাত্যায়ণ স্মৃতিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীদনের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে : "স্থাবর বা অস্থাবর যে-কোন সম্পত্তিই হোক না কেন, যা কোন নারী তার কুমারী অবস্থায়, বিবাহকালে, বিবাহের পর তার স্বজন ও বান্ধবের কাছ থেকে পেয়ে থাকে সে যা উত্তরাধিকারসূত্রে অথবা উপার্জনসূত্রে লাভ করে, সবটাই তার স্ত্রীধন"। স্ত্রীধনের উপর স্বামী বা শ্বশুরকুলের কোন অধিকার নেই তবে কোন কোন স্মৃতির মতে দুর্ভিক্ষে, বন্দীদশায়, রোগে এবং ধর্মার্থে স্বামী তার স্ত্রীর স্ত্রীধন গ্রহণ করতে পারে।

৪.৪.৬ স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক

বৈদিক সাহিত্যের বহু স্থানেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্প্রীতি ও শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে যাতে পুত্রবধূর সুসম্পর্ক

থাকে সে বিষয়ে প্রার্থনা জানানো হয়েছে, কিন্তু গৃহের পরিবেশ যে সর্বদা শান্তিপূর্ণ থাকত না তারও উল্লেখ আছে। মহাকাব্যদ্বয়ে এবং সংস্কৃত সাহিত্যের তৎসহ পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে রাজা, রাজবংশীয় এবং সম্ভ্রান্তদের মধ্যে বহুবিবাহের প্রচলন ছিল, যদিও সাধারণ মানুষেরা এক স্ত্রী নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিতেন। সর্বণা স্ত্রী এবং তার গর্ভজাত সন্তান-সন্ততি বৈষয়িক ও আইনগত অধিকার অসবর্ণা স্ত্রী ও তার গর্ভজাত সন্তান-সন্ততির চেয়ে অধিকতর ভোগ করত। মনু বলেন যে, স্ত্রীকে পরিত্যাগ করলে স্বামীকে রাজদণ্ড ভোগ করতে হবে, যদিও তিনি সর্বাংশে স্ত্রীকে স্বামীর অধীন করেছেন। কৌটিল্য স্বামী ও স্ত্রীকে সমান চোখেই দেখেছেন। নারদ বলেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস মহাপাপ এবং উভয়ের সম্পর্ক বিশ্বাসের হলেই তা মধুর হয়। তাঁর মতে (১২/৯০-৯৬) স্ত্রী যদি ব্যভিচারিণী হয় বা স্বামীকে হত্যার চক্রান্তে লিপ্ত থাকে স্বামী তাকে পরিত্যাগ করতে পারে, অন্যথায় স্বামী রাজাকর্তৃক দণ্ডিত হবে। স্মৃতিশাস্ত্রসমূহ ঘোরতর পিতৃতান্ত্রিক এবং পুরুষ প্রাধান্যযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, ব্যভিচারিণী স্ত্রীর প্রতি কিছুটা উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তারা প্রায়শ্চিত্ত করে সহজেই শুদ্ধ হতে পারে। স্ত্রী নিজে থেকে স্বামীর সম্পত্তির বিভাজন দাবি করতে পারে না, তার সম্পত্তি ভাগের সময় সন্তানদের সমতুল্য ভাগের অধিকারী হতে পারে।

৪.৪.৭ বিধবা

কোন কোন ক্ষেত্রে বিধবার পুনর্বিবাহ স্বীকার করে নিলেও মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য বিধবা-বিবাহের অনুকূলে মত দেননি, যদিও কৌটিল্য এবং নারদ ও তদানুসারে *পরাশরস্মৃতি* ও *অগ্নিপুরাণ*-এ বিধবার দ্বিতীয় বিবাহের পক্ষে অনুমোদন আছে। ধর্মসূত্রসমূহেও (বশিষ্ঠ ১৭/১৯, ২০, ৭২, ৭৪; বৌধায়ন ৪/১-১৬ ইত্যাদি) বিধবা বিবাহের স্বীকৃতি আছে। *ঋগ্বেদ*-এ সতীপ্রথার কোন উল্লেখ নেই, তবে *অথর্ববেদ*-এ একস্থলে (১৮/৩/১) আছে। *মহাভারত*-য়েও বিধবার অগ্নিতে দেহ বিসর্জনের কয়েকটি কাহিনী আছে। ওনেসিক্রিতোস, ডায়োডারাস, আরিস্তোবুলোস প্রভৃতি গ্রীক লেখকেরা বিধবাদের সহমরণ প্রথার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে স্মৃতিশাস্ত্রে এই প্রথা অনুমোদিত নয়। মনু (৫/১৫৭-৬০) বলেন যে বিধবা স্বামীর মৃত্যুর পর আত্মসংযমী ও শুদ্ধ হয়ে অবশিষ্ট জীবন যাবন করে যশস্বিনী হবে। মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকারের কথা কৌটিল্য (৩/২) প্রথম বলেন। *মহাভারত*-এ বিধবাকে তার মৃত্যু পর্যন্ত স্বামীর সম্পত্তি ভোগ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে কিন্তু তা নষ্ট করা বা বিক্রয় করার অধিকার দেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে মনু একেবারেই নীরব কিন্তু নারদ বলেন যে বিধবা আমৃত্য খোরপোস পাবার অধিকারিণী। বৃহস্পতি ও কাত্যায়ণ অধিকাংশ উদার, তাঁরা বিধবাকে স্বামীর সম্পত্তির অধিকারিণী হতে আপত্তি করেন নি। দায়ভাগে সন্তানহীনা বিধবা পুরো সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী, এমনকী যৌথ পরিবারেও স্বামীর অংশ সে-ই ভোগ করে। মিতাক্ষরাতেও বিধবাকে স্বামীর অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা দেওয়া হয়েছে, তবে সব দিকের বিচারে বিধবাদের প্রতি স্মৃতিশাস্ত্রসমূহ সুবিচার করেনি।

৪.৪.৮ দেহোপজীবিনী

দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বীর মতে বেশ্যা শব্দটি *ঋগ্বেদ*-এ উল্লিখিত 'বিশ' থেকে নিষ্পত্তি হয়েছে। 'বিশ' শব্দের অর্থ জনবসতি, গ্রাম, অঞ্চল প্রভৃতি, এবং সেই হিসাবে বেশ্যা বলতে সাধারণ মহিলাকে বোঝায়, যাদের সম্পর্কে অবশ্য সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি সর্বযুগেই একরকম নয়। বাৎস্যায়নের *কামসূত্র*-এ (১/৩/২০-২১) বলা হয়েছে যে সকল বেশ্যাই গণিকা নয়, যারা চৌষট্টিকলায় পারদর্শিনী, রূপ ছাড়াও বিদ্যা ও বুদ্ধিতে

শ্রেষ্ঠ, যার কথাবার্তা মধুর, সুনির্দিষ্ট, মার্জিত এবং বুদ্ধিদীপ্ত, তারাই হচ্ছে গণিকা। শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বৌদ্ধশাস্ত্রে বর্ণিত আম্রপালী যার আমন্ত্রণ, বৈশালীর রাজকুমারদের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে, বুদ্ধ গ্রহণ করেছিলেন। কৌটিল্য গণিকাধ্যক্ষ নামক রাজকর্মচারী নিয়োগের কথা বলেছেন যাঁর দায়িত্ব ছিল কার্যরতা দেহোপজীবিনীদের দেখাশোনা করা ও সুরক্ষা প্রদান করা। কৌটিল্য বলেন যে কূটনৈতিক প্রয়োজনে রাজা এক সহস্র পণ বেতনে একজন সুশিক্ষিতা ও গুণসম্পন্না গণিকা নিযুক্ত করবেন, এবং এর অর্ধবেতনে একজন প্রতিগণিকা নিয়োগ করবেন। দেহোপজীবিনীদের পেশা বিষয়ক বিবিধ আইন কৌটিল্য প্রণয়ন করেছেন। বাৎস্যায়নের *কামসূত্র*-এর একটি বিশেষ অংশে তাদের ব্যবসায়ের রীতিনীতি, শ্রেণীবিভাগ, গ্রাহকদের সাথে ব্যবহার, সুবিধা, অধিকার, কর্তব্য, সুরক্ষা, কৌশল প্রভৃতি নিয়ে বিশদ আলোচনা আছে। *মৃচ্ছকটিক* নাটকের বসন্তসেনা, দশকুমার রাগমঞ্জরী ও চন্দ্রসেনা প্রভৃতির ন্যায় বিশিষ্ট গণিকা চরিত্র সংস্কৃত সাহিত্যে পর্যাপ্ত পাওয়া যায়। *মৎস্যপুরাণ*-এ একটি অধ্যায়ের নাম 'বেশ্যাধর্ম' যাতে এই বৃত্তির খুঁটিনাটি অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। *উপমিতিভবপ্রপঞ্চকথা*-র দুটি কাহিনীতে উৎকৃষ্ট ধরনের গণিকাদের কথা আছে। দামোদরগুপ্তের (অষ্টম শতক) বিখ্যাত *কুট্টনীমত* নামক রচনা তৎকালীন গণিকাবৃত্তির উপর মূল্যবান আলোকপাত করে। ক্ষেমেন্ড (একাদশ শতক) বিরচিত *সময়মাতৃকা* একজন অবসরপ্রাপ্তা দেহোপজীবিনীর জীবনকথা যে অপর দেহোপজীবিনীদের অবিভাবিকা (মাতৃকা, এযুগের মাসী) স্বরূপ কাজ করে। অনেক দরিদ্র ঘরের নারী যে গোপনে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকত তারও সাহিত্যগত উল্লেখ বহু আছে। গণিকা ছাড়া সাধারণ দেহোপজীবিনীরা রূপাজীবা, কুম্ভদাসী, পরিচারিকা, কুলটা, স্বৈরিণী, শিল্পীকারিকা, নটী প্রভৃতি নামে পরিচিত হত।

৪.৫ অনুশীলনী

১। প্রাচীন ভারতের জাতিবর্ণ প্রথা সম্পর্কে রচনাত্মক বর্ণনা দিন।

২। প্রাচীন ভারতের নারীজাতির অবস্থা বর্ণনা করুন।

৪.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : *লোকায়ত দর্শন* (১৯৫৫)

২। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য : *ভারতীয় জাতিবর্ণ প্রথা* (১৯৮৭)

৩। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য : *ধর্ম ও সংস্কৃতি : প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট* (১৯৯৬)

৪। নির্মল কুমার বসু : *হিন্দু সমাজের গড়ন*

৫। এ. এল. বাসাম (সম্পা.) : *এ কালচারাল হিস্ট্রী অফ্ ইন্ডিয়া* (১৯৭৫)

৬। আর. সি. মজুমদার (সম্পা.) : *হিস্ট্রী এ্যান্ড কালচার অফ্ দ্য ইন্ডিয়ান পিপ্‌ল,* ১ম ও ২য় খণ্ড (১৯৫১-৬৬)

৭। বি. এন. এস. যাদব : *সোসাইটি এ্যান্ড কালচার ইন নরদ্যান ইন্ডিয়া ইন দ্য টুয়েলফ্‌ত সেঞ্চুরী এ. ডি.* (১৯৭৩)

৮। ডি. পি. চট্টোপাধ্যায় : *এ হিস্ট্রী অফ্ সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলজি ইন এনসিশয়েন্ট ইন্ডিয়া খণ্ড ৩।*